কেউ বলে বিপ্লবী
কেউ বলে ডাকাত

অনন্ত সিংহ

শৈব্যা • প্রকাশন বিভাগ
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

MEMBER OF PARLIAMENT
(Rajya Sabha)

অবতরণিকা

অতীতের বহু রক্তস্নাত দিনের সাক্ষী ও রক্তঝরা পথে এগিয়ে চলা সৈনিক শ্রীসমীর মোদক, অনন্তদার কনষ্টিটিউটেড এটর্নী আজন্ম-বিপ্লবী অনন্তদার আত্মবিবরণীমূলক বই "কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'-এর অবতারণিকা লেখার অনুরোধ জানায়। বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখিনি লেখাটি যদিও অমৃত পত্রিকায় পড়েছি কিন্তু অনন্তদাকে শেষ বয়সে খুব কাছে পেয়েছি, মুখে মুখে অনেক গল্প তিনি করেছেন, কিশোর-যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের ধাপে পা দিলেও অনন্তদাকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিবিড় ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার সম্বন্ধে যতই জেনেছি আরও জানার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে, ঔৎসুক্য বেড়েছে। অনেকে হয়ত এই ঔৎসুক্যকে Feminine vice বলে ধিক্কার জানাবেন। সে যা হোক অনন্তদার চরিত্র কি অনন্ত রহস্যজালে আবৃত! যে রহস্য উপলব্ধির প্রয়াসে অনন্তদার বইয়ের অবতরণিকা লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

সিপাহী বিদ্রোহের পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হ'তে বিচ্ছিন্নভাবে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী বিপ্লবী ভাবধারা প্রবাহিত হলেও চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের ভূমিকা ও প্রস্তুতির ধরণ ছিল অন্য। মুক্তি সংগ্রামে সহিংসধারায় প্লাবিত বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহিংস ও অহিংস ধারার সামগ্রিক সমন্বয় হলেও সহিংস ও বিপ্লবী ভাবাধারায় মাষ্টারদা যে পথে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন সে দিগ্‌দর্শনের প্রতীক হল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ'। অনন্তদা সে বিদ্রোহের একজন মানস প্রতীক। মাষ্টারদার ভাবাদর্শের সার্বিক স্ফুরণ হয়েছিল নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মধারায়। ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরে অহিংস ধারার অবদান থাকলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিল যা ক্ষমতা হস্তান্তরকে সফল করেছিল।

অনন্তদার সাথে আলাপ আলোচনায় ও ভাববিনিময়ে একটা জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি, জরা-ব্যাধির প্রকোপে তিনি শারীরিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হলেও তার মনটা ছিল কিন্তু বরাবরই সতেজ ও সবুজ বিপ্লবীর মন। তার বিদ্রোহী রণক্লান্ত মন অত্যাচারের ক্রন্দনরোল প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি খুঁজে পায়নি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিভিন্ন ভাবে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি নিতে পিছপা হননি। কিন্তু কোথায় সহায় সম্পদ, কোথায় সংগঠন—একে গড়তে গেলে প্রয়োজন বিপ্লবী রাজনৈতিক মানসিকতায় প্রস্তুত যুবদল, প্রয়োজন-স্বদক্ষ কর্মী ও অর্থ। নতুন চিন্তাধারায় সিক্ষিত নতুন কর্মীদল গঠন করলেন, গোপন সংগঠন করার শিক্ষা ও কলা কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল কিন্তু অর্থাভাবে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবী ভাবধারার অনুকরণে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্যও অনন্তদা সবদিক ভেবে চিন্তে স্বদেশী যুগের পথেই অগ্রসর হলেন। তাঁর পুরানো বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে 'ডাকাত' আখ্যা দিয়ে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু সংকল্পে অটল অনন্তদা তাঁর বিপ্লবী সংগঠন ও ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে বরাবরই মনের অটুট শক্তি নিয়ে নিজের আদর্শে অবিচলিত ছিলেন।

অতঃপর শুরু হল মতাদর্শে ভিন্ন পন্থীদের সাথে সংঘাত—গ্রেপ্তার হলেন—বছরের পর বছর কারাবাসে রইলেন—তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য সরকার সমস্ত কলা কৌশল নিয়োজিত করলেন—মামলায় দাখিলীকৃত দলিলের (একজিবিট ১২০) উপরই তার মামলার ভিত্তি নিহিত ছিল—কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, প্রমাণের সাক্ষ্য সাবুদের অভাব ছিল। আট বছর এভাবে মামলা গড়িয়ে চলল। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় সরকারের গৃহীত নীতি অনুযায়ী মামলা না চালানো সিদ্ধান্তে অনন্তদা ও তাঁর সহযোদ্ধারা মুক্তি পেলেন।

মুক্তির আগেও জেলে—হাসপাতালে তাঁর সাথে দেখা করেছি—বিপ্লবী সাধনায় সিদ্ধিলাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমস্ত মন প্রাণ ভরে ছিল—মনের অনেক কথা বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু অতৃপ্ত মন তৃপ্তির শান্ত সৌম্যে ভরপুর হয়ে উঠল না—নিয়তি তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। বিপ্লবী অনন্তদার গলায় যে মালাটি দিয়েছিলাম—মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার সে মালাটিই তাঁর ঘরে ঝোলানো ছিল—মালার শুকনো ফুল যেন জ্যোতিষ্মান হয়ে বলল—'অনমনীয় অনন্তদা ও তাঁর বিপ্লবের আদর্শ এমনিই জ্যোতিষ্মান হয়ে থাকবে—বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তা সফল হয়ে উঠবে।' জয়হিন্দ—

ইতি,

অমর প্রসাদ চক্রবর্তী

এম. পি.

অতুলনীয় অনন্ত সিংহ

৪, বিপিন পাল রোড কলিকাতা-২৬

পরলোকগত অনন্ত সিংহ বিপ্লবী বীর হিসাবে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন ভারতের মুক্তি লাভের ইতিহাসে তাহা চিরদিন লিখিত থাকিবে। জীবনে তিনি স্বদেশী ও বিদেশী সরকারের হস্তে বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার সদগতি প্রার্থনা করি।'

—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

২৭ বেকার রোড, কলিকাতা-২৭

পৃথিবীর সবাই যদি আপনাকে অপবাদে কলঙ্কিত করে তখনও আমার একক কণ্ঠস্বর তার প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করবে না।

—স্নেহাংশু আচার্য

'এক এক সময় এত কষ্ট হয় অনন্তদার জন্য। ওকে চিনল না কেউ। অবশ্য আমি বিশ্বাস করিনা 'চিনল না' এই 'না জানা', 'না চেনার' মধ্যে কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ হোল নিজের স্বার্থ। অবশ্য এখানেও আমি একেবারে মনে করিনা—যে মানুষ বড়ো যে মানুষের মস্ত বড় অবদান আছে—তাকে স্বীকৃতি দিলে নিজের স্বার্থ ব্যহত হয়।'

—কল্পনা যোশী

১৯৫ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭

'বিপ্লবী জীবনে কর্মদক্ষতায়, উদ্ভাবনীয়তায়, আক্রমণ কৌশলী অপরাজেয় সংগঠনী শক্তি সম্পন্ন, সর্বত্যাগী আদর্শে নিষ্ঠাপরায়ণ, স্থির লক্ষ্য, আনুগত্য ও বিশ্রামহীন বিপ্লবী যে কয়জনকে দেখেছি, অনন্ত সিংহ তার মধ্যে অতুলনীয়। এক কথায় বলা যায় যে, কোন স্বাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করলে অনন্ত সিংহ যুদ্ধ-বিশারদ দক্ষতায় পৃথিবীতে স্লিকেন্, ব্রাউসিজ্-লুডেন ডরফের সমপর্যায় গণ্য হতে পারতেন।'

এককথায় বলতে গেলে, অনন্তসিংহকে বাদ দিয়ে মাষ্টারদার মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাষ্টারদার অপূর্ব সংগ্রহ ও সৃষ্টি অনন্ত সিংহ। মাষ্টারদার ভাব-মূর্ত্তিকে উদ্ভাসিত করেছেন অনন্তসিংহ তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা ও সফল পরিচালনায়। শেষ জীবনে তাঁর মসীর দক্ষতাও আমরা দেখেছি।

শ্রীভূপালচন্দ্র বসু

প্রকাশকের নিবেদন

অগ্নিযুগের প্রবাদপুরুষ অনন্ত সিংহ ১৯৭৮ সালের জানুআরি মাস থেকে দীর্ঘ আত্ম-জৈবনিক রচনা সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করেন। যে রচনার নামকরণ পরবর্তী কালে তিনি নিজেই স্থির করেন—'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত।'

অনন্ত সিংহ তার রচনার মধ্যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন সমূহের কথা উল্লেখ করে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা সবই তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত।

আমরা তাঁর রচনাটি যথাযথ প্রকাশ করলাম।

আমি পাড়ার সেই দুরন্ত বালক—মাথা নত করি নি কারো কাছে—করি নি কারোকে কুর্নিশ। আমার বিরুদ্ধে কেবল নালিশ আর নালিশ। বাবার কাছে আমি একটা সমস্যা। মার স্নেহের আধিক্য—তার কারণই কি ছিল আমার দুরন্তপনার পেছনে? মা আমাকে কখনো অন্যায় আবদার দেননি। তাঁর মুখে গল্প শুনেছি রামায়ণ মহাভারতের। যুদ্ধের গল্প, বীরত্বের গল্প আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম। দ্রৌপদীর প্রতি কুৎসিত অপমান করার জন্য ভীম দুঃশাসনের বুকের রক্ত পান করেছেন। সতীর প্রতি অতি অপমানকর ব্যবহারের জন্য ভীমের হাতে কীচক রাজাকে একটি পশুর মত প্রাণ দিতে হলো। বালক অভিমন্যু সপ্তরথীর বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ করে প্রাণ বলি দিলেন - আত্মসমর্পণ করেননি। মার মুখে আরও শুনেছি রবিন হুডের কথা। রবিন হুডের কথা ভাবতে ভাবতে আমি আমার বালক বয়সেই রবিন হুডের ভক্ত হলাম। রবার্ট ক্লাইভ লেখাপড়া করতেন না, বাবা-মার কথা শুনতেন না, তিনি মসী ছেড়ে অসি হাতে ধরলেন এবং সেই ক্লাইভই এককালে বাংলাদেশের শাসনকর্তা হলেন। এই ধরনের মানসিকতা সেই বাল্যবয়স থেকেই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কোন অন্যায় কোন ত্রুটি, কোনরূপ বাদবিসম্বাদ আমি সহ্য করতে পারতাম না।

কি বা তখন আমার বয়স। কোন ত্রুটিকে, সে যতই ছোট হোক না কেন—সে ত্রুটি ত্রুটিই, তাকে কখনও ক্ষমা করা যায় না। দুজনে ঝগড়া করছে, সেই ঝগড়ার নিষ্পত্তির দায়িত্ব যেন আমার। তক্ষুনি আমি সেখানে ছুটে গেলাম, সব কথা শুনলামও না। কে দোষী, কে নির্দোষী তাও সঠিক করে বুঝবার সময়ও নিলাম না। তক্ষুনি এক পক্ষকে ধরে নিলাম দোষী আর তখন তাকে হয়ত মারলাম এক ঘুষি না হয় একটি ছড়ির বাড়ি, আর না হয় দূর থেকে ছুঁড়লাম একটি ঢিল। হরদম্ 'এরূপ অন্যায়ের' আমি প্রতিবাদ করে চলেছি—বিচার করেছি আর শাস্তি দিয়েছি পাথর ছুঁড়ে, না হয় লাঠি দিয়ে নইলে ঘুঁষি মেরে। আমার এইরূপ আচরণের বিরুদ্ধে পাড়ার লোক অস্থির হয়ে উঠল। তাঁদের বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। প্রতিদিনই তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ—স্ত্রী বা পুরুষ বা আমার মত স্কুলের ছেলে বাবার কাছে একের পর এক নালিশ জানিয়ে যেতে লাগলো।

কেউ বললো 'বাবু আপনার ছেলে অনন্তলাল শুধু শুধু আমার ছেলেকে মেরেছে।' হয়ত আর একজন এসে বলেছে—অনন্তলাল আমাদের এসে শাসাচ্ছে সে আমাদের ধরে মারবে, যদি আমরা পাশের বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে না ফেলি। আবার কেউ এসে বলছে—গোলাববাবু, 'আপনার ছোট ছেলের জালায় আমরা একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। সে আমাকে আজ শাসিয়ে গেল—যদি মুসলমান বস্তির লোকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে না নিই তবে সে আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। বাবু আপনার ছোট ছেলে অনন্ত সব পারে। তার ভয়ে আমরা অস্থির। আপনি বলেই আমরা পুলিশের কাছে ডাইরি করছি না। আপনি এখন বলুন আমরা কি করতে পারি।'

পাড়ার সবাই জানত গোলাববাবু কখনও নিজের ছেলেকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল—'যে কোন নালিশই—সত্যি বা মিথ্যা হউক তা বাস্তবে অনন্তের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ'। কই তার বড় ভাই নন্দের বিরুদ্ধে কেউত কখনও কোন অভিযোগ করে না। অনন্ত যদি নির্দোষ হোত পাড়ার লোক কেবলই এমনভাবে অনন্তের বিরুদ্ধে বলবে কেন? তিনি মনে মনে বিচার করে কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একবার, তারপর কয়েকবারই মা, দিদি, আমার দাদা ও আমার কাছে ঘোষণা করলেন—'যদি অনন্তের বিরুদ্ধে আমার কাছে ফের কোন নালিশ আসে তবে আমি আর ভাববো না, আমি আর কোন বিচারই করবো না। আমার বিচারে অনন্তই দোষী সাব্যস্ত হবে। তাকে আমার সাজা দিতেই হবে। এই ছেলেকে আমি মেরেই ফেলব। আমি শেষ চেষ্টা করে দেখবো সে আমার শাসন মানে কি-না।'—বাবা খুব বিরক্তি সহকারে এমন ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রতিবারই তাঁর ঘোষণায় আমার শাস্তির কঠোরতা কেবলই বেড়ে যেত। মা বোঝাতেন—আচ্ছা, তোর কি কোনদিনই স্বভাব বদলাবে না? তুই কি কেবলই দুষ্টুমি করবি? তুই কি কেবল জেদ করেই চলবি?' ঠাকুমা খুব আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলতেন—দেখ্ তুই আর এরকম দুষ্টুমি করিস না। সবাই তোর বিরুদ্ধে নালিশ করে। আমার শুনতে ভালো লাগে না। বল্, তুই আমার কথা রাখবি? আমি তখনই ঠাকুরমাকে বলতাম—'তোমাদের কোন কথাটি আমি শুনিনা বলত? আমিতো তোমাদের সব কথাই শুনি।' 'তুই যদি আমাদের কথা সত্যিই শুনতিস্ তবে দুদিন তিনদিন পর পরই তোর নামে পাড়ার লোকেরা তোর বাবার কাছে নালিশ করে যাবে কেন? না, না, সত্যিই এরকম আর [illegible] না মাথা খাস্, এরকম আর করিস না।' আমার এই সব

কথা শুনে সত্যি মন খুব খারাপ হোত আর মনে মনে ভাবতাম—প্রতিজ্ঞাও করতাম যে, আমি আর কখনও বাবার কথার অবাধ্য হব না। দাদার মত আমিও খুব ভালো ছেলে হব। কিন্তু কি জানি সেইরকম ভালো ছেলে হবার মত ক্ষমতাই হয়ত আমার ছিল না। অন্যায় হবে, আর সেই অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করবো, তা হতে পারে না। আমাকে আমি 'তাদের' মত ভালো ছেলে করতে পারিনি, শাসনেও রাখতে পারিনি। এই তো হোল আমার দিকের কথা কিন্তু বাস্তবে কি কি ঘটনা ঘটেছে ও বাবা আমাকে কিভাবে শাসন করেছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত দিই।

বিচিত্র বাবার শাঁসন। ধরুন বাবা কোর্ট থেকে ফিরলেন। তখনও কোর্টের পোশাক ছাড়েননি। কিন্তু এরই মধ্যে দিদির নালিশ—বাবা, অনন্ত আজকে আমাদের বাচ্চা চাকরটিকে শুধু শুধু ধরে মেরেছে। তার দোষ, সে কেন দিনের বেলায় ঘুমোচ্ছিল।' মা বললেন—আজকে মুরাদের বাড়ি থেকে এসে অনন্তের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে গেল, যে অনন্ত মুরার ছোট ছেলেকে রাস্তায় পেচ্ছাপ করেছে বলে পিটিয়েছে।' আরও বললেন—দেখছি ওর দৌরাত্মের জন্য পাড়ায় কেউ টিকতে পারবে না।'

তক্ষুণি সিংহনাদ শোনা গেল। বাবা হাঁক দিলেন—'অনন্তলাল, ইধার আও।' সুবোধ বালকের মত বাবার কাছে উপস্থিত হলাম। বাবা তখনও কোর্টের পোশাক ছাড়ছিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই হুকুম দিলেন—'দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও।' কেন, কি ব্যাপার—কেন আমি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবো, সেই প্রশ্ন করা আমার পক্ষে অবান্তর। হুকুম তামিল করতেই শিখেছি। অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে আমি পা জোড়া করে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। বাবা বললেন—'তোমাকে এখন অর্ধজানু হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। অর্ধজানু হও। আরেকটু নীচে, আরেকটু নীচে।' আমার পা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল। কিন্তু বাবার হুকুম মানতেই হলো।

বাবা কোর্টের পোশাক ছেড়ে বাড়ির পোশাকে এসে বসলেন সম্মুখের একটি চেয়ারে— যেন একটি বিচারকের চেয়ার। তিনি এখন বিচার করবেন। দিদির কাছে শুনলেন—বাড়ির ছোট চাকরটিকে আমি মেরেছি। তার অপরাধ খেলা-ধূলো না করে দিনের বেলায় ঘুমোচ্ছিল। বাবা কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন—'যদি কারো তোমার মত দুরন্তপনা না করে দুপুরে ঘুমোতে

ইচ্ছে হয়, তাতে তোমার কি? তুমি তাই বলে তাকে মারবে? তোমাকে এইজন্য দশ ঘা বেত খেতে হবে।' তারপর তিনি মাকে বললেন—'খুব ধীরে ধীরে তুমি আমাকে বল নুরা কি বলে গেল।' নুরা আমাদের মুসলমান প্রতিবেশী। তাঁরা খুব ভালো লোক। সবাই তাঁদের প্রশংসা করত। সে তো মিথ্যা নালিশ অনন্তের বিরুদ্ধে করবে না। মা আবার সেই কথাটিই বললেন এবং আরও বললেন—'নুরার ওপর অনন্তের আদেশ—বিনাশর্তে বস্তির মুসলমান মোড়লের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় অনন্ত, নুরাদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দেবে। স্বভাবতই নুরা খুব ভয় পেয়েছে। তাঁর ধারণা অনন্ত সব পারে। তাকে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে ডাইরী করতে হয়। কিন্তু যেহেতু অনন্ত আমাদের বাড়ির ছেলে, তাই সে এর কোন সুব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়ে গেল।' বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি অনন্তকে এই সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছ? সে কি কিছু বলেছে?' মা—'ওরে বাবা, তাকে আমি কী জিজ্ঞেস করব? সে কি আমাকে কোন উত্তর দেবে?' বাবা মার কথা আমার সামনেই হোল। তাঁরা খুবই চিন্তাগ্রস্ত হলেন। বাবা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'তোমার দৌরাত্ম আর কেউ সহ্য করতে রাজী নয়। নুরার মত লোকও তোমার ভয়ে অস্থির। এরূপ হুমকি বা সত্যি সত্যি অন্যের বাড়ি ঘর জালিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। এই অপরাধের জন্য তোমাকে তিরিশ ঘা বেত মারা হবে। তোমার মায়ের পা ধরে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—তুমি নুরাদের আর ভয় দেখাবে না—তাদের কোন ক্ষতিই তুমি করবে না—তারা বস্তিবাসীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিক্ আর নাই নিক।···বুঝলে, আমি কী বললাম? এখন যাও ঐ পেয়ারা গাছ থেকে সরু সরু শক্ত তিনটি বেতের মত ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসো।'

—অপূর্ব! অপূর্ব! কেমন একতরফা বিচার হলো। আমার বক্তব্যের কোন দাম নেই—কারণ নালিশ তো শুধু আমার নামে। কেন, দাদার নামে তো কোন অভিযোগ নেই! কাজেই আমি সম্পূর্ণ দোষী। তাই অভিযোগ গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিহাসের বিষয় হোল—'আসামী' তার দণ্ড তামিল করার জন্য নিজে বেত এনে দেবে।

বাবাঃ এতক্ষণে অর্ধজানু অবস্থা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচা গেল। বাবা বললেন—'তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। ভাল দেখে বেত আনবে।' মনে হোত—হায়রে বিধি! এ'রকম নিয়ম তোমার বিধান! আমারই সাজা,

আর আমাকেই সেই বেত আনতে হবে। কিন্তু উপায় ছিল না। এইরূপ নিয়মই অনুসরণ করে চলেছিলাম। শুনে হয়ত সবাই আশ্চর্য হবেন, সত্যিই আমি ভালো দেখে তিনটি ছড়ির মত পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এলাম। বাবার হাতে দিলাম। বাবা তখন আদেশ দিলেন, 'হাত বার কর। হাতের তালু মেলে ধরো।' আমি তাই করি। বাবা প্রথম অভিযোগের দণ্ড হিসাবে আমাকে দশ ঘা বেত মারলেন। বাবা যেমনি মারতে শুরু করলেন বেতের ঘায়ে আমি কাঁদছিলাম। বাবা তখন বললেন—'রোঁ মাত্। চোখের জল ঝরুক কিন্তু তুমি কাঁদবে না।' বাবা সজোরে বেত মারলেন। খুবই যন্ত্রণা পেয়েছি। খুবই কান্না পাচ্ছিল কিন্তু কাঁদার হুকুম নেই। কাঁদতে পারি বা না পারি তারপর দ্বিতীয় দণ্ডের জন্য তিরিশ ঘা বেত আমাকে খেতে হবে। তিনি এক খুঁটির সঙ্গে আমার দুটি হাত একসঙ্গে জোড়া করে উপরে তুলে বাঁধলেন। পা দুটিও জোড করে খুঁটিতে বাঁধলেন। তারপর পাছার কাপড় তুলে পাছার উপর শপাং শপাং করে বেত মারতে লাগলেন, আর বলছিলেন—'রো মাত রো মাত্। চোখের জল ফেল কিন্তু মুখে আওয়াজ করবে না। মুখ থেকে আওয়াজ বেরোলে আমি বেশী মারব।' আর তিনি রেগেমেগে বলছিলেন—আর বল্‌বে, ঘরে আগুন লাগাবে? বল, কেন তুমি নুরাকে এমন করে ভাসিয়েছিলে? ফের যদি তোমার নামে নালিশ শুনি তোমাকে আমি মেরেই ফেলবো। তোমার দাদার নামে তো কেউ কোন নালিশ করে না? তোমার বিরুদ্ধে কেন এতসব অভিযোগ? তোমার জন্য কারো কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। তোমাকে তোমার দাদার মত ভালো হতে হবে। তোমার বিরুদ্ধে আমি কারো কাছ থেকে কোন নালিশ শুনতে চাই না।' আমি তখন চেঁচিয়ে কাঁদতে পারছিলাম না, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি। বাবার সং উদ্দেশ্য, বাবার শাসন, আমাকে বাবার অজান্তে কোন এক ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করছিল।

বিচার শেষ হোল। দণ্ড দেওয়া হোল। কিন্তু বাবা যে আমাকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, তাতে কি আমার কোন সংশোধন হয়েছিল? বিন্দুমাত্র আমার জীবনের সংশোধন হয়নি। আমি দুর্দান্ত থেকে আরও দুর্দান্ত হয়ে পড়লাম। আমার মারামারি খেলার মাঠে বেড়ে গেল। খেলার মাঠে আমাদেরই প্রতিবেশী কালুকে আমি মারলাম। সে আমার থেকে বয়সে বড়। দু ক্লাশ উপরে পড়ত। আমি যখন তাকে মারছি, সে তখন মাঠে অন্যদের

ডেকে সাক্ষী মানলো, দেখালো তাকে আমি অন্যায়ভাবে মেরেছি এবং তার নূতন জামা আমি ছিঁড়ে দিয়েছি। আমার বাবার কাছে নালিশ জানাতে সে সোজা আমাদের বাড়ি গেল। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম আমার মামা মাঠে এলেন এবং আমাদের ডেকে বললেন—'তুমি শীঘ্র বাড়ি যাও তোমার বাবা তোমাকে ডাকছেন।' বুঝতে আমার কিছু বাকী রইল না। বুঝলাম বাড়ি গেলে বাবার বিচারে আমার দণ্ড হবে এবং সেই দণ্ড আমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। এই অবস্থায় আমার মনে হচ্ছিল বাড়ি না গিয়ে পালিয়ে গেলে কি হয়? না, পালাবো না। যাব বাবার কাছে। আমি ভাল ছেলের মত বাড়ি এলাম। বাবা আমাকে দেখেই গর্জন করে উঠলেন'—কেন তুমি কানুকে মেরেছ? কেন তুমি তার জামা ছিঁড়েছ?' আমি যখন মাঠ থেকে মামার সঙ্গে বাড়ি আসছিলাম, তখন অনেক ছেলে আমার পেছনে পেছনে আসছিল আমার অবস্থা কি হয় দেখার জন্য। তারা সবাই শুনলো বাবার সেই প্রশ্ন—'কেন তুমি কানুকে মেরেছ?' আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, উত্তর দিইনি বাবা আবার রেগে বললেন—'তোমায় বলতেই হবে, কেন তুমি তাকে মারলে কেন তার জামা ছিঁড়লে?' বাবার অভ্যেস ছিল ধীর মস্তিষ্কে বিচার করে তবে তিনি সাজা দিতেন। হঠাৎ লাঠি ছাতা ইত্যাদি দিয়ে মেরে জখম করে দেওয়ার মত মার তিনি কখনই মারতেন না।

বাবা কোন মেলা থেকে বেতের সরু ছড়ি কিনে রেখেছিলেন। পেয়ারা গাছের ডালের ছড়ির স্থান নিয়েছে এখন মেলায় কেনা বেতের ছড়ি। বাবা দুটি ছড়ি বার করে আনলেন এবং আমাকে হুকুম দিলেন—'তুমি জামা খুলে দেওয়ালে বুক লাগিয়ে দাঁড়াও।' তারপর তিনি আমার পাছার কাপড় তুলে পিঠ থেকে পা পর্যন্ত গুণে গুণে পঞ্চাশটা বেতের ঘা মারলেন। তারপর একটা ঘরে আমাকে বেঁধে রাখলেন। আর আমাকে জানিয়ে দিলেন সেই রাতে আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। এমনি ধরনের বহু ছোট ছোট ঘটনা আছে যাতে আমি দোষী বলে বাবার কাছে প্রমাণিত হয়েছি—আমার স্বপক্ষে বলার কিছুই থাকত না, কারণ—'তোমার দাদার বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ তো থাকে না, সব নালিশই তোমার উদ্দেশ্যে আসে কেন?' সত্যি দাদা ভাল, আমি খারাপ। দাদা সবার প্রিয়, আমি সবার কাছে অপ্রিয়। আমি দুরন্ত ও দুর্দমনীয়, কাজেই বাবা আমাকে ক্ষমা কী করে করবেন; এই বলে মনকে সান্ত্বনা না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। কিন্তু দৃষ্টির অগোচরে অনেক কিছু

ঘটছিল। বাবা আমাকে দিয়ে শিব গড়তে চাইছিলেন। পাড়ার লোকে বলত গোলাববাবু তাঁর ছোট ছেলেকে শিব গড়ার বহু চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেই ছেলে হবে আস্ত বাঁদর। এই রকম কথা আমি অনেকের মুখে শুনলাম। আমার তখন মনে হয়েছিল—হই না কেন বাঁদর, কিন্তু হব আমি শ্রেষ্ঠ বানর—'হনুমান'। এইরূপ মনের কথা মনেই বিলীন হয়ে যেত।

বাবা আমাকে এমন শাস্তিও দিয়েছেন, সেই শাস্তির নমুনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। একদিন কোন এক নালিশ নিষ্পত্তি করে তিনি যে কঠোর সাজা দিয়েছিলেন তাতে আমার মা, ঠাকুরমাও বিচলিত হলেন। বাবা আমাকে এক মাস বাড়ির নির্জন কক্ষে বন্দী থাকার আদেশ দিলেন। বললেন—'তুমি উত্তরের ঘরে বন্দী থাকবে। সেখানে তোমাকে খাবার দেওয়া হবে। আর তুমি ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। মাত্র স্নান, পায়খানা করতে বেরোবে। তোমার দিদি পাহারায় থাকবে। এই মাসটার ভেতর দুর্গাপূজো আছে, কালীপূজো আছে। আমরা পূজোর উৎসবে বেরোব, আমোদ করব। প্রতি বৎসরের মত এবারও পূজোর সময় আমরা বাড়ির সবাই গাড়ি করে ঠাকুর দেখতে যাব। তোমাকে নেব না। দেওয়ালীর সময়ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না, বাজী বানাতেও পারবে না, বাজী পোড়াতেও পারবে না। এইসব যদি তুমি ঠিক ঠিক পালন করতে পার, তবে সাজা তুলে নেব। নইলে আরও সাজা পাবে। তোমার মা, ঠাকুরমার পায়ে মাথা দিয়ে তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে, আর প্রতিজ্ঞা করে বলতে হবে, তুমি আর দুষ্টুমী করবে না। তোমার বিরুদ্ধে আর কেউ কখনও কোন নালিশ জানাবে না। এইটুকু শর্ত যদি তুমি রক্ষা করতে পার, তবেই তুমি মুক্তি পাবে। তোমার মা, ঠাকুরমা তোমাকে খুব ভালবাসবে।' বাবা এক তরফা এইসব বলে গেলেন। আমার কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ তিনি শুনলেন না। কোন দিনই তাঁর বিচার ও দণ্ডের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করিনি। আমি যখন ৪।৫ বছর পরে বিপ্লবী সংঘের সদস্য হয়েছি, তখন আমার বন্ধু গণেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত—'সব তুমি মুখ বুজে মেনে নিতে? তোমার চুপ করে থাকার পেছনে কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে তোমার বাবা, মা সন্দেহ করতেন না?'

আমি গণেশকে বলতাম—আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, তবে কেন তাঁরা ওরকম ভাববেন? তাছাড়া তাঁরা কতবার তো প্রমাণ পেয়েছেন যে আমার মধ্যে কপটতা ছিল না। যা সত্যি বলে মনে করব তা করবই—তাতে আমার

যা হবার তাই হবে। আমার এইরূপ চরিত্রের প্রমাণ পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আমি হঠাৎ কিছু করে ফেলব না।'

এখন বড় হয়েছি। স্কুলে নবম বা দশম শ্রেণীতে পড়ি। বাবার শাসন দণ্ডের রূপ কিছুটা পরিবর্তন হলেও সেই শাসন ও দণ্ড আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। আমার অপরাধের রূপ ও গুরুত্ব বদলেছে। যেমন না কি— আমি ও দাদা পাশের বাড়িতে একটি ঘরে বসে পড়ছি, তখন সন্ধ্যে আটটা। শোনা গেল একজন হাঁকছেন, 'গোলাববাবু, গোলাববাবু! কণ্ঠস্বর আমাদের চেনা। আমাদের মিউনিসিপ্যাল হাই ইংলিশ স্কুলের খুব পুরানো দফতরি। এই রাত্রে বাবার সঙ্গে দরকার কি? দফতরি উচ্চকণ্ঠে বাবাকে জানালো— আপনার নামে হেডমাস্টারমশায় একটি জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন।' বাবা তাকে বললেন—'তুমি চিঠিটা রেখে যাও। যে যাচ্ছেন তাঁর হাতে দিয়ে দাও।' 'না বাবু আর কারো হাতে চিঠিটা দিতে পারব না। হেডমাস্টারবাবু বলে দিয়েছেন একমাত্র আপনার হাতে দিতে।' 'আচ্ছা তাহলে একটুখানি দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।'

বাবা খুঁটিযুক্ত খড়ম পায়ে দিতেন। আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে আমরাও ঘরে খড়ম ব্যবহার করতাম। দাদা ও আমি বাড়ির ভেতর থেকে খড়মের আওয়াজ শুনতে পেলাম। স্পষ্ট মনে হচ্ছিল বাবার খড়মের শব্দ— বুঝেছিলাম বাবা আসছেন। রাত্রে দফতরির জরুরী চিঠি নিয়ে আগমন এবং বাবাকে ছাড়া আর কাউকে দেবে না জেনেই দাদা ও আমি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করলাম এবং বুঝে নিয়েছিলাম চিঠির গুরুত্বটি। এই চিঠি হেডমাস্টারমশাই নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে দারুণ নালিশ জানিয়ে বাবাকে লিখেছেন। বাবা দফতরির কাছে এলেন। দফতরি বাবাকে চিঠি দিয়ে পিয়ন বইয়ে সই করিয়ে নিল। দফতরি বলল—আমি তো এখন চলে যাব, আপনি কি কোন উত্তর দেবেন?' বাবা নিবিষ্ট মনে চিঠিটা পড়ে নিলেন, তারপর দফতরিকে বললেন—'আপনি এখন আসুন, পরে আমি হেডমাস্টারমশায়কে উত্তর পাঠাবো।' তারপর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বাবা ডাকলেন—নন্দলাল, অনন্তলাল, তোমরা দু'জনেই এসো।' আমরা দু'জনে ভেবে নিলাম, যা ভেবেছি তাই। আজকে একটা রাজনৈতিক সমাধান বাবার সঙ্গে হবে। দু'জনেই নির্ভয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়ালাম, তবুও ভেতরে ভেতরে বুক কাঁপছে। বাইরে অবশ্য তার প্রকাশ নেই। বাবা কতক্ষণ দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলেন, তারপর তিনি হেডমাস্টারমশায়ের চিঠিটা আমাদের পড়তে দিলেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—'আপনার দুই ছেলে আজ স্কুলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলে সভা করেছে এবং স্কুলে অসহযোগ চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনার ছোট ছেলে অনন্ত স্ট্রাইক চালাবার জন্য ছোট ছোট কেন্দ্র গঠন করবার ভার নিয়েছে এবং গঠন করছে। এ আমাদের সঠিক জানা আছে। অনন্ত ছেলেদের মধ্যে উস্কানি দিচ্ছে। এ আমাদের একেবারে অসহ্য। এর বিরুদ্ধে আমাদের স্কুলের পক্ষে ডিসিপ্লিনারী-অ্যাকশন্ নিতে হচ্ছে। তাই আপনাকে জানাচ্ছি আপনি ওদের দু'জনেরই নাম কাটিয়ে স্কুল থেকে সরিয়ে নিন নইলে আমাদের পুলিশের সাহায্য নিতে হবে।

তারপর বাবা, দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে এবং কি করেছ, তা আমাকে খুলে বল। অনন্তও বা কি করেছে, তা সঠিক জানাও।' দাদা একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'কই এমন কিছু ঘটনাতো ঘটেনি।' বাবা বলতে লাগলেন 'মনে করে দেখ কোন ছেলেকে স্কুলে স্ট্রাইক করার কথা বলেছিলে নাকি? কিংবা অসহযোগ নিয়ে আলোচনা করছিলে কি-না যখন কোন মাস্টারমশায় সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দু'একটা কথা শুনে ঐরূপ মনে করেছেন যে তোমরা স্ট্রাইকে যোগ দিচ্ছ।' দাদা উত্তর দিল, 'না, এমন কোন কথা বা আলোচনা আমরা করিনি।' এতক্ষণ আমার মধ্যে সংঘাত চলেছিল, বাবাকে সত্যি সব কথা বলে দেব কি-না। আজ হোক কাল হোক বাবা জানবেন, বলতেও হবে। তবে গোপন কেন, বলেই দিই। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। গান্ধীজি ছাত্রদের বলেছেন, 'তোমরা গোলামখানা ছেড়ে এসো। ইংরেজের শিক্ষায়তন সব বন্ধ হয়ে যাক্। তাদের সঙ্গে আর কোন মিল হতে পারে না, যতক্ষণ না ভারত স্বরাজ অর্জন করছে।' এইরূপ ঘোষণার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংঘ মাস্টারদার নেতৃত্বে ছাত্রদের অসহযোগ ও যুবকদের সমর্থনে সর্বাত্মক স্ট্রাইক চালাবার জন্য মন স্থির করেছিল। সেইরূপ নির্দেশ পেয়েই আমাদের মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম এবং ছাত্রদের স্ট্রাইক করার জন্য প্রস্তুত করছিলাম। যেদিন চিঠিটা এলো সেইদিন আমরা স্কুল ছুটি হওয়ার পর স্কুলের কাছে একটি ময়দানে সভা করি। উপস্থিত ছিলেন মাস্টারদা, অনুরূপদা, নির্মলদা, আর অন্যরা। সেখানে দিন ধার্য হয় এবং স্থির হয় যে স্কুলে স্ট্রাইক করা হবেই। তাঁরা

বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমিও বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বাবা সন্দেহাতীত হওয়ার জন্য আমাদের দু'জনকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন—ভেবে দেখ, কোন সভা করনি? দু-চার জন মিলেও গল্প-গুজব করনি? স্ট্রাইক করা উচিৎ, যারা অসহযোগ করবে তারা খুব ভালো করবে, তাদের আমাদের সমর্থন জানানো উচিত ইত্যাদি বলনি? দেখ, খুব ভাল করে ভেবে দেখ এরকম কোন কথাবার্তা কোন গ্রুপে বসে করনি? আমি খুব ভাল করে জেনে নিতে চাই, তারপর হেডমাস্টার-মশাইকে খুব কড়া করে চিঠির উত্তর দেব যে তাঁর সংবাদ সব মিথ্যা, সব ভুল।' দাদার বক্তব্য শেষ হয়েছে। বাবা আমার উত্তর শুনতে অপেক্ষা করছেন। আমাকে বলতে লাগলেন—'সত্যি কি হয়েছে বল। এতক্ষণে আমি যেটা ভাবছিলাম, আমি যা বুঝে নিতে চাইছিলাম তার একটি মোটামুটি চিত্র মানশ্চক্ষে খুঁজে পেলাম। তারপর বললাম—'বাবা আমরা ঠিকই করেছি স্কুল স্ট্রাইক করব।' বাবার তখন রক্তবর্ণ চোখ। তিনি প্রশ্ন করে সঠিক বুঝে নিলেন—'তবে হেডমাস্টারবাবু যা লিখেছেন তা ঠিক?' হ্যাঁ।' স্ট্রাইক করার জন্য প্রস্তুতি সভার কথাও ঠিক?' 'হ্যাঁ ঠিক।' স্কুলের সংলগ্ন ময়দানে তোমাদের সভা হয়েছিল?' হ্যাঁ।' 'তুমিও বক্তৃতা দিয়েছিলে?' 'হ্যাঁ দিয়েছিলাম।' আগে বলছিলে না কেন?' 'ভাবছিলাম, বলা উচিৎ হবে কিনা।' 'এখন তোমার কিসে মনে হোল যে আমাকে বলা উচিৎ?' তুমি তো আজ না হয় কাল শুনবেই তবে গোপন করি কেন? বলাই উচিৎ। তোমার যা ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ তুমি তা নাও। আমাদের প্রধানশিক্ষক যা করতে চান করুন। পুলিশের সাহায্য নিতে চান তো নিতে পারেন। আমি কোন কিছুতেই পশ্চাৎ অপসারণ করব না স্থির করেই তোমাকে যা বলার বলে দিলাম। এখন তোমার যা ইচ্ছে কর।' বাবা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। রাগে গরগর করতে লাগলেন। আর রেগে গিয়ে কিছু করতে না পেরে দু'পায়ের খড়ম দিয়ে মেঝের উপর ঠোকর দিতে লাগলেন। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'গেট আউট। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।' ডাক দিলেন—'ভরত, ভরত, কৈলাশ—তোমরা এই দুইজনকে বাড়ির বাইরে ছেড়ে দিয়ে এসো।' কৈলাশ হলেন আমারই দূর সম্পর্কীয় এক দাদা আর ভরত হলেন আমার নিজের ছোট মামা। তারপর বাবা বলতে লাগলেন—আজ থেকে তোমরা আমার ত্যাজ্যপুত্র। যাও, যাও, বেরিয়ে যাও। আমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় আর ঢুকবে না। বাড়ি-ঘর বিক্রি করে, তোমার মা ও আমি বৃন্দাবনে চলে

যাব।' এই বলে বাবা রাগে গরগর করতে করতে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণ অর্থাৎ মিনিট দুই স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর পড়বার ঘরে গিয়ে বসলাম।

মুখে কোন কথা সরছিল না। বসে বসে ভূত ভবিষ্যৎ অনেক ভাবলাম। করবার কিছু ছিল না। আঘাত আছে, বাধা আছে, তাইত বক্ষে পরাণ নাচে! চরম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। নাটকীয়ভাবে ঘটনা সব ঘটে গেল। ভেবেছিলাম নাটকের বুঝি এখানেই পরিসমাপ্তি—আমরা দুই ভাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাব। কিন্তু তখনও জানতাম না মা কোথায়, মায়ের ভূমিকা কী। মা বাড়ি ছিলেন না পাড়ায় একবাড়িতে শনি পূজার নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি এসে বাবার কাছে সব শুনলেন। তিনি মাকে তাঁর ভগ্ন মনের কথা জানিয়ে বললেন—'আর মিথ্যা সংসার বন্ধনের প্রয়োজন কি? চল আমরা বৃন্দাবন-ধামে চলে যাই। ইন্দুই একমাত্র সমস্যা। সে ত কোন দিনই না কি বিয়ে করবে না। তাকেও সঙ্গে নেব।'

বাবার অবস্থা দেখে মা বিচলিত হলেন। ছেলেরা বিতাড়িত হবে, স্বামীও বৃন্দাবনবাসী হবেন, সংসার ভেঙ্গে চুরমার হবে। কি নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হতে তাঁরা চলেছেন। তিনি যেন সেইরূপ অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারছিলেন না। এই অবস্থা তাঁর কাছে অতি মর্মান্তিক। মা অস্থির হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে মা দেখি আমাদের পড়ার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। আলু থালু বেশ তাঁর, চোখ থেকে অনবরত জল ঝরছে। মা'র সেই কঠোরতা একেবারে যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তিনি অতি বিনয় এবং নম্রতার সঙ্গে বলতে লাগলেন—'দেখ্‌ তোদের বাবা একেবারে কাতর হয়ে পড়েছেন। তোরা বাড়ি থেকে চলে গেলে, তিনি আর বাড়িতে থাকবেন না, এটা সুনিশ্চিত। তিনি তোদের ওপর রাগ করলেও তোদের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ। কাজেই তিনি বাঁচবেন কি-না সেই সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট চিন্তা আছে। তাই আমি বলি তোরা তোদের এই সংকল্প পরিত্যাগ কর। তোরা তোদের বাবাকে গিয়ে বল্‌ যে তোরা স্ট্রাইক করবি না, তাঁর কথা শুনে চলবি।' মা এই সব কথা এত করুণভাবে বলছিলেন যে সত্যি আমার কান্না পাচ্ছিল। সত্যিই তো বাবা মাকে কষ্ট দেবার জন্য আমরা স্ট্রাইক করছি না। আমরা স্ট্রাইক করছি ইংরাজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। মার এই আকুল প্রার্থনা শুনে মন খুব নরম হয়ে পড়েছিল। সেই সময়

নিজেকে সম্বোধন করে মনে মনে বলছিলাম 'বাবার বৃন্দাবন চলে যাওয়া মার অশ্রুজল ও ক্রন্দন আমাকে বিচলিত করলে চলবে না, আমাকে দৃঢ় হতে হবে। মাকে প্রত্যুত্তরে বললাম, 'মা ক্ষমা কর। সংকল্প থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না, আমরা বিচ্যুত হব না। মা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছিলেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি গলায় কাপড় দিয়ে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইলেন, বললেন : 'তোরা আমাকে ভিক্ষা দে। তোদের কাছে ভিক্ষে চাইছি। মা'র স্নেহ, ভালবাসাকে অবহেলা করে কোনদিনই কোন বড় কাজ সফল হবে না। তোরা আমার কথা মেনে নে, তোরা স্ট্রাইক করবি না সেটা তোদের বাবার কাছে গিয়ে বল।" মা'র এইসব পাগলের উচ্ছ্বাস আমাদের অন্তর খুবই স্পর্শ করতে লাগলো। আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমিও যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। মা'কে সান্ত্বনা দেবার মত আমার কোন ভাষাও ছিল না। আর এও বুঝেছিলাম যে কোন কথায় তিনি সান্ত্বনা পাবেন না—সান্ত্বনা পেতে পারেন যদি আমরা বাস্তবে বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাই এবং বলি আমরা স্ট্রাইক করবো না, তোমার কথাই মেনে চলবো। কিন্তু আমরা যে অঙ্গীকারবদ্ধ। তা কি পারি। সমস্যা। কি করব - ভাবিয়ে তুললো। আমি দাদাকে বললাম—'দাদা এসো একটু শোন।' এই বলে দাদাকে নিয়ে একটু দূরে গেলাম এবং মা শুনতে না পাওয়ার মত করে একটু পরামর্শ করলাম। সব বুদ্ধিই আমার—'দাদা এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারি? মহাত্মা গান্ধী কি বলবেন বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে স্ট্রাইক করতে? আর যা পরিস্থিতি চোখের সামনে দেখছি, তাতে স্ট্রাইক করলে কি ভাল হবে? আমার মনে হয় দাদা এই জটিল অবস্থার সমাধান হচ্ছে এখনই বাড়ির অবস্থাকে চরম পর্যায়ে না নিয়ে একটা কোন মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। তাই বলছি এখন চল বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিই। তাঁকে ও মাকে খুশী করি। কয়েকদিন পর অবস্থা একটু শিথিল হলে আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করে নেব।' দাদা আমার পরামর্শে মত দিলেন। মাকে গিয়ে বললাম—'মা যত অপরাধই করি না কেন, তুমি যখন বলছ, তোমার কথাই মেনে নেব।' চল বাবার কাছে যাই, বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

২

রোমের এক প্রখ্যাত জেনারেল করিয়লেনাস দুঃখে ক্রোধে স্বেচ্ছায় দেশ-ত্যাগ করে চির শত্রু ভলসিয়ানদের শিবিরে গিয়ে তাঁরই সমকক্ষ জেনারেল অফিডিয়াসের সঙ্গে দেখা করলেন। করিয়লেনাস অতি নাটকীয় ভাবে তার পরিচয় দিলেন অফিডিয়াসের সৈন্যশিবিরের মধ্যে। অফিডিয়াস রোমের সীমানায় শিবির স্থাপন করেছেন। তিনি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে রোম আক্রমণ করবেন। প্লেবিয়ান (সাধারণ লোক)-দের নিয়ে এই সৈন্য সমাবেশ। পেট্রিশনর্দের (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের) নিয়ে রোম করিয়লেনাস জেনারেলকে হারিয়ে আজ খুবই বিব্রত—খুবই চিন্তিত। তাঁরা ভীত ত্রস্ত হয়ে আছেন যখন জানতে পারলেন অফিডিয়াস করিয়লেনাসকে তার অর্ধ সৈন্যের পুরোপুরি ভার দিয়েছেন যেন তিনি নিজ ইচ্ছামত সৈন্য পরিচালনা করে রোমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনে করিয়লেনাসের মা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি উভয় সংকটের মধ্যে দোল খাচ্ছেন—এক দিকে নিজের দেশ রোম আর একদিকে তাঁরই সন্তান—জেঃ করিয়েলেনাস। কারো অমঙ্গল—সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ার তার প্রসিদ্ধ নাটক করিয়েলেনাস বইতে মায়ের মনের অবস্থা প্রকাশ করেছেন। মায়ের মনের ঝড় প্রবলভাবে বইছে, তিনি অসহায় এক রমণী তবু তিনি মা। জননীর প্রকাণ্ড দাবী নিয়ে মলিন বেশে, খালি পায়ে, রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত প্রবেশ করলেন করিয়লেনাসের শয়ন কক্ষে। করিয়লেনাস তখনও মধ্য রাত্রে ঘুমোতে যায়নি। প্রভাতেই তার সৈন্যরা রোম আক্রমণ করবে। মাকে নিজ শয়ন কক্ষে দেখতে পেয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

করিয়লেনাস :—একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

মা—'না বাবা স্বপ্ন নয়। সত্যিই তোমার মা ছুটে এসেছে তোমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে।' কি সে প্রার্থনা মা'। 'বাবা তুমি এ কি করছ? তোমার ব্যক্তিগত কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে তুমি কি মাতৃভূমির প্রতি অস্ত্র ধারণ করে

প্রতিশোধ নিতে পার? তা যে আমার ছেলে কখনও করতে পারে না। তুমি তোমার এরূপ সংকল্প থেকে বিরত হও। তুমি ফিরে যাও। না মা তা আর হয় না। ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তোমার বিজয়শকট আমার বুকের ওপর দিয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না যে আমার ছেলে মাতৃভূমির পরাজয় ও ধ্বংসের জন্য দায়ী। বাবা তুমি ফিরে যাও আর নইলে তোমার সহস্র বিজয় শকট বিজয় নিশান উড়িয়ে আমার বুকের উপর দিয়ে রোম আক্রমণ করবে।' করিয়েলেনাস বলল—'মা তুমি জয়ী হও। মার কাছে আমার পরাজয় আমার মৃত্যু অনেক শ্রেয়। মা তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যাও রোমবাসীদের বলে দাও করিয়লেনাস মরেছে। করিয়লেনাস বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণিত হয় এবং ভল্সিয়ানরা তার প্রাণ সংহার করে।'

আমার কৈশোরে তেমন একটি নাটক রচিত হচ্ছিল যে আমাকে হয় স্কুল ষ্ট্রাইক করার সংকল্প ছাড়তে হবে না হয় মাকে অবহেলা ও বাবাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে স্কুল ষ্ট্রাইক চালাতে হবে। এইরূপ উভয় সংকটের মাঝখানে মা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন 'সংকল্প পরিত্যাগ কর তোমার বাবার কথা মেনে নাও। মা আগে আগে চললেন, আমরা দুই ভাই তাঁর পেছনে বাবার কাছে যাচ্ছিলাম।

তখন চট্টগ্রামে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। টেবিলে হ্যারিকেন জ্বলছে, বাবা চেয়ারে ঘোর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছেন। অবস্থাটা গুরুগম্ভীর। মা গাম্ভীর্যের অবসান ঘটালেন। মা বললেন—'অনন্ত, নন্দ দু'জনেই তোমার কাছে এসেছে ক্ষমা চাইতে।' আমি বললাম—'বাবা আমরা ভুল করেছি, অপরাধ করেছি, আমরা তোমার কথা মেনে নেব, স্কুল ষ্ট্রাইক আর করব না। বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমার কথা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না। বাবা মুখ খুললেন—'তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তোমাদের স্কুল ষ্ট্রাইক করতেই হবে। এই অবস্থায় এখন কি করে সম্ভব তোমাদের সংকল্প পরিত্যাগ করা।' আমি উত্তর দিলাম—'অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করে ঐরূপ একটি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা যায় বোধ হয়। তাই ভেবে ঠিক করেছি, স্কুলে ষ্ট্রাইক করব না। মার মুখে শুনে যা বুঝলাম আমরা স্কুলে ষ্ট্রাইক করলে আমরা মা, বাবা দু'জনকেই হারাবো। আমাদের সামনে প্রশ্ন মা, বাবাকে হারাবার বিনিময়ে আমাদের স্কুল ষ্ট্রাইক করা কি উচিৎ? এইরূপ অবস্থাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা মহাত্মা গান্ধী কি আমাদের স্কুলে ষ্ট্রাইক করতে বলবেন? যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি তাঁরা

সেইরূপ উপদেশ দেবেন না। তাই আমরা মনস্থ করেছি স্কুল ষ্ট্রাইক করবো না। তুমি ও মা আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। বাবা তখন তার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বললেন—ঐ দেখ দেওয়ালে ঠাকুরদা—ঠাকুরমার ফটো টাঙ্গানো রয়েছে, ছবির কাছে যাও তাঁদের পা ধরে প্রতিজ্ঞা কর যে তোমরা আর এসবের মধ্যে থাকবে না।' আমরা বাবার কথা অনুযায়ী তাই করলাম। মা ছুটে এসে আমাদের দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন—'তোদের বাবার পায়ে ধরে বল যে তোরা ওঁর কথা মেনে চলবি।' আমরা তাই করলাম। মনে হল সাময়িক ভাবে বাবা ও মা খুশি হয়েছে। তারপর আমরা বাবাকে জানালাম সোমবার দিন স্কুল খুললে আমরা স্কুলে যাব না। না যাওয়ার হেতুটি বাবা সহজেই উপলব্ধি করলেন, যে আমাদের স্কুলে যাওয়াটা লজ্জার বিষয়। বাবা বুঝে বললেন—আচ্ছা তাই হবে। স্কুল থেকে সাতদিনের ছুটি নেবে।'

রাত তখন দুটো। আমরা শুতে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে জলখাবার খাওয়ার সময় দাদার সঙ্গে পরামর্শ করলাম—স্কুলে না যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা স্কুলে যাব এবং যদি ক্লাশ হয় ক্লাশেও যোগ দেবো। কে কি টিটকারি দেয় তাও শুনব। কারণ আমাদের এইসব অবস্থা বিবেচনা করে পরের স্টেপ ঠিক করবো আর ইতিমধ্যে মাস্টারদা অনুরূপদাকে বাড়ির অবস্থা জানাবো। সকালে বাবাকে বললাম—স্কুলে না যাওয়াটা উচিত হবে না। আমরা যে স্কুলে ষ্ট্রাইক করছি না, তা সবাই জানুক এইটি গোপন রাখার জিনিস নয় গোপনে থাকবেও না।' বাবা তখন একটু চিন্তা করে বললেন—'তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য ছেলেরা চটে যাবে এবং তোমাদের বিশ্বাসঘাতক বলতে পারে এবং হয়ত তোমাদের মারতেও পারে।' আমি বাবাকে জানালাম—তা হবে না। কারণ আমরা যে দলে আছি সেই দলের সম্মতি নিয়েই তা করবো এবং আমি জানি, আমাদের দল সেই সম্মতি আমাকে দেবেই।' আমার মনে মনে জানা ছিল, সম্মতিটা কি ভাবে নেব এবং কি করবো।

কলকাতায় স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেছে। সেই কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হলো ছাত্ররা স্কুলে ও কলেজ থেকে চিরকালের মত বেরিয়ে আসবে আর সরকারী শিক্ষায়তনগুলিকে সম্পূর্ণ অচল করে দেবে। নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং দিন ধার্য করেছিলেন কোন্‌দিন ছাত্ররা স্কুল ও কলেজ ষ্ট্রাইক করবে। চট্টগ্রামে প্রতি স্কুলে বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল স্কুল সাতদিনের জন্য

ছুটি ঘোষণা করে দিল যেন ছাত্ররা একত্র হতে না পারে এবং ষ্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত না নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমি ঠিক করলাম এই সাতটি দিন সারাদিন, সারা সন্ধ্যা, প্রতি ছাত্র বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঠিক করবো যেন তারা স্কুল যেদিন খুলবে সেদিন ষ্ট্রাইক করে চিরকালের মত স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আমি মাষ্টারদা ও অনুরূপদাকে বললাম, তারা দু'জনেই আমাকে সমর্থন জানালেন। অনুরূপদা একটি ফুলস্কেপ কাগজের উপর এই ধরনের একটি বিশেষ বক্তব্য লিখলেন, 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, যে সরকারী স্কুল, কলেজ আমি চিরকালের মত পরিত্যাগ করবো। যে শিক্ষা মানুষ করে না, গোলাম তৈরী করে সেই শিক্ষা আমি মানি না। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসমাপ্তি আমি চাই। সেই-জন্য আমি এই অসহযোগ আন্দোলন সফল করার জন্য শিক্ষায়তন বর্জন করবো এবং অন্যান্য ছাত্রবন্ধুদের অনুরোধ জানাচ্ছি তোমরাও তাই করো। চলো আমরা এই ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষায়তন বর্জন করি।' একটি কাগজে এই সব লিখে প্রত্যেক ছাত্রবন্ধুর কাছ থেকে সই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বো ঠিক করলাম।

মনে আছে শীতকাল। সকালবেলা বাড়িতে আমি খুব অন্যমনস্কভাবে ঘোরাফেরা করছিলাম। মনে মনে স্থির করেছি আজই বাবাকে আমার মনের কথা বলবো। বাবা যদি আমাকে অনুমতি না দেন তবে আমি চিরকালের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। আব দাদাকে এই বলে আসন্ন ষ্ট্রাইক করা থেকে বিরত করেছিলাম—একসঙ্গে দু'জনে ষ্ট্রাইক করতে গেলে মা-বাবা সহ্য করতে পারবে না, অন্যথায় অনর্থ ঘটাবে। তাই তুমি বাড়ি থেক, আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবো।' সময় ঠিক করেছিলাম দুপুরের খাওয়ার পর মা দিদি যখন খাবেন, আর বাবা যখন তার শোবার ঘরে বিশ্রাম করবেন আমি তখন আমার সিদ্ধান্ত বাবাকে জানাবো। এইরূপ ভাবছিলাম বলে নিশ্চয় হয়ত মা আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন আমি হয়ত অসুস্থ তাই তিনি আমাকে দু'একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন, তোর কি জর হয়েছে?' 'না মা, ও কিছু নয় জর হয়নি।' যখন বাবা, দাদা ও আমি একসঙ্গে বসে খাচ্ছি তখনও মার চোখ আমি এড়াতে পারিনি। মা তখনও আবার জিজ্ঞেস করলেন—'দেখ তোকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোর কোন একটা অসুখ হয়েছে। আমি বললাম 'আমি কিন্তু অসুস্থতার কোন লক্ষণ

দেখছি না।' সেদিন সারা সকালই আমার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। আমার সিদ্ধান্ত বাবাকে জানাবো। বাবা কোনমতেই মেনে নেবেন না। তিনি অত্যন্ত চটে যাবেন। তারপর আমি নিজে স্থির করেছি, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। আমি চলে যাই আর না যাই তিনি আমায় বার করে দেবেনই। মা, বাবাকে চিরকালের মত ছেড়ে চলে যাবো ; বাড়ি আমাকে ছাড়তে হবেই। এইসব চিন্তা মাঝে মাঝে আমাকে অস্থির করে তুলছিল—যেন তার কোন বহিঃপ্রকাশ না হয়, তার জন্যই খুবই চেষ্টায় ছিলাম। তবু মায়ের মন যেন টের পাচ্ছিল সেই জন্যই তিনি বার বার আমার মুখ দেখে প্রশ্ন করছিলেন—'তোর শরীরটা কি ভালো নেই ? তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন ?,

আমার খাওয়া শেষ হলো। বাবা তাঁর শোবার ঘরে গেলেন। মা, দিদি রান্নাঘরে বসে খাচ্ছেন। আমি এবার সাহস করে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বাবাকে বললাম—'বাবা তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।' বাবা মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন : কি তোমার প্রার্থনা ? 'বাবা ডাক এসেছে। ইংরেজদের গোলামখানা আমরা ছাড়বো। আমি আর স্কুলে পড়বো না। আমি ষ্ট্রাইক করবই। তোমার অনুমতি নিয়েই আমি ষ্ট্রাইক করবো। সে জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। বাবা—না না তা হবে না, আমি তোমাকে ষ্ট্রাইক করার অনুমতি দিতে পারি না। তুমি ষ্ট্রাইক করবে না। এই সেদিন তুমি প্রতিজ্ঞা করলে আমার কথা শুনবে আজকে আবার নতুন কথা কেন ?'—আমি তো তোমার কথা শুনবো বলেই তোমার কাছে অনুমতি চাইছি।

বাবা চেঁচিয়ে বললেন : 'শোন, শোন, তোমার গুণবান ছেলে কি বলছে। সে আমার কাছে অনুমতি চায় স্কুলে ষ্ট্রাইক করবার জন্য। না, না, তা হবে না। দেখ এইসব দুষ্টুমি বুদ্ধি ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে কোন বাধাই দিতাম না যদি তুমি সি. আর. দাশ, যতীন্দ্রমোহনের মত ব্যারিস্টার হতে, যদি তুমি নৃপেন ব্যানার্জির মত কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হতে। তোমার লেখাপড়া অনেক বাকী। ইংরাজী কাগজ পড়ে কিছুই বোঝ না। এই বিদ্যা নিয়ে কোন মতেই স্বদেশী আন্দোলন করা চলে না, তাই তোমাকে আমি না করছি। তুমি আমার কাছ থেকে পরিস্কার জেনে নাও, যতদিন তোমার শিক্ষা শেষ না হবে, ততদিন তুমি কোন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবে না।' আমার জবাবটি জানা ছিল। সঙ্গে

সঙ্গে বাবাকে উত্তর দিলাম (অবশ্য খুব বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে) 'ধর বাবা' আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। সেই জোয়ার আমার শিক্ষা শেষ করার জন্য কি অপেক্ষা করে বসে থাকবে ? যদি সব অভিভাবকরা তাদের ছেলেদের জন্য এই রকম মত প্রকাশ করেন, যে আগে তারা শিক্ষা শেষ করবে এবং তারপর আন্দোলনে যোগ দেবে তাহলে সর্বাত্মক আন্দোলনের কোনদিনই সম্ভাবনা নেই। কাজেই চিন্তা করে দেখলে আমাদের সকলেরই স্বীকার করতে হবে, যে যে-স্তরে অধ্যয়নে ব্যস্ত তার সেখান থেকেই আন্দোলন শুরু করতে হবে। যাঁরা গান্ধীজি, দেশবন্ধু, জে. এম. সেনগুপ্তের মত শিক্ষা শেষ করেছেন তারা সেই পর্যায় থেকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ তাদের সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রামে সামিল হবে। এই ত মূল কথা আমি বুঝি। যদি ভুল বুঝে থাকি তবে তুমি আমাকে শুধরে দাও। বাবা আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার মত কোন কিছু খুঁজে না পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন ও রেগে উঠে মাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—'দেখ, দেখ, তোমার ছেলে অনন্ত আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দিচ্ছে।' তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে চললেন—'তোমার যুক্তি, তর্ক আমার কাছে কোন কাজে লাগবে না। তুমি ইংরাজি খবরের কাগজ পড়তে পার ? এক লাইনও বোঝ ?' আমি খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলাম—'সব না বুঝতে পারলেও নিশ্চয় কাজ চালাবার মত ইংরাজি বুঝি।' বাবা একটু ব্যঙ্গ করে বললেন—'ক্লাস টেনের ছেলে তিনি আবার স্টেটসম্যানের' ইংরাজী বোঝেন। এই নাও হাতের কাছে 'স্টেটসম্যান' আছে, এইটুকু পড়ে কি বুঝলে আমাকে বল ত ? আমি পড়লাম এবং যা বুঝেছি তা বাবাকে বুঝিয়ে বললাম। বোধহয় মোটামুটি ঠিকই বুঝিয়ে বলেছিলাম। বাবা হয়ত মনে মনে খুশী হয়েছিলেন কিন্তু সেই খুশী ভাব চেপে রেখে বলে গেলেন—না, না, তোমার এখনও অনেক পড়তে হবে। মোট কথা তোমার স্কুল স্ট্রাইক করা চলবে না। যদি তবু তোমার স্ট্রাইক করতে হয় তবে তা তোমাকে করতে হবে আমার ত্যজ্যপুত্র হয়ে। যদি তোমার সংকল্প পরিত্যাগ না কর তবে তোমাকে এক্ষুণি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' এই বলে রেগে খড়মের শব্দ করতে করতে পায়খানায় গেলেন। চিৎকার করে মাকে বলছিলেন 'তোমার ছেলের সুমতি আর কখনও হবে না। সে স্কুল ষ্ট্রাইক করবে— ইংরেজের গোলামখানায় আর পড়বে না। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাক আমি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।'

বাবা অনেক বারই এরকম ভাবে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন ; বহুবারই আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন ; অনেক বারই ঘোষণা করেছেন বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন আমি আর না ঢুকি। আমার ছোট মামা ও কৈলাসদার ওপর আদেশ হয়েছে আমাকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।' বাবার ঐসব তর্জন-গর্জন শুনতে আমি এতই অভ্যস্ত ছিলাম যে আমি তা আর আমলই দিতাম না। আমি আমার পথেই চলেছিলাম। বাবাও নিরলস-ভাবে আমাকে মনের ক্ষোভে বকাবকি করে বার বার ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন। এই শেষবারের মত তাঁর ঘোষণা বোধ হয় আমার কাছে চরম বলে মনে হয়েছিল। তাঁর হাবভাব ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর মাকে উদ্বেল করেছিল। মাও যেন আমার ওপর চরম বিরক্ত হলেন। তিনি নিজেকে খুব সংযত রেখে আমাকে সস্নেহে ডাকলেন—আমার কাছে আয়—কথা শোন।' 'মা তোমাদের কথা শুনে আর কি হবে? তোমাদের কথা রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না?' মার ধৈর্যের সীমা যেন অতিক্রম করল। তিনি যেন তাঁকে আর সংবরণ করতে পারলেন না। মা খুব রেগে চেঁচিয়ে আমাকে বললেন—'তবে যা, দূর হ। চিরকালের মত চলে যা—যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানে যা—সেখানে গিয়ে মর। আর আসিস না। তোর মুখ আমরা আর দেখতে চাই না। তুই যা, চলে যা।'

অভিমানে ভরা মন—বাবার ত্যাজ্যপুত্র মা ও বাবা আমার মুখ আর দেখবেন না—বাড়ির ত্রিসীমানায় আমার স্থান হবে না। পুঞ্জীভূত অভিমানে বুক ফেটে যাচ্ছিল। 'মা তুমিও আমার মুখ দেখবে না! তোমাদের কাছে আমার দেশপ্রেমের কোন মূল্যই নেই? তবে মাগো আজ চলে যাব। আমার মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই—জননী জন্মভূমিই আমার স্বর্গাদপি-গরিয়সী। পেছনে আর ফিরে তাকালাম না। মাকে বললাম 'মা যাচ্ছি—চিরকালের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ফিরে আর আসব না।' 'ফিরে আর আসব না'—এই কথাকটি বলতে গিয়ে গলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তখন দুপুর দুটো হবে। আমি রুদ্ধ কণ্ঠে অশ্রু চোখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের পুকুর পাড় দিয়ে যাচ্ছিলাম। সহস্র আবেগ আমার হৃদয়কে উদ্বেল করছিল। নিজেকে সম্বোধন করে বললাম—'এই সব পরীক্ষায় তোমার পাশ করতেই হবে। এতে ভেঙ্গে পড়লে তোমার চলবে না।' অন্তরে আমার হুঙ্কার শোনা গেল—দেশ-মাতৃকা যেন আমায় বলছেন—

'এই তোমার জীবনের প্রথম পদক্ষেপ—স্কুল ষ্ট্রাইক। তোমাদের মনোবল পরীক্ষা হবে—কে কি ভাবে এই সর্বভারতীয় ষ্ট্রাইক আন্দোলনে যোগ দেবে তারও পরীক্ষা হবে। তোমার মত সবাইকে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তার কোন কথা নেই। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ছেলে অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলবে। তুমি তোমার তাল সামলাও আর পাশের জনকে তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য কর।' এই সবই আমার চিন্তা এবং সেইরূপ চিন্তায় অভিভূত হয়ে অনেক কথাই ভেবেছি। ভেবেছি কাউকে না কাউকে হাল ধরতে হবেই। যে সংগ্রামে হাল ধরবে তার মনোবল, কর্তব্যবোধ সবার চাইতে বেশী হতে হবে। মনে প্রশ্ন জাগল—আমি কি করব? আমার ভূমিকা কি হবে?'

আমি মাষ্টারদা ও অনুরূপদার বাসায় গেলাম। আমার বাড়ির অবস্থা তাদের জানালাম আর আমি আমার পরিকল্পনার বর্ণনা দিলাম। এই সাত দিনের ছুটির মধ্যে আমাকে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে সব বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে বলতে হবে এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে স্কুল ষ্ট্রাইক করবে। প্রত্যেক ছাত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নিজের নামের সই দেবে। সাংগঠনিক কর্মপ্রচেষ্টা আমি করে যাবই। অনুরূপদার কাছ থেকে সেইরূপ একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে ৭।৮ খানা অনুরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রের কপি করিয়ে নিলাম। ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রও ভাগ করে অন্যদের দেওয়া হয়েছিল। কে কোন দিকে বা কোন এলাকায় যাবে, তাও আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম।

আমার এই ধরনের প্রোগ্রামটিকে সফল করার- জন্য একটি বাস্তব চিন্তা ছিল। আমাদের সময় মুকুন্দপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ত। সচরাচর তার মত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র আমরা দেখতে পাই নি। সে ক্লাসের ও স্কুলের ফার্স্ট ছেলে—যারা দ্বিতীয় তাদের নম্বরের পার্থক্য অনেক। মুকুন্দের নম্বর কাটাই যেত না। মুকুন্দের প্রতিভার কথা প্রতিটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সুপরিচিত। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষকরা মুকুন্দকে নিয়ে খুবই গর্বিত। তাঁরা ধরেই রেখেছিলেন আগামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাঁদের ছাত্র মুকুন্দই বিভাগীয় পরীক্ষায় সর্ব প্রথম স্থান লাভ করবেই। শিক্ষক ও ছাত্ররা এই তথ্যটি জানত এবং এই একটি নির্ভুল তথ্যকে আমি আমার প্রপাগানডার সঠিক বিষয়বস্তু করে নিলাম। আমি যুক্তি দিয়ে বুঝলাম মুকুন্দ যদি স্কুল ষ্ট্রাইক করে তবে তার সঙ্গীরা—গণেশ, আফসার, হাবিবুল্লাহ

ও অন্যান্যরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আর এই বিশিষ্ট ছাত্রগ্রুপ যদি ষ্ট্রাইকের পুরোভাগে থাকে তবে অন্যান্য ছেলেরা মানসিক জোর পাবে এবং অভিভাবকদের তারা জোর দিয়ে বলতে পারবে স্কুলের অপদার্থ ছেলেরা স্কুল ষ্ট্রাইক করছে তা নয়—যারা খুব ভালো ছেলে এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ ছেলে বলে গণ্য তারাও ষ্ট্রাইকে সামিল হয়েছে। অতএব এ গুণ্ডাদের কাজ নয়— দেশপ্রেমিক ছাত্রদের দেশপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস। এইরূপ তথ্যপূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে আমার বক্তব্য সবারই গ্রাহ্য হয়েছিল। অবশ্য সব স্বদেশপ্রেমিক তরুণদের কাছে। তাদের অভিভাবকরা সবাই নয়, নিজ স্বার্থে স্কুল ষ্ট্রাইক প্রতিরোধ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

সাতদিন ছুটি ফুরোলে স্কুলে এসেই প্রথমে ছাত্ররা স্কুল ষ্ট্রাইক ঘোষণা করবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারের সমর্থনে ষ্ট্রাইক রোধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। প্রত্যেক স্কুলেই কিছু শিক্ষক ছাত্রদের ষ্ট্রাইক আন্দোলন সমর্থনও করতেন। অবশ্য তাঁরা সবাই চারুবাবু, মাষ্টারদা, অনুরূপদা প্রমুখের মত সর্বাগ্রে এসে আন্দোলন করেন নি। গা ঢাকা দিয়ে পিছন থেকে তারা বিশেষভাবে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রফেসার 'নৃপেন ব্যানার্জী চট্টগ্রামে' সরকারী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল পদ ত্যাগ করেছিলেন। মাষ্টারদা, অনুরূপদা প্রভৃতি শিক্ষকরাও পদত্যাগ করে স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের ষ্ট্রাইক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে ষ্ট্রাইক পরিচালনা করবেন।

আমরা প্রস্তুত, ষ্ট্রাইক করব। সরকারী স্কুলে ও কলেজ কর্তৃপক্ষও প্রস্তুত আন্দোলন রুখবেনই। থানায় থানায় জেলা হাকিমের নির্দেশমত পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত—হুকুম পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রথম সিগনাল দেবে মিউনিসিপ্যাল স্কুল। তার পর শহরের সরকারী কলেজিয়েট স্কুল, যাত্রামোহন স্কুল, ওরিয়েণ্টাল স্কুল, কাজেম আলি স্কুল প্রভৃতি ষ্ট্রাইকে সামিল হবে। এইরূপ প্রস্তুতি আমাদের ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনরূপ প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করার পূর্বেই যেন ঝটিকা বেগে আমরা মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ষ্ট্রাইক পুরোদস্তররূপে সফল করতে পারি তার জন্য কৌশল নিলাম। আমাদের সমর্থক শিক্ষকবৃন্দ ও কিছু কলেজের ছাত্র কোর্ট বিল্ডিং-এর পাহাড়ে গোপনে অবস্থান করবে। আমরা ক্লাস থেকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে আসবো তখন পাহাড়ের উপর যারা অবস্থান করছিলেন তাঁরাও সংগ্রামাত্মক ধ্বনি দিতে দিতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঝড় তুলবে।

এই পরিকল্পনা নিয়ে যেদিন স্কুল খুলল সেদিন ক্লাশ শুরু হওয়ার পনের মিনিট আগে আমরা কয়েকজন ক্লাশে ঢুকলাম। তখনও সব ছেলে উপস্থিত হয় নি। আমি উপস্থিত বন্ধুদের এই ষ্ট্রাইকের সমর্থনে খুব জোরের সঙ্গে বলছিলাম। হেডমাষ্টারবাবু ও আর কতজন শিক্ষক ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা খবর পেয়ে গেলেন, যে আমি ছাত্রদের উস্কানি দিচ্ছি ষ্ট্রাইক করার জন্য। এই খবর পেয়ে শিক্ষকরা খুবই বিচলিত হলেন এবং এই অবস্থায় তাঁদের কর্তব্য কি ভাবতে লাগলেন। বিশেষ উদ্যোগ নিলেন ৺শশীবাবু। তিনি হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ছুটলেন আমাদের ক্লাশের দিকে। আমি তখন বক্তৃতা দিচ্ছি—'ইংরেজের গোলামখানায় আর পড়বো না।' আমার বলার মাঝখানে ৺শশীবাবু উপস্থিত হযে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন —হেডমাষ্টারবাবু অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তুমি এক্ষুনি এস। আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না, ভাবিনি হেডমাষ্টারবাবুর সঙ্গে দেখা না করে পালিযে যাই। আমি হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে অফিসের দিকে ছুটলাম। অফিস ঘরে সব টিচার উপস্থিত ছিলেন। সবাই খুব গম্ভীর। আমি যেন তাঁদের কারো কাছে বাঞ্ছনীয় নয়, সেইরূপ ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। ঐরূপ গুরুগম্ভীর অবস্থার মধ্যে প্রধান শিক্ষক তাঁর স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর স্বরে আমাকে বলতে লাগলেন—দেখ অনন্ত, আমি তোমার বাবাকে লিখেছি—আমি স্কুলে তোমার নাম কেটে দিয়েছি। তিনি যেন তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যান। তুমি এখানে আর থাক তা আমি চাই না। তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। আমি প্রতি উত্তর দিলাম—স্যার আমি নিজেই আজ থেকে এই গোলামখানা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কেবল আমি একা নই, আমরা সবাই। আর আসবো না। মাষ্টার ৺শশীবাবু তখন হেডমাষ্টার মশাইকে বললেন—ক্লাশ আরম্ভ হবার ঘণ্টা দিতে দপ্তরীকে বলি। তখনও বোধ হয় ৫।৭ মিনিট বাকি ছিল। হেডমাষ্টার মশাই বললেন 'হ্যাঁ তাই বলুন। দপ্তরী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সে এই আদেশের অর্থ বুঝেছিল এবং দ্রুত গিয়ে ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করলো যেন সব ছেলে জটলা না করে তখনি নিজ নিজ ক্লাশ রুমে চলে যায়। আমি তড়িৎবেগে আমাদের ক্লাশ রুমে ফিরে এসে বক্তৃতা শেষ করলাম—'দ্বিরুক্তি করার সময় আর নেই। আমাদের পরিকল্পনা তারা ভাঙতে চাইছেন। তা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। চলো আমরা এক্ষুনি এক সঙ্গে বেরিয়ে যাই।

'বন্দে মাতরম্, বন্দে 'মাতরম্' বলে সবাই একযোগে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ক্লাশ টিচার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর করবার অবশ্য কিছুই ছিল না। আমাদের এই সিগন্যাল পেয়ে অন্যান্য ক্লাশের ছাত্ররা পূর্ব প্ল্যান অনুযায়ী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সব ক্লাশের ছেলেরা আমাদের অনুসরণ করে প্রধান বিল্ডিংয়ের সামনের ছোট মাঠে একত্র হোল। বক্তৃতা হলো। শ্লোগান দেওয়া হল। আমাদের মাস্টার মহাশয়রা বিষণ্ণ মনে তাঁদের প্রিয় ছাত্রদের বিক্ষোভ ও স্বদেশ প্রেমের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগলেন। তাঁদের অনেকের অব্যক্ত আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম। তারপর আমরা মিছিল করে প্রত্যেক স্কুলের সামনে গেলাম। যে সব স্কুলে তখনও ষ্ট্রাইক হয়নি তারা আমাদের শ্লোগান শুনে আর বসে থাকতে পারল না—তারাও শ্লোগান দিয়ে স্কুল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। সকল স্কুলের ও কলেজের ছাত্র সমাবেশ হোল একটি ফুটবল মাঠে। সভাপতিত্ব করলেন মাষ্টারদা। জয়ের উৎসব যেন আর থামে না। জয়ের উল্লাসে আকাশ বিদীর্ণ করে শ্লোগান দিচ্ছিলাম আর সভায় আমরা প্রস্তাব রাখলাম ও সবাই মিলে প্রস্তাব গ্রহণ করি যে, ষ্ট্রাইক সফল করার জন্য যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করার জন্য আমরা প্রস্তুত। পুলিশের লাঠি, গুলি আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। আমাদের যদি সকলকে জেলে বন্দী করে তবু আমরা তাতে ভীত হব না, আমাদের সংকল্প আমরা পরিত্যাগ করব না। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। আমাদের সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক। তারপর 'বন্দে মাতরম্' 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে চারিদিক মাতিয়ে তুললাম। আমরা সবাই সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে সভা শেষ করি।

সেইদিন স্কুল টিচাররা অভিভাবকদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব যোগাযোগ করলেন ও টাউন হলে সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের স্কুলের স্ট্রাইক নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সভা ডাকলেন। মাষ্টার মশাইরা আরও ঘোষণা করলেন—এই সভায় কেবলমাত্র অভিভাবরাই উপস্থিত হবেন, ছাত্রেরা প্রবেশ করবে না। এইটি হবে অভিভাবকদের একটি গোপনীয় সভা। এইরূপ সভা ডাকার পিছনে জেলা শাসকের সম্পূর্ণ হাত ছিল এবং তাঁরই জোরে অভিভাবকরা খুব উৎসাহী হয়েছেন।

এই সভায় স্বভাবত আমি উপস্থিত থাকবো না স্থির করেছিলাম। আমি সেই সময়ে গণেশের বাড়িতে থাকতাম। গণেশের বাবা আমাকে খুবই স্নেহ

করতেন এবং আমাদের এইরূপ স্ট্রাইকের ব্যাপারে কোন রূপ বাধাও দিতেন না। গণেশের দাদা 'কার্তিক ঘোষও পুরোপুরি স্ট্রাইকের সমর্থনে ছিলেন। তাদের কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নৃপেন ব্যানার্জি ভারতবর্ষের এই ষ্ট্রাইক আন্দোলনের একজন নেতা। তাঁর উৎসাহে উৎসাহী চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ছাত্ররা ষ্ট্রাইকের পুরোভাগে যে ছিল তাতে আর আশ্চর্য কি!

অভিভাবকদের সভায় গণেশের বাবা উপস্থিত ছিলেন। যদিও সভায় বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ষ্ট্রাইক ভাঙবার তবু তিনি গিয়েছিলেন ষ্ট্রাইকে তাঁর সমর্থন জানাতে। দেখতে দেখতে হল ভরে গেল। অভিভাবকরা ও শিক্ষকরা খুব উত্তেজিত এবং ষ্ট্রাইকের বিরুদ্ধে ও ষ্ট্রাইক-পরিচালকদের বিরুদ্ধে তাঁদের মত প্রকাশ করছিলেন কঠোর ভাষায়। সবারই মুখে এক কথা শোনা যাচ্ছিল—স্বদেশী আন্দোলনে স্কুল স্ট্রাইক কেন? এই অল্প বয়সে ষ্ট্রাইক করে ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল হবে। ভবিষ্যতে এইসব উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের নিয়ে কি কোন বড় গঠনমূলক কাজ আশা করা যায়? কাজেই প্রত্যেক অভিভাবককে তাঁর ছেলের সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে ও তাঁদের ভালো করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে হবে, যেন এই ষ্ট্রাইক থেকে তারা বিরত থাকে।' মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার মশায় বক্তৃতা দিতে আর পারছিলেন না, শুধুই থরথর করে কাঁপছিলেন। তবু যা বললেন তার সারমর্ম—'আমার স্কুলের সব ছেলে, সব ভালো আলো ছেলে, ওরা কখনই ষ্ট্রাইক করতনা, আমার স্কুলের ফার্স্ট বয় সে স্কুল ছেড়ে কখনোই ষ্ট্রাইকে যোগ দিত না। সেও ষ্ট্রাইকে যোগ দিয়েছে তবে স্বেচ্ছায় নয়। আমার নিজের চোখে দেখা বাইরে থেকে একদল অবাঞ্ছিত লোক এসে ছোট ছোট ও ভালো ছেলেদের হাত ধরে টেনে টেনে ক্লাশ থেকে বার করে নিয়ে গেল।'. হেডমাষ্টার বাবুর বক্তৃতা শেষ হবার পূর্বেই সেই সভায় একটি ছোট ছেলে এক কোণ থেকে বলতে শুরু করল—'আমাদের হেডমাষ্টার বাবু এখনই যা বললেন, যে তাঁর স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের অবাঞ্ছিত ছাত্ররা এসে হাত ধরে টেনে বার করে নিয়ে গেছে, সেই কথাটি সাত্য নয়। যদি আমরা ষ্ট্রাইক করে বেরিয়ে এসে থাকি তা আমাদের প্রাণের টানেই বেরিয়েছি। স্বদেশ প্রেমের টানে আমরা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে এসেছি। সমস্ত হলটি তখন নির্বাক হয়ে গেল। কে এই বালক কি তার পরিচয়? এই বালকই হচ্ছে চট্টগ্রাম স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র মুকুন্দপ্রসাদ সেনগুপ্ত। মাষ্টারমহাশয়দের বিশেষ করে হেডমাষ্টার মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র। সে এইভাবে সভাস্থলে হেডমাষ্টার

মহাশয়ের প্রতিবাদে এই সত্যটি দৃঢ়তার সঙ্গে যে বলবে তা কেউ আশা করেনি। মুকুন্দপ্রসাদের এই কটি কথাই বিরোধীদের সভা একবারে নিস্তব্ধ করে দেয়। তাঁদের তেজপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার আর কোন উৎসাহই ছিল না।

গণেশের বাড়িতে আমি, গণেশ, কার্তিকদা বসে আছি। অভিভাবকদের সভার বিবরণ জানবো বলো। গণেশের বাবা বিপিনবিহারী ঘোষ ঢুকে অতি উল্লাসভরে বললেন—'মুকুন্দ আজ বাজিমাত করেছে।' তারপর তিনি ঘটনার সবটুকু বলে মুকুন্দের খুব প্রশংসা করেছিলেন। মুকুন্দ যে গণেশের বন্ধু ও আমাদের সবার খুব নিকট বন্ধু তা তাঁর জানা ছিল।

তারপর দিন 'পাঞ্চজন্য' দৈনিক সংবাদপত্রে অভিভাবকদের সভার বিবরণ ছাপা হয়েছিল, আর মুকুন্দের হেডমাষ্টার মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ খুব ফলাও করে ছাপিয়েছিল। স্কুলে, স্কুলে ও কলেজে, কলেজে এই সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মুকুন্দের ধীর, সংযত প্রত্যুত্তর সভাস্থলে সবাইকে স্তম্ভিত করে। মুকুন্দের ষ্ট্রাইক বার্তা ম্যাজিকের মত ছাত্রদের মধ্যে কাজ করে। প্রতি স্কুলের শিক্ষকরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। যারা ষ্ট্রাইক করে, তারা গুণ্ডা —এই বলে যে অপপ্রচার ছিল, তার সহজ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। সত্যি বলতে গেলে আজ স্বীকার করতেই হবে মুকুন্দের সেই সভায় সময় উপযোগী ছোট্ট প্রতিবাদটি—আমরা আমাদের প্রাণের টানেই বেরিয়ে এসেছি, কেউ আমাদের হাত ধরে টেনে বার করেনি'—আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই আলোড়নই চট্টগ্রামের ছাত্রদের ষ্ট্রাইক আন্দোলন সফল করে। ছাত্রদের আন্দোলন সফল হয় তাদের শৃঙ্খলাবোধ থেকে। ছাত্রদের এই প্রাথমিক যুদ্ধে আমরা সফল হয়েছিলাম।
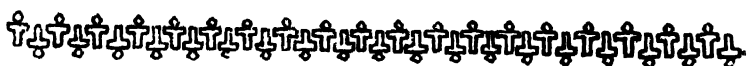
৩

চট্টগ্রাম শহরে মাত্র একজন লেডী ডাক্তারই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। মোটা খদ্দরের শাড়ি পড়তেন, বড বড় সভায় তিনি যেতেন, চাঁদা চাইলে মুক্ত হস্তে চাঁদা দিতেন। তাঁর শত্রু কেউ ছিল না। তিনি রহমতগঞ্জ পোষ্ট অফিসের রাস্তার অপর পারে নিজের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে ও তাঁর এক ভাইঝি। ছেলে ক্ষিতীশ আমার থেকে পাঁচ-ছ বছরের বড় হবে আর তাঁর ভাইঝি রেনীর বয়স মাত্র ৬।৭ বৎসর হবে। এই তাঁর সংসার। তিনি খুব মিষ্টিভাষী। তাঁর মধ্যে অপূর্ব এক আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল—একেবারে আত্মীয়ের মত।

যখন বৌদির প্রথম সন্তান হয় তখন তিনি 'কল' পেয়ে আমাদের বাড়ি এলেন। তিনি প্রথম এসেছিলেন বিশিষ্ট ডাক্তর হিসেবে বিশেষ 'কল' পেয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিবারের এক আপনজন হয়ে গেলেন। তাঁর সংযত সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁকেও আমরা ভাইবোনেরা একজন অভিভাবক বলেই মনে করতাম। তিনি আমাদের বাড়ি আসার জন্য 'কলের' অপেক্ষায় থাকতেন না, যখন খুশী চলে আসতেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ উঠল। চট্টগ্রামবাসী, ছাত্র, যুবক, জনসাধারণ সেই আন্দোলনকে সফল করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলো। আমিও তাতে ব্যতিক্রম ছিলাম না। ছাত্র ও যুবক আন্দোলনে আমিও অতি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিই। বাবা এতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং সবাইকে তাঁর ক্ষোভ জানাতে লাগলেন। সবার মধ্যে লেডী ডাক্তার মাসীমাও বাদ পড়েন নি। ধরে নেওয়া যায় প্রথম থেকে তাঁকে আমাদের স্কুলের ষ্ট্রাইক ও আমাদের

মনোভাব সংক্রান্ত সব কথাই বলা হত। লেডী ডাক্তার মাসীমা চট্টগ্রাম শহরে সব বড় বড় লোকদের বাড়িতে যেতেন এবং তাঁদের বাড়ির ছেলেদের সম্পর্কে অনুরূপ ঘটনা শুনতেন। এই সবই তিনি আমাদের বাবা, মার সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন, এই জোয়ার কারো পক্ষে রোখা সম্ভব নয়।

এই সময়ে যখন তিনি একদিন আমাদের বাড়ি এলেন তখন তাঁকে সবাই মিলে খুব ঘটা করে জানালেন—'অনন্ত গতকাল রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।' এ যেন তাঁর কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—বাড়ি ছেড়ে চলে গেল? কি হয়েছিল বলুন তো?' মা বলতে লাগলেন—'কি আর হবে। প্রায় পনের দিন আগে থেকে স্কুলে ষ্ট্রাইক করবে বলেছিল এবং নন্দকেও সঙ্গে নেবে বলেছিল। তার বাবা তাকে খুব ধমকে দেয় যেন সে এই কু-মতলব ছাড়ে। বাবু কি আর কোন কথা শুনবেন। শেষে খুব জোর দিয়ে বলল—'বাবা, আমি স্কুলে ষ্ট্রাইক করবই।' তাঁর বাবা শুনে খুব চটে গেলেন এবং তক্ষুনি তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। বাবু কি এই সুযোগ ছাড়বেন! ঠিকই সুযোগ নিলেন। অনন্ত তখন আমাকে বলে গেল—'মা, আমি চিরকালের মত বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, আর ফিরে আসবো না।' মাসীমা সবটা শুনে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ধীরে ধীরে বললেন—'অনন্ত যে একগুয়ে ছেলে তা তো আমাদের সবারই জানা ছিল, তাঁর প্রতি দাদা অতখানি কঠোর না হলেই পারতেন।' বাবা তারপর মুখ খুললেন—'আপনারা যে এরকম মত প্রকাশ করবেন এবং আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করবেন, তা আমি জানতাম। মায়ের স্নেহ-প্রবণ মন দিয়ে আপনারা অনন্তকে কখনও চিনতে পারবেন না। মনে পড়ে তার মায়ের বালিশের তলা থেকে যখন চার টাকা উধাও হয়, তখন সবাই চোর সাব্যস্ত করেছেন বাড়ির চাকর-বাকরদের এবং চোর ধরার জন্য 'লাঠি চালান', 'বাটি চালান'-এর ব্যবস্থা করছেন, তখন আমি হেসে বলেছিলাম, এসব আপনাদের মিথ্যা প্রয়াস। যদি টাকা কেউ নিয়ে থাকে, তবে টাকা নিয়েছে অনন্ত। মনে পড়ে, তখন সবাই আমার ওপর সেই কথা শুনে চটে উঠলেন। তারপর প্রায় চার-পাঁচ মাস পরে নন্দের স্বীকারোক্তি শুনে জানলেন যে সেই টাকা অনন্তই নিয়েছিল।'

এই টাকা চুরির ব্যাপারটা হল—'আমাদের স্কুলে, আমাদের ক্লাশে একজন

মেধাবী ছাত্র ছিল। খুব গরীব। একান্ত প্রয়োজনীয় বই কেনার ক্ষমতাও তার ছিল না। সেই আমাকে বলেছিল—'ভাই দু-চার টাকা পেলে আমি এই ক'টি বই কিনতে পারি। দেখো আমাকে যদি কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পার।' তখন আমি আমার সেই ছাত্র বন্ধুটিকে কিছুই বলি নি—দিতে পারবো, কি পারবো না। তবে মনে মনে বুঝেছিলাম, যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে তাকে আমি টাকা দেবই।

মা'র বালিশের তলায় বাজার খরচের জন্য সব সময় কিছু টাকা থাকত। সেই টাকা থেকে দু-চারটে টাকা যদি আমি নিই, তবে দোষ কি? আমার দাদাকে এই ব্যাপারটা জানাই। আমাদের ক্লাশের সেই প্রতিভাবান দুঃস্থ ছেলেটিকে দাদা চিনতেন। দাদা আমার কাছ থেকে সব শুনে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমি এক সময় মা'র বালিশের তলা থেকে চারটি টাকা নিয়ে ছেলেটিকে দিয়েছিলাম বই কেনার জন্য। আজ যতদূর মনে পড়ে তার নাম ছিল সুধাংশু। সে ঐ টাকা দিয়ে বই কিনেছিল।

কয়েক মাস পরে, আমার দাদার সঙ্গে কোন একটা সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো। এই ধরনের কথা কাটাকাটি দাদার সঙ্গে আমার হতই না বলা চলে। দাদা সেইদিন খুব সামান্য কারণেই আমার উপর হঠাৎ চটে গেলো। দোষ হয়ত নিশ্চয়ই আমারই ছিল। দাদা রেগে গিয়ে মাকে ডেকে বলছিলেন—'মা শোন, শোন, এই সেই চোর। অনন্তই তোমার বালিশের তলা থেকে টাকা চুরি করেছিল …।' মা বললেন—ওমা, সত্যিই বলছিস, অনন্তই আমার টাকা চুরি করেছিল?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই টাকা চুরি করেছিল। দাদা এত জোর দিয়ে বলছিল যে শুনেই যে-কোন লোক বুঝতো সেটাই সত্যি। মা'র সামনে দাঁড়াবার শক্তি আমার ছিল না। মা বললেন—'কি রে অনন্ত। সত্যি টাকা নিয়েছিলি?' কেন নিয়েছিলি আমি আর পড়ার ঘরে বসে থাকতে পারি নি, দিলাম ছুট বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব বলে। কিন্তু বাইরে যাওয়া হলো না—দরজায় তালা, বেরোতে পারলাম না। মা পেছনে পেছনে ছুটে এলেন, দেখলেন পেছনের দরজা ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তারপর তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন—'তোকে আর কি বলব। তুই চুরি করার শিক্ষা কোথা থেকে পেলি। তোর বাবাকে আমি বলব, তাঁকে কৈফিয়ৎ দিস।'

তখন বিকেল পাঁচটা হবে। আমি বিহ্বল হয়ে রইলাম। মনে মনে ভাবছে

লাগলাম দাদা তো আগাগোড়া সবই জানত। এই চুরির উদ্দেশ্য তো তাঁর কাছে গোপন ছিল না। তিনি তো পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, তবে তিনি কেন আমাকে এরকমভাবে আজ প্রতারণা করলেন। বাবা শুনলে আমার আর রক্ষা নেই তা বুঝেছিলাম। তখন আমি মাত্র ক্লাশ সেভেন-এ পড়তাম। আমাকে রক্ষা করতে পারেন কেবলমাত্র 'মা-কালী'। 'মার কাছে তখন আমি করুণ প্রার্থনা জানাতে লাগলাম 'মা' তুমি আমায় বাঁচাও।' 'মা', 'মা'— বলে ডাকছি, আর অঝোরে চোখ থেকে জল ঝরছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাবা ডাক দিলেন। কিন্তু সেই রকম ডাক আসছিল না। বাবা তার চেম্বারে মক্কেল নিয়ে বসেছিলেন। সচরাচর এত দেরী তাঁর কখন হয় না। 'মা' বুঝি আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন। 'মা' তো জানতেন আমি আমার নিজের জন্য চুরি করি নি। আমার মামা আমাকে খাওয়াব জন্য ডাকলেন। আমিও মুখ বুজে খেয়ে নিলাম। খাওয়ার পর চুপ-চাপ শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলাম। তখনও মাকে ডাকছি, বলছি 'মা তুমি আমাকে বাঁচাও।' 'মা'-কে ডেকে ডেকে জানি না কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চিড়ে মুড়ি কিছু খেতে গেলাম। তখনও দেখি সবাই নীরব।

ঐ চুরির ব্যাপারে নিয়ে কোন কথাই উঠছে না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, তিনি এখনও আমার চুরি সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন কি-না। তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করি নি। তারপরেও তিনি কখন শুনেছেন, তা আমি জানি না। আদৌ মা তাঁকে বলেছেন কি-না তাও আমার জানা নেই। আজই মাসীমাকে বলার সময় প্রথম শুনলাম বাবার মুখে সেই চুরির ঘটনার কথা। সেই কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন—মনে পড়ে সেদিন বলেছিলাম এই ছেলে একদিন ডাকাত হ'তে পারে। অন্ধ মাতৃস্নেহ মা-রা ছেলেদের স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখতে জানে। তাদের সম্পর্কে বিচার করে দেখতে সম্পূর্ণ অপারগ। আমার এই কথা আপনারা পরে বুঝবেন—আজকে বুঝছেন যে অনন্ত আমার দিকে সাহস করে কখনও তাকায় নি, সেই আমার মুখের উপরে বলে গেল, 'আমি স্ট্রাইক করব, বাড়ি ছেড়ে চললাম।' বাবা আরো বললেন—'আজ আবার বলে রাখি, এই ছেলে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক দুর্গতির কারণ হবে। অনন্ত, আমাদের চিরকালের এক সমস্যা হয়ে রইল।'

মাসীমা চুপ করে ছিলেন—তারপর বাবাকে বলেছিলেন। 'যাকে আপনি

আজ সংসারে এক আপদ বলে মনে করছেন, দেখে নেবেন, সেই আপনাদের বাড়ির সুনাম রাখবে – তারই স্বদেশ প্রেম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে, সবাই তাকে পূজা করবে। এখনি তাকে নিয়ে অত সব দুশ্চিন্তা করবেন না। সে হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সেই দূরন্ত-চির অশান্ত ছেলে'। যদি জাতির জন্য কেউ সত্যি কিছু করে থাকে, তবে ইতিহাসে দেখা যাবে দূরন্ত ছেলেরাই তা করেছে। আমার বিশ্বাস অনন্ত ভাল ছাড়া কখনও খারাপ কিছু করবে না।'

সবার ধারণা ছিল লেডী ডাক্তার মাসীমা আমাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি সবার কাছে আমার প্রশংসা করতেন আমার মত একটি ছেলে মনযোগ দিয়ে ডন কুস্তী করে, সিগারেট বিড়ি খায় না, সস্তা নভেল নাটকের বই পড়ে না, বাজে দলে মেশে না—তাই তিনি ঐ রূপ ধারণা করে নিয়েছিলেন। মাসীমার চোখে আমি একজন আইডিয়াল ছেলে। তাই বোধ হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, স্কুল ষ্ট্রাইকে যোগ দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামালেন না। তিনি দেশ-প্রেমের এই জোয়ারে যারা সক্রিয় অংশ নিচ্ছিল তাদের ভালবাসতেন। মাসীমার এইরূপ সমর্থনের মনোভাব আমরা জানতাম। তবু মাসীমাকে আমরা সক্রিয় ভাবে কখনও আমাদের আন্দোলনের পুরোভাগে দেখতে পাই নি। এ রকম অবস্থাতেও আমরা মাসীমাকে ভীষণ ভাবে চাইতাম, তিনিও আমাদের চাইতেন। মাসীমার বাড়ির রাস্তার ওপারে যে পোষ্ট অফিসটি ছিল, সেই পোষ্ট অফিসের একটি কক্ষে আমরা - সংগ্রামী ছাত্র যুবকরা আলোচনার জন্য প্রায় সেখানে মিলিত হতাম। ঐ ঘরের পূর্ব দিকের জানালা খোলা থাকলে মাসীমার বাড়ি থেকে সবই দেখা যেত।

একদিন আমাদের গুপ্ত সভা হচ্ছে। আমরা সেই ঘরে প্রায় ১৪।১৫ জন বসেছি। তখন চারটে-সাড়ে চারটে হবে। দেখলাম মাসীমা হঠাৎ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসছেন। আমি সন্দেহ করলাম তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে এই ঘরের দিকে আসছেন। আমি সবাইকে তাই বলে হুঁশিয়ার করলাম। বললাম—'মাসীমা বোধ হয় আমায় দেখতে পেয়েছেন, বোধ হয় এখানেই আসছেন।' ঠিক তাই রাস্তা দিয়ে পোষ্ট অফিসের কম্পাউণ্ড ঘুরে সদর দরজা দিয়ে পোষ্ট অফিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন। পোষ্ট অফিসে কোন কাজে আসছিলেন কিনা তা তখন বোঝা গেল না। তিনি পোষ্ট অফিসের বারান্দায় উঠে পোষ্ট অফিসে না গিয়ে ডান দিকে মোড় নিলেন এবং সোজা যে ঘরে আমরা বসেছিলাম সেই ঘরের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলে আসছিলেন। যার

ঘরে আমরা বসেছিলাম তিনি খুব বিচলিত হলেন এবং উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু মাসীমা যে আমাকে তাঁর বাড়ি থেকেই দেখতে পেয়েছেন। তাই তিনি দরজায় এসে টোকা দিলেন এবং বললেন—'অনন্ত দরজা খোল্।' আমাদের কারো সাহস হল না যে বলি—'দরজা খুলবো না, অনন্ত এখানে নেই।' আমাদের মধ্যে একজন দরজা খুলে দিল। তিনি আর কোন কথা না বলে তাঁর দু' হাত দিয়ে খপ্ করে আমার হাতটি ধরে ফেলে বললেন—'দুষ্টু ছেলে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস্। আয় আমার সঙ্গে।' আমি প্রতিবাদ করলাম না। তিনি আমার হাত ধরে সোজা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে ঢুকেই বাড়ির প্যাসেজের ডান দিকের ঘরটায় তাঁর ছেলে থাকত। আর বাঁ-পাশের ঘরে ভাইঝিকে নিয়ে তিনি থাকতেন। তিনি তাঁর ছেলের ঘরে ঢুকে আমাকে নিয়ে খাটের ওপরে বসলেন। হাত আর ছাড়ছেন না। সেখান থেকে চেঁচিয়ে ক্ষিতীশ ও রেণীকে ডাকলেন। তাদের বললেন—'তোরা এক্ষুনি অনন্তের বাড়িতে যা। তার বাবাকে বলবি, আমি অনন্তকে ধরে রেখেছি তিনি যেন এক্ষুনি আসেন। ক্ষিতীশদা সাইকেলে করে রেণীকে নিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেল। মাসীমা মাঝে মাঝে বলছিলেন—'এই পালাবি না কিন্তু।' আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, একেবারে গো-বেচারা সেজে থাকব পালাবার কোন ইচ্ছে আমার মোটেই নেই সে রকম ভাব দেখাব। আমি মাসীমাকে প্রতিবারই উত্তর দিয়েছি—'না মাসীমা, পালাবো কেন?' আমি যা-ই বলি না কেন, তিনি তা বিশ্বাস করছিলেন না। আমি যতই তাকে বোঝাতে চাই যে, আমার পালাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। আমি সুবোধ বালকের মতবাড়ি যাব তবু তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমার ধুতির খুঁট হাতে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন। এমন সময় তার কাছে একটি 'কল' এলো। তিনি ক্ষিতীশদার ঘর থেকেই বললেন—'এখন আমি যেতে পারব না। রোগী কেমন থাকে, তা যেন আমাকে সন্ধ্যে আটটার সময় জানানো হয়। তখনও যদি রোগীর অবস্থা ভাল না হয়, তাহলে আমি যাবো।' এইভাবে এই একটি 'কল' তিনি ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে আরেকটি খুব জরুরী 'কল' এলো। সেখানেও তিনি যাবেন না, তবে তাদের কি একটা বিশেষ ওষুধ পাঠাবেন। সেইজন্য তাঁকে তাঁর নিজের ঘরে যেতে হবে ওষুধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে ছেড়ে তাঁর উঠতে হবে। আমাকে

ছেড়ে অবশু উঠলেন এবং ক্ষিতীশদার ঘরের দরজা আগলে বসে আগন্তুক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন—'দেখুন, আমার এখন যাওয়ার উপায় নেই।' আমি একটি ওষুধ দিচ্ছি, তা এখনই রোগীকে খেতে বলবেন। তারপর ৭টা, ৮ টার সময় সম্ভব হলে আমি গিয়ে দেখে আসবো। তিনি এই বলে ক্ষিতীশদার ঘরের দরজা ছেড়ে তাঁর নিজের ঘরে দু-পা গেলেন, আবার পিছিয়ে এসে ঘরের দরজা আগলে রাখলেন। আমি এমন ভাব করে বসেছিলাম যেন আমার একটুও পালাবার ইচ্ছে ছিল না। মাসীমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'পালাবি না তো? আমি ওষুধটা নিয়ে আসি।, আমি সুবোধ বালকের মত উত্তর দিলাম—'না মাসীমা, আমি পালাবো না।' তবু তিনি ভরসা করে নিজের ঘরে ঢুকে ওষুধটা খুঁজে বার করতে পারছিলেন না। একটু গিয়েই আবার ফিরে এসে বিরাট বপু নিয়ে দরজা জুড়ে চেয়ারের উপরে বসেছিলেন। কিন্তু শেষ বার যখন তিনি উঠলেন পেসেণ্ট বিদায় করার জন্য, তখন আমি সেই সুযোগ আর ছাড়লাম না। এক লাফে উঠে দৌড় লাগালাম। মাসীমা চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'অনন্ত, বাবা আমার মাথা খাস্ পালাবি না।' এই বলে বলে আমাকে ধরবার জন্য আমার পেছনে পেছনে ছুটছিলেন। আমি তাঁদের বাড়ির উঠান পেরিয়ে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব বলে ভেবেছিলাম। বাড়িটি বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার দরজাটি বন্ধ ছিল। আমি মাসীমার আগে এলেও সেখানে থমকে দাঁড়ালাম। মাসীমা তাঁর বিরাট বপু নিয়ে ছুটে আসছিলেন। তাঁর পায়ের শব্দে আমি তা বুঝেছিলাম। পেছনে ফিরে তাকাবার সাহস আমার হচ্ছিল না, সময়ও আমার ছিল না। আমি দরজা ধরে সজোরে টান মারি। কিসে, কি দিয়ে বাঁধা ছিল তা আমি বলতে পারবো না। আমরা হ্যাঁচকা টানে দরজাটি খুলে গেছিল। আমি দিই ছুট্। আরেকটু সময় পেলে বোধ হয় মাসীমা আমায় ধরে ফেলতেন। মাসীমার সে কি ভীষণ ভয়াল দেহ। ভাবতেও আমি চম্‌কে উঠছিলাম। তাঁর সেই বৃহৎ বপু নিয়ে তিনি যদি হুমড়ি খেয়ে আমার ওপর পড়তেন, তবে ঘটোৎকচের চাপে যেমন অক্কা পেয়েছিল, আমিও তেমনি অক্কা পেতাম। বাইরে থেকে বন্ধ দরজার উপরে পড়ে তিনি টাল সামলালেন, যেহেতু আমি বেরিয়ে গিয়ে দরজাটি একটানে বন্ধ করেছিলাম। তখনও তাঁর মুখে সে ক'টি কথা লেগেছিল—'মাথা খাস অনন্ত যাস না, ফিরে আয়।' তিনি পরে আর কী কী বলেছিলেন তা শোনার

অপেক্ষায় আমি সেখানে ছিলাম না। পরে শুনেছি, বাবা নাকি এসেছিলেন। কিন্তু আমাকে দেখতে পেলেন না, মাসীমার কাছেই সব বৃত্তান্ত শুনলেন। বাবা সব শুনে মাসীমাকে বলেছিলেন—'এই হল আপনার অনন্ত, চিনে রাখুন।'

আমি এই বৃত্তান্ত মাষ্টারদা, অনুরূপদা প্রভৃতিকে বলি। গণেশের বাড়িতেও বলেছিলাম। গণেশের বাবা আমার মুখে সব ঘটনা শুনে হেসেই খুন। স্কুল খোলার আর দু'দিন মাত্র বাকী। স্কুল খোলার দিনেই আমাদের স্ট্রাইক করার দিন ধার্য ছিল। এই সময় মাসীমার গৃহে বা আমাদের বাড়তে বন্দী থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই আমি মাসীমার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি ভেজা বেড়ালের মত ভান করে মাসীমার কাছে বসেছিলাম। তাকে বোঝাচ্ছিলাম আমার পালাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু তখনও মনে মনে পরিকল্পনা এঁটে ছিলাম পালাবই।

স্কুল ষ্ট্রাইক হল। ছাত্র ও যুবকরা তাদের মিলিত অভিযান অক্ষুণ্ণ রাখছিল। প্রতিদিনই তাদের সভা মিছিল লেগেই ছিল। কিন্তু যৌবনের কর্মরত প্রাণ বসে থাকতে পারে না, নতুন কিছু করতেই হবে। তাই প্রথম চট্টগ্রামে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করতে আমরা লেগে পড়লাম। প্রদর্শনী চলবে এক মাস। স্থান—টাউন হল। প্রদর্শনীতে কি কি জিনিস থাকবে তার একটি লিস্ট করা হল এবং খবরের কাগজ মারফৎ জানানো হল। আমরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ সংগ্রহ করে আনলাম। আমার মা'র সুতা ও উলের কাজের অনেক জিনিস ছিল, সেগুলি প্রদর্শনীতে আনা হয়। সেগুলি আনা হয়েছিল লেডী ডাক্তারের সৌজন্যে। এই ছিল মীমাংসার আসল রূপ। তিনি আমাদের কাজে বাধাস্বরূপ ছিলেন না, আমাদের কাজের সমর্থক। আর বাড়িতে অশান্তি ঘটিয়ে আমরা কাজ করি তা তাঁর ইচ্ছে ছিল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল বাড়িতে শান্তি বজায় থাকুক এবং সবার শুভেচ্ছা নিয়ে আমাদের দেশপ্রেমিক কাজগুলো সুন্দরভাবে সমাধান হোক। তাই আমাকে তিনি বাড়ি নিয়ে যাবেন, মা-বাবার কাছে পৌছে দেবেন, আর অন্য দিকে স্কুল ষ্ট্রাইক, প্রদর্শনী প্রভৃতি সফল হোক—এটাও চাইতেন।

এই প্রদর্শনী পরিচালনায় করার জন্য এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হয়। সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন 'চন্দ্রশেখর দে'। তিনি আমার বাবার ছেলেবেলায় সাথী ডাক্তার 'হৃদয়চন্দ্র দে-র ছোট ভাই। 'চন্দ্রশেখর দে 'রাজাবাজার বম্ কেসে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে ছ' বছর জেলে ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের তরুণদের

কাছে একজন আদর্শ পুরুষ। এক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপযুক্ত সর্বাধিনায়ক —কেবল যেন তাঁকেই মানাত; গৌরবর্ণ, উচ্চতায় ৬১/২ ফিট্, বলিষ্ঠ দেহ, কণ্ঠস্বর একজন কমাণ্ডিং অফিসারের মত। তিনি প্রফেসর দে, তাঁর বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হবার পর শর্ট-হ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনিই সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল। তিনিও শর্ট-হ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শেখাতেন। এই প্রফেসর দে'র স্কুলের ছাত্ররা বড় বড় মার্চেন্ট অফিসে ও রেল অফিসে সহজেই চাকরি পেতেন। সেইকালে আমি তত বিশ্লেষণ করে দেখিনি একজন 'স্বদেশীর' কমার্শিয়াল স্কুল থেকে পাশ করার পর রেল ও বড় বড় মার্চেন্ট অফিসে চাকরি পাওয়া কি করে সম্ভব ছিল। তাঁর স্কুল থেকে পাশ করলে চাকরি পাওয়ার অসুবিধা ছিল না। একমাত্র জেলা-হাকিম ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সমর্থনে এইটি সম্ভব হোত। এই বুদ্ধি নিয়ে বিচার করতে তখন শিখিনি। তাঁর দাদা হৃদয়চন্দ্র দে আমার কাকাবাবু, সেই জন্য তিনিও আমার কাকাবাবু ছিলেন। 'রাজাবাজার বম্‌কেস' মামলায় দণ্ডিত চন্দ্রশেখর দে আমার কাকাবাবু—আমার কত গর্ব! এর বেশী সেই বয়সে ভাবতে শিখিনি। আমার লেডী ডাক্তার মাসীমা তাঁর ও তাঁদের পরিবারের কাছে খুবই পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। লেডী ডাক্তার মাসীমা টাউন হল ময়দানে আমরা যে ড্রিল করতাম, তা তিনি দেখতেন এবং আমরাই যে চন্দ্রশেখর কাকার নেতৃত্বাধীনে থেকে এই শিল্প মেলার যাবতীয় আয়োজন করছি, তা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।

টাউন হল ময়দানটি মাসীমার বাড়ির সংলগ্ন। আমার যাতায়াত তিনি প্রতিদিনই দেখতেন এবং অতি স্নেহভরা চোখে আমার দিকে তাকাতেন। একদিন তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে দেখলেন ও স্নেহভরা হৃদয়ে খুব করুণ কণ্ঠে আমাকে ডাকলেন, 'অনন্ত, আয় বাবা। কিছু খেয়ে যাবি। আমি তোকে আর ধরবো না। তুই কেবল একটু খেয়ে যা।' আমি বুঝেছিলাম মাসীমা ভান করছেন না আমাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দী করতেও চাইছেন না। সত্যি তিনি আমাকে যে খাওয়াতে চাইছিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাঁর কথায় আকৃষ্ট হলাম। মাসীমাকে বললাম—'এখন আসি, আরেকটু পরে এসে খাবো।' মাসীমা বললেন—'আচ্ছা যা। দুপুরের খাওয়াটা আমার সঙ্গেই খাবি, ভুলিস না।'

দুপুরে সাড়ে বারটার সময় আমাদের জন্য ঘণ্টি বাজলো। আমরা ময়দানে এসে সারি বেঁধে দাঁড়ালাম। অন্য আরেক দল প্রস্তুত হয়ে এসে শিল্পমেলায় বিভিন্ন স্টলে তাদের স্থান নিল। আমাদের তারা অবসর দিল। আমি মাসীমার বাড়ি গেলাম। মাসীমা খুব ভাল খাওয়াতেন। খাওয়ার লোভটাও আমার বেশ ছিল। আর আমাকে যে পাকড়াও করবেন না, সে সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমাকে দেখে তিনি খুব খুশী হলেন এবং বললেন—'যা হাত-মুখ ধুয়ে আয়, এখনি খেতে বসব।'

অনেক প্রকারের রান্না মাসীমার সঙ্গে বসে খাচ্ছিলাম। মাসীমা সেদিনের পালাবার কথা একটি বারের জন্যও তোলেন নি। আমার মনে হচ্ছিল, নীরব ভাষায় তিনি তাঁর মনের কথা জানাচ্ছিলেন—'কেন সেদিন তুই পালালি? আমি তোর বিরুদ্ধে কিছুই করতাম না। কেবল তোকে নিয়ে তোর মা, বাবার কাছে পৌঁছে দিতাম।' এইরূপ আমি মনে মনে ভাবছিলাম আর লজ্জাও পাচ্ছিলাম। মাসীমা খুব ধীর কণ্ঠে ও স্নেহভরা স্বরে আমাকে বললেন—'তুই আমাকে বিশ্বাস করবি! তোর কোন ক্ষতি হবে না। সত্যি বলছি তোকে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখলে আমার বুকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে। তোর মা'র দিকে আমি যেন আর তাকাতে পারছি না। তুই তোর মা'র খোঁজ আর কি রাখবি। তিনি কোনদিন খান, কোনদিন খান না। মা কি কখন ছেলেকে বকলে মনে রাখে? সেটা কি তাঁর অন্তরের কথা? তোকে ছেড়ে কি তিনি বাঁচতে পারেন? আমি বলি কি, তুই তাঁকে আর কষ্ট দিস না। আমার সঙ্গে তুই তোদের বাড়ি যাবি। তোর বাবা তোকে মারবে না। বকবেও না। সেই দায়িত্ব আমার। তুই বাড়িতে থাকবি। ঠিক সময় খাওয়া-দাওয়া করবি, আর তোর প্রাণে যা চায় তা করে বেড়াবি। আমরা তোর পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াব না। বল্‌ বাবা, আমার এই কথা তুই রাখবি?'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, মাসীমা আবার বললেন—'তুই এত ভাবছিস্ কি? তোর কি মনে হয়, আমি মিথ্যে বলছি।' মাসীমার ব্যথায় ভরা অভিমানের সুর আমার বুকে গিয়ে বাঁধলো। আমি তাঁর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললাম—'মাসীমা, আমি আপনার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করছি। আমি আপনার কথা মানবো। আপনি আমাকে বাড়ি নিয়ে

গেলে আমি যাব।' মাসীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিগ্যেস করলেন—তবে কবে যাবি বল্।' আমি বললাম—'তুমি ঠিক করে বল।'

মাসীমা ভেবে-চিন্তে বললেন—'কাল সকালের দিকে ন'টার সময় তুই আমার এখানে আসবি। তোকে নিয়ে আমি তোদের ওখানে যাব। নিশ্চয় আসবি কিন্তু। আমাকে কথা দিয়েছিস্ বলে ধরে নেব?' হ্যাঁ মাসীমা, তোমাকে কথা দিলাম।'

আমার রাত্রির বাস গণেশের বাড়ি এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। পরদিন সকালে গণেশের বাড়িতে চা-রুটিই খেয়ে মাসীমার বাড়িতে এলাম। মাসীমার প্ল্যান গণেশের বাড়ীতে জানিয়েছিলাম এবং গণেশের বাবা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন। মাসিমা আগে থেকে প্রস্তুত ছিলেন। বেরোবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত ছিল। তিনি উঠলে বাড়ির চাকরটি তাঁর পাশে ব্যাগটি তুলে দিল। তাঁর পাশে আর জায়গা ছিল না, আমি সামনের সীটে বসলাম। পনর মিনিটের মধ্যে গাড়িটি আমাদের বাড়ির কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকলো। বাবা তখন বোধ হয় দু'একজনের সঙ্গে চেম্বারে বসে কথা বলছিলেন। মাসীমা আমার হাত ধরে নামলেন এবং বাবার সামনে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

মা তখন রান্না ঘরে ছিলেন। মাসীমা আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন। মা আমাদের আগমন বার্তা জানতে পেরেছিলেন। মাসীমা আমাকে বলেছিলেন, 'তোর মা এলে—মাকে প্রণাম করবি।' অবশ্য মাসীমা না বললেও আমি তা করতাম।—আমাকে খুব একটা অপরাধী অপরাধী মনে হচ্ছিল না। বুঝেছিলাম আমার অবর্তমানে আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে একটি ঝড় বয়ে গেছে।—এখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সবাই যেন একটু ধৈর্যশীল হয়েছে। মা এলেন। মাকে আমি প্রণাম করলাম। মা আমাকে বুকে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আর বললেন—'বাবা, লক্ষ্মী সোনাটি আমার, মা'র উপর কি রাগ করতে আছে?' মাসীমা বললেন—'দিদি, ছেলেকে নিয়ে এলাম। সে এখন লক্ষ্মী ছেলে। আর তেমন কিছু করবে না যাতে তোমাদের অত রাগ হয়।' মা শুনলেন, কি আর বলবেন। মনে হল আজ যে সকালে তিনি আমাকে নিয়ে আসবেন—এই খবরটি আগে থেকে দিয়ে ছিলেন। বাবা ভিতরে এলেন। আমি যথারীতি বাবারও পায়ের ধুলো নিলাম। স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি আশীর্বাদ করলেন। তবু, বাবা

শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য বললেন—'আমরা তোমার দেশপ্রেমিক কাজে নিশ্চয় বাধা দেব না। সব সময় আশীর্বাদ করব তুমি সফল হও, দীর্ঘজীবী হও। তবে তোমার মনে রাখতে হবে, কোনদিনই খারাপ সঙ্গে মিশবে না। খারাপ কাজ করবে না। দেশের কাজ খুব সহজ নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হলে চাই সাধনা, একাগ্রতা। তোমার সহপাঠীরা মুকুন্দ, গণেশ আদর্শ ছেলে। তারা লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো। তারা স্কুল ছেড়ে দিল। তাদের কথা ভাবি, ভবিষ্যতে তারা কি করবে। জানি স্কুল, কলেজে পড়েই যে কেবল শিক্ষিত হয়, তা নয়। স্কুল কলেজে না পড়ে রবীন্দ্রনাথের মত বিজ্ঞ তুমিও হতে পার। তা হতে হলে যে কী পরিমাণ সাধনার প্রয়োজন তা কেবল ভাবা যায়, বর্ণনা করা যায় না। যে কাজ শুরু করেছ—যে দৃঢ়তা নিয়ে তুমি কাজ শুরু করেছ তার একনিষ্ঠ সাধক যদি তুমি হও হবে, কে জানে তুমিও একদিন রবীন্দ্রনাথ হতে পারবে না। আসল কথা হল সাধনা—অন্তরের সাধনা। আমাদের আশীর্বাদ তোমার উপর রইল। তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

বুঝতে পারছিলাম বাবার আমাকে নিয়ে স্বপ্ন ছিল যে আমি খুব বড় হব। ভবিষ্যতে আমি যতীন্দ্রমোহন, চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজির মত কেউ একজন হব। কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল—ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীনের মত কেউ একজন হব। বাবা, মাসীমা, মা কেউই ভাবতে চাইতেন না আমি বিপ্লবের বন্যায় ভেসে যাই। তাঁরা ভাবতে পারতেন না কানাইলাল, ক্ষুদিরামের মত আমি ফাঁসির দড়ি গলায় পরি। কোন মা বাবাই হয়ত তাঁদের সন্তানের জন্য সেইরূপ চিন্তা করতে পারেন না। তরুণ মনের আকর্ষণ সব সময় ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধ আমার মনে কল্পনা তুলতো। তাই কোন গান্ধীজি আমাকে আকর্ষণ করতে পারেন নি। আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লবী ডি ভেলেরা, আর আমার প্রাণে মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা জেগেছিল মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির ইতিহাস পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি প্রাণ দেব। 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' এই আমার জীবনের মূল শ্লোগান ছিল।

৪
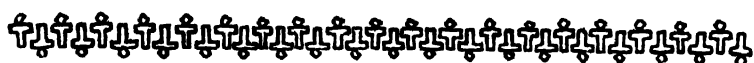
আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগের কথা। তখন আমার বয়স খুব বেশী হোলেও সতর কি আঠার। বিপ্লবীদলে আছি। দলের সব নিয়ম মেনে চলি বা চলতে চেষ্টা করি। মা-কালীর পূজো প্রতিদিনের জীবনে একটি অপরিহার্য নিয়ম। ঘটা করে ধূপ ধূনো দিয়ে ফুল-বেলপাতা সাজিয়ে ঘণ্টা ও শঙ্খ বাজিয়ে পূজো আমরা করতাম না। মায়ের সাধনার সময়ও কিছু ঠিক ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজির মত মাকে ডাকার মন্ত্র যা জানতাম—সেটি হোল—'মা মা বলে কেবলই কাঁদা।' প্রার্থনা বলে কিছুই ছিল না—তিনি ত সর্বজ্ঞ। তিনি আমাকে যা দেবার তা তো দেবেনই। মাকে গোপনে ও নিভৃতে ডেকে ডেকে নয়ন জলে ভাসতাম—তাতেই আমার মন ভরে উঠত। মা—মাগো তুমি একবার দেখা দাও—দেখা দাও মা! আমরা যখন এইরূপ কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই, তখন আমাদের দলের অন্যান্য বন্ধুদেরও হয়ত সেই একই অবস্থা। সেই সময় আমাদের এক সাথী, নবীন হঠাৎ তার মনের প্রশ্নটি'সবার কাছে রাখল। 'আচ্ছা' ধরা যাক মা সত্যি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কারো সামনে অন্ধকার ও নির্জ্জন ঘরে হঠাৎ তাঁর ভীষণা মূর্তি নিয়ে—হাতে খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা, লক্ লকে জিহ্বা বিস্তার করে এসে দাঁড়ান তবে কি আমরা ভয় না করে তাঁর চরণ প্রান্তে আমাদের দেশ মুক্তির পণ জানাতে পারব ? না কি ভীষণা ভয়ঙ্করা কালী-করালীনি বরাভয়ার সামনে মূর্চ্ছা যাব, আমাদের কিছুই আর বলার থাকবে না? আজও মনে পড়ে, আমি নবীনকে বলেছিলাম, মাকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব—'তুমি মা উলঙ্গিনী কেন? তোমার কি কোন লজ্জা নেই?'

সেই দিনের কঠোর সাধনা, কঠোর ধ্যান, কঠোর ব্রহ্মচর্য জীবনের নিয়ম পালন আমাদের বিপ্লবী আদর্শে চরিত্রবান করে তুলতো। মনে হোত যেন আমি স্বয়ং স্বামীজী। কোন মেয়েদের সঙ্গে মিশতাম না, এমনকি কথাও বলতাম না। মেয়েদের সবাইকে মা বোনের মত ভাবা, তাঁদের কোনরূপ সংস্পর্শে না আসা,

দূরাসনে বসা, তাঁদের মুখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলা, কামে মোহগ্রস্থ হওয়ার আগে পরিবেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। এমন উপদেশ বইয়ের পাতায় পড়েছি। সাধু মহাজনদের মুখে শুনেছি। কিন্তু জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ বইতে লেখা নেই, আর উপদেশ প্রভৃতিতে তার বাস্তব প্রয়োগ করার নির্দেশও দেওয়া নেই। বাস্তব জীবনকে যে নিজ ক্ষমতায় পরিচালিত করে, ব্রহ্মচর্য পালন করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্বয়ং তার নিজেরই। সেই কথাটি বুঝেছিলাম আমার কৈশোরে। ব্রহ্মচর্য পালন করার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ (রামচন্দ্রের ভাই) বার বছর সীতার মুখের দিকে একবারও তাকাননি, আর তিনি ফলমূল খেয়ে বার বছর বনবাসে ছিলেন এবং ব্রহ্মচর্যের শক্তি নিয়ে ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে সমর্থ হন। আমরা রামায়ণের যুগে ছিলাম না। তাই স্বামীজীর বাণী—'দেশ আজ তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আজ চাই রজগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। তাই বলি তোরা মাছ-মাংস খাবি—খুব খাবি।

স্বামীজীর উদ্দীপ্ত এই মহাবাণীর উপাসক ছিলাম। মাছ, মাংস খুব খেতাম। ডন কুস্তি খুব করতাম। প্রথম সাক্ষাতে মাষ্টারদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন শুনেছি তুমি তোমাদের স্কুলের রামমূর্তি। কিন্তু মনে রেখো, রামমূর্তি হওয়া ও স্বদেশ-প্রেমিক হওয়া এক নয়। ভেবে দেখ তুমি ক্ষুদিরাম হবে, না রামমূর্তি ?

আমি শক্তি চাই—রামমূর্তির মত হতে চাই। তাই বলে ক্ষুদিরামের মত স্বদেশ-প্রেমিক হব না তা কি কখনও হতে পারে ? কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক হতে হলে মায়ের পূজো চাই, সাধনা আরাধনা চাই—লক্ষ্মণের মত ব্রহ্মচারী হওয়া চাই। তাই বিপ্লবী দলে ব্রহ্মচর্য চর্চা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালনের জন্য কলের মত নিয়ম পালন করে চলতে চেষ্টা করতাম—যেমন নাকি কোন মেয়ের মুখের দিকে চাইব না। সত্যি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে যখন এই রকম কঠোর নিয়ম পালন করে চলেছি তবু ক্ষণিকের জন্যে হলেও একটি মেয়ের দর্শনে আমারও অন্তর আচ্ছন্ন হয়েছিল।

এই সঙ্গে আমাদের বিপ্লবী দলে নানা ধরনের কাজকর্ম লিপ্ত ছিলাম। বোমা তৈরী, কার্তুজ প্রস্তুত কিছু কিছু চলেছিল। তড়িৎ শক্তি প্রয়োগ করে বোমা বিস্ফোরণ করার পদ্ধতি আমি আবিষ্কার করি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র মাত্র। কেবল এইসব প্রস্তুত করাটাই আমার কাজ ছিল না। অস্ত্র-শস্ত্র গুপ্ত স্থানে অর্থাৎ তেমন তেমন দরদী লোকের সমর্থন যোগাড় করা যিনি বিপদ জেনেও

তাঁর বাড়িতে বে-আইনী মারাত্মক জিনিস গোপনে রাখবেন। যাঁকে বেছে নিতাম তিনি হবেন নিরীহ ব্যক্তি, খুবই গো-বেচারা, বিশ্বাসী ও পুলিশের সন্দেহাতীত। আমার পাড়ায় আমার জানা এই ধরনের তিনটি বাড়ি ছিল। দুটি মুসলমান ও একটি হিন্দু বাড়ি। আমাদের বাড়ি সংলগ্ন মুসলমান বস্তিতে যাঁরা থাকতেন তাঁরা সবাই সরকারী কর্মী। সবাই টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগের শ্রমিক ও উচ্চপদস্থ কর্মরত ইনেস্পেক্টর, সুপারভাইজার বা সহকারী ইঞ্জিনীয়ার। হানিফ মিঞা একজন খুব সাধারণ গরীব টেলিফোনের কর্মী। সে-ই ঐ বস্তীর সবচেয়ে গরীব ব্যক্তি। তবে তার প্রতি কারো অভিযোগ ছিল না। মনে হোত সে সেই বস্তীতে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি গরীব—তাঁর অভাবের সংসারে যদি দুটো টাকা দিতে পারি তাঁর কতই না উপকার হয়। একদিন আমি তাঁকে আমার মনের কথা জানাই। তিনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। পাড়ায় সবাই জানত আমি স্বদেশী ছেলে—অর্থাৎ গান্ধীজীর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রথম সারির স্বেচ্ছাসেবক। আমি শ্রদ্ধেয় হানিফকে একদিন আমার প্রয়োজনের কথাটি জানাই—আপনার বাড়ি পুলিশের চোখের বাইরে। আপনি সরকারী চাকরী করেন তাই আপনার গোপনে হেপাজতে আমি কিছু সরকার-বিরুদ্ধ পিস্তল ও গুলি-গোলা মজুদ করতে চাই। আপনাকে আমার খুব বিশ্বাস তাই আমার গোপন বাসনাটি আপনার কাছে প্রকাশ করলাম। আপনার সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন এবং আমার এই প্রস্তাব আপনি অনুমোদন করবেন আশা করি আর এই কথা সবার কাছে গোপন রাখবেন। জনাব হানিফ আমাকে বলেছিলেন—বাবু, আমি এইটুকু করলে যদি আপনাদের সাহায্য হয় তবে আমি তা করবই, এবং খুশী হয়েই করব।'

আমি হানিফ মিঞার কাছ থেকে এইরূপ সাহায্য পেয়ে আমাকে খুব কৃতার্থ মনে করেছিলাম। আমার মা, দাদা ও দিদি জনাব হানিফের এইরূপ সহৃদয়তা ও স্বদেশপ্রেমের কথা জেনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মা বলেছিলেন—'তারা খুব গরীব। মাঝে তার স্ত্রী আমার কাছ থেকে দু'-এক টাকা ধার নিয়ে যায় এবং পরিশোধও করে। যদি তাদের মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতে পারিস তবে তা করিস।' আমার দিদি অতি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন—'হ্যাঁ ভাই তোদের তা করতে হবেই। আর ওঁদের জন্য প্রতি মাসে সামান্য টাকা আমরাই দিতে পারব।' প্রতিমাসে হানিফ মিঞাকে আমরাই পঞ্চাশ টাকা করে দিতাম।

আমি এই পাড়ার মধ্যে কারো বাড়ি যেতাম না। সেই কারণে জনাব হানিফের বাড়িতেও কোন দিনই যাওয়া আমার হয় নি। আর অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে রাখার পর তাঁর বাড়ি আরো নিরাপদে ও সন্দোহাতীত থাকুক সেরূপ প্রচেষ্টাই আমার ছিল। আমি জনাব হানিফের ঘরে বে-আইনী জিনিস রাখছি কেউ কোন দিন ভাবতে পারেনি। তাঁকে অবশ্য আমার বলা ছিল যদি আমাকে জেলে ধরে নিয়ে যায় তবে যেন তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে আমার মার কাছে ঐসব জিনিস পাঠিয়ে দেন। মা-ই জানাবেন কখন কোনটি আমাদের প্রয়োজন। মার কোন্ আপত্তি ছিল না—তিনি হানিফ মিঞার সততা সম্বন্ধে খুবই আস্থাবান ছিলেন।

আমি আমার নিজের বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকতাম। পাড়ায়ও থাকতাম না। মুসলমান বস্তীর সবার সঙ্গেই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কোন বাড়িতে কোন বিশেষ সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হলে সেই সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমরা যেতাম। সব ক্ষেত্রে আমি যেতে পারতাম না, তবে আমাদের বাড়ি থেকে সেই সব নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া হোতো। তাঁরা সবাই আমাদের খুব সমাদর করতেন।

সেই বস্তীতে যাওয়ার রাস্তা, আমাদের দুটি পাশাপাশি বাড়ির মাঝখানের পথ দিয়ে। একদিন হঠাৎ আমি দেখি অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে সেই রাস্তা দিয়ে বস্তীর দিকে যাচ্ছে। কে ও মেয়ে, তার সঙ্গে কেউ নেই। এই দুপুরে একা একা এই মেয়েটি কে? হিন্দুঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল। সতের আঠার বছর পূর্ণ যৌবনা, রূপে লাবণ্যে ভরা, দেহ উজ্জ্বল সরল সেই মুখ, ছন্দতুলে উর্বশী যেন স্বর্গের ইন্দ্রলোকে প্রবেশ করছেন। আমি আগে যেন সেই রূপ কখনও দেখি নি, আমি বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মনে হতে লাগলো—রামায়ণ মহাভারতের পাতায় পাতায় বহু মুনি-ঋষির স্খলন ও পতনের ঘটনার উল্লেখ আছে। দেবতারাও সুন্দরীদের রূপরসে দেবজ্ঞান ভুলে যেতেন। দেবতাদের অনুরূপ কুকীর্তি পৌরাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। উর্বশী ইন্দ্রের সভায় নৃত্যকলা প্রদর্শনীতে দেবতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং গুরু গৃহে গেলেন শিক্ষালাভের জন্য। গুরুপত্নীকে দেখে তিনি চঞ্চল হলেন। তাঁর সৌন্দর্য ও রূপ দেখে ইন্দ্র মোহগ্রস্থ হলেন। একদিন গুরুপত্নীকে একা ঘরে পেয়ে তিনি তাঁর শালীনতাহানী করলেন। গুরু ধ্যানস্থ হয়ে সবই দেখতে পেলেন। তিনি ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যেনতাঁর সর্ব শরীর মেয়ে-মানুষের যৌন-চিহ্নাবৃত হয়। যৌন-চিহ্নাবৃত যে দেবতার কলেবর

আমরা দেখতে পাই সে দেবতা আর কেউ নন—দেবাদিদেব ইন্দ্র। পবন দেবতাকে ভক্তিভরে জল দিলেন। পবন দেবতা বানরী অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হলেন। তাঁর কাম চরিতার্থ করলেন এই বানরী অঞ্জনার পবিত্রতার বিনিময়ে। অঞ্জনার গর্ভজাত পুত্র হলেন—হনুমান, মহাবীর পবন-নন্দন।

হায়রে ব্রহ্মচর্য! দেবতারা যেখানে অক্ষম, পরাজিত, মুনি-ঋষিরা যেখানে পরাভূত সেখানে সামান্য মানুষ—বিপ্লবী যুবকরা গৃহে বাস করে লোকালয়ে থেকে ব্রহ্মচর্য করবে কী উপায়ে? হঠাৎ একটুখানি দেখা ঐ পাড়ার মধ্যে। দেখেছি মাত্র একটুখানি। তখনও জানি না—মেয়েটি কোথায় থাকে, কেন এই পাড়ায় এসেছে? কি তাঁর নাম, কি তার পরিচয়?

সেই মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল না। আপন মনেই চলে গিয়েছিল। চলে গিয়েছিল আমার চোখের অন্তরালে; কিন্তু আমার মনের পর্দা থেকেও কি সে চিরতরে বিদায় নেয়? সত্যি বলতে কি আমার মনে তাকে কোন স্থান দিতে আমি চাই নি। তবু সে আমার মনের পর্দায় ছিল।

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'মা আমাদের বস্তীপাড়ায় বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের মেয়ে কে আসে, এবং সে কোথায় যায়?' মা আমার প্রশ্নটা শুনে সবটা বুঝতে পারলেন না। তিনি আমাকে পরিষ্কার করে বলতে বলেন। আমি যখন মেয়েটির বিবরণ দিলাম তখন মা বললেন—'ও বুঝেছি। তুই হানিফের মেয়ে সোফিয়ার কথা বলছিস। তুই ছাড়া সোফিয়াকে হয়ত সবাই চেনে। সে কেবল অপূর্ব সুন্দরীই নয়—অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবেও। এত সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়—অন্তত আমার তো আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি। সোফিয়া কেবল খুব গরীব ঘরের মেয়ে—এই যা তার ত্রুটি।'

আমার কেবলই মনে হত লাগলো, 'সোফিয়া গরীব' 'সোফিয়া গরীব ঘরের মেয়ে'! সোফিয়ার কথা মনে করে বহুবারই হয়ত দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপেছি; নানা উপলক্ষ করে তাঁদের বাড়ি হয়ত আমি যেতে পারতাম কিন্তু যাইনি। যদি তার বাবাকে বলতাম, আপনাদের বাড়িতে আমাকে খাওয়ান, তবে তাঁরা আমাকে বঞ্চিত করতেন না। সোফিয়াকে দেখার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য, শত ইচ্ছা হলেও নিরাপদ স্থানটিকে সযত্নে নিরাপদ রাখতে হবে বলেই সেইরূপ ইচ্ছাকে দমন করেছিলাম। আমার অস্বাভাবিক গতিবিধি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হয়েছে। তবে সোফিয়া যে আমাকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা ঠিক, যে কোন

সময় তাঁর প্রতি কখনও আমি অসৌজন্য ব্যবহার করি নি। কেবল আমার মনের গোপন কথাটি তিনি কখনও জানতে পারেননি। তাঁর বাবা শ্রদ্ধেয় হানিফ মিঞাও কখনও তা টের পান নি। এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে সোফিয়াকে আমি ভুলতে পারলাম না? আমডাঙা গ্রামে বন্দী জীবনে, সরকারের বন্দীশালায়, সমুদ্রবেষ্টিত আন্দামান দ্বীপের কারাকক্ষে সোফিয়াকে আমার মনে হয়েছে—সে কোথায়, কেমন আছে? সোফিয়া এখন কোথায়? —কোনো দীনদরিদ্র পূর্ণকুটিরে, না কি শহরের কোন বড়লোকের গৃহিণী সোফিয়া খাতুন বা সোফিয়া বেগম। সোফিয়া তোমার এই একজন দাদার মঙ্গল কামনা সব সময়েই তোমার জন্য ছিল। তুমি ভালো থেক, সুখে থেক। যদি খবর জানতে পারি খুব ভাল লাগবে।

আই বি পুলিশের সাব-ইনস্‌পেক্টর 'প্রফুল্ল রায়কে যে পিস্তলটি দিয়ে প্রেমানন্দ হত্যা করে, সেই পিস্তলটিও হানিফ্‌ মিঞার ঘরে লুকানো ছিল। আমার দাদা সেই পিস্তলটি প্রেমানন্দকে দিয়েছিল। প্রেমানন্দ সেই পিস্তলটি আমার দাদার কাছ থেকে পেয়েছে—এইটুকু মাত্র জানতো। আসলে সেই পিস্তলটি যে কোথায় থাকত জানতাম আমরা মাত্র চারজন—মা, আমি, দাদা, দিদি। যদি কোন কারণে কোন অবস্থায় দাদা ধরা পড়ত এবং দাদা পুলিশের কাছে এই গোপন বাড়ির সংবাদ দিত, তবে পুলিশ সেই বাড়ি তল্লাসী করে রিভলবার, পিস্তল—যা ছিল, সব পেয়ে যেত।

প্রেমানন্দ প্রফুল্ল রায়কে যে হত্যা করেছিল, সেটা ঠিক; আবার সে যে তার সঙ্গে গোপনে মিশত ও সংবাদ দেওয়ার জন্য ভান করে তাকে ডেকে আনত তাও ঠিক। এই তথ্য প্রফুল্ল রায়ের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে এবং প্রেমানন্দের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায়। প্রেমানন্দ যশোর জেলে তার বন্ধুদের কাছে অতি গর্বের সঙ্গে বলেছিল—'আমি একটি ভাল কাজ করেছি। পুলিশ তার এজেন্টদের আর বিশ্বাস করবে না। এজেন্ট সেজে অনেক কথাই আমি প্রফুল্ল রায়কে বলেছি। তারপর তাকে হত্যাও করলাম।'

হায়রে প্রেমানন্দদা! তুমি তোমার সরল বিশ্বাসে ভেবে নিয়েছিলে পুলিশ তাদের গুপ্তচরদের আর বিশ্বাস করবে না, যেহেতু তুমি তাদের একজন ব্যতিক্রম! বাস্তবে তা নয়। পুলিশ তাদের এজেন্ট যোগাড় করবেই এবং এজেন্ট পাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না।'

যাই হোক প্রফুল্ল রায় প্রেমানন্দের কাছে বিশেষ খবর জানতে পারেনি—সে

পিস্তলটি কোথা থেকে পেয়েছে—পিস্তলটি কোথায় রাখা হয়। তার আগেই প্রেমানন্দের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হলো। তখন আমি জেলে। জেলে থাকলেও মা, দাদা, দিদির সঙ্গে আমার দেখা হত। তাঁদের কাছে জানতে পারতাম যে, আমার কাছে গুলি বারুদ রাখার যেসব গোপন জায়গা ছিল পুলিশ তার কোনটারই হদিশ পায়নি। জেলে আমার বহু চিন্তার মধ্যে এই একটি চিন্তা আমাকে সব সময় বিচলিত করত, পাছে কোন একটি গুপ্তস্থানও যদি পুলিশের কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁরা খুব বিশ্বাসী এবং আমরা আমাদের গুপ্তস্থান সম্বন্ধে দলের অন্য কাউকে জানাতাম না।'

অর্ডিনান্সে আমরা যখন জেলে আবদ্ধ ছিলাম তখন পুলিশ শত শত বাড়ি অনুসন্ধান করেছে এবং অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা ও গুলি-বারুদ উদ্ধার করেছে। প্রতিদিনই উৎকণ্ঠার সঙ্গে খবরের কাগজ খুলে দেখতাম আমার কোন জানা বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ধরা পড়েছে কি না। বহু উৎকণ্ঠা কাটিয়ে আমি চার বছর পরে ছাড়া পেলাম। আমি চট্টগ্রামে এসে প্রথমেই ভাবতে লাগলাম আমার বিশ্বাসী বন্ধুরা সবাই ঠিক আছে কি-না। তাদের ওখানে আমার আগ্নেয়াস্ত্র ও বে-আইনী জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা তখনও অব্যাহত আছে কি না। সবকটি বাড়িতে কোন-না কোন অজুহাত নিয়ে গেলাম। তাঁরা আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় না কি জেল খেটেছি বলে সমাদর বেড়েছে তা দেখতে গেলাম। কেউ আদর-অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করেননি—মনে হলো জেল থেকে এসেছি বলে তাঁদের সকলের কাছেই আমি আগের চাইতে বেশী প্রিয় হলাম। এই হ'লো জনগণের প্রকৃত চেহারা—তাঁরা স্বদেশপ্রেমিকদের ভালো বাসেন বেশী বিশ্বাস করেন। তাঁদের কাছে ভালবাসা পেয়ে এবং তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করে আমার স্বভাবতই মনে হয়েছিল আমার কর্মশক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আরো মনে হয়েছিল, জনসাধারণের কর্মশক্তি ও সাহায্যই আমাদের সংগঠনের যথার্থ শক্তি। কাজেই সংগ্রামী সাহসী ছেলে থাকলেই সব হয় না, আমাদের সংগঠনের অনিবার্য প্রয়োজনে সুযোগ্য সমর্থক বাহিনীও যে প্রয়োজন, তার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি, আরো বেশী করে অনুভব করতে লাগলাম। যেটি গল্পের মত করে পড়েছিলাম—ম্যাভারিক জাহাজে করে জার্মানী থেকে প্রচুর রাইফেল ও কার্তুজ আসছিল বাংলার বিপ্লবীদের জন্য। সেটি বাস্তবে অনুধাবন করে শিউরে উঠতাম! কিরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কেবল মাত্র একজন অনন্ত সিং বা তিনটি

বাড়ি অস্ত্র-শস্ত্র রাখতে প্রস্তুত থাকলে ত চলবে না ; মাত্র একজন হানিফ বা একজন উপাধ্যায় বা একটি সেন পরিবার থাকলেই ত প্রয়োজন মিটবে না।

আমি তাঁদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বুঝেছিলাম তাঁরা সবাই এরূপ সমর্থন যোগাতে প্রস্তুত আছেন। মনে হয়েছিল কংগ্রেসের ব্যাপক আন্দোলন যে স্বদেশ প্রেমের সাড়া জাগিয়েছে তার প্রভাবে একশ্রেণীর জনসাধারণ বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম সমর্থন করতে এগিয়ে আসতে উদ্‌গ্রীব। কেবল তাদের কাছে সঠিকভাবে প্রস্তাবটি করা। সেইজন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। আমার অভিজ্ঞতা ও সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, দলের দুর্নাম রটে গেছে। —তাদের মধ্যে রাজসাক্ষী ছিল প্রায় প্রত্যেকটি ছেলে—প্রায় প্রত্যেকটি যুবকই যা জানে পুলিশের কাছে তা বলেছে আর পুলিশ দলের গোপনীয় স্থান সমূহ তল্লাসী চালিয়ে তাদের গোপন অস্ত্র-শস্ত্র, গোপন বই প্রভৃতি নিয়ে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁরা সমর্থন করতেন তাঁদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন কা'হনীও জনসাধারণ জানতে পেরেছিলেন। সেরূপ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কি সমর্থক স্বজনরা এগিয়ে আসবেন আশা করা যায়। তাই সংগঠকদের ব্যক্তিগত জীবন যদি কলঙ্কময় হয়ে থাকে তবে সে সব সংগঠকদের সমর্থকদের বাড়ির দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তাই আদর্শ সামাজিক ব্যবহার আমাদের থাকা যে একেবারে প্রাথমিক বস্তু তাও সজ্ঞানে বুঝেছিলাম। হানিফ মিঞার বাড়ি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে এই জ্ঞানই আমাকে সাহায্য করেছিল। তাই সোফিয়াকে খুব ভাল লাগা সত্ত্বেও আমার বৈপ্লবিক বিবেক আমাকে সংযত থাকতে যথার্থ সাহায্য করেছিল।

অন্তরীণ থেকে বাইরে এসে এদিক-ওদিক খোঁজ করেছি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি-না—আমার কোন গোপন স্থান বে-আইনী অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়েছে কি-না—কোন একজনও বিরক্ত হয়ে জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দিয়েছে কি-না। শুনে শুনে বুঝেছিলাম—তাঁরা নির্ভয়ে ছিলেন—তাঁরা অন্তর দিয়ে নিখুঁত ভাবে বুঝতেন সেখানে আমার মাকেও জড়িয়ে রেখেছি, সেই ক্ষেত্রে আমার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া কোনরূপ নির্যাতনই যে আমাকে ভাঙতে পারবে না সে সম্বন্ধেও তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন। সেইজন্য জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আমাকে যেন আরো বেশী বিশ্বাস করতেন। তবে যদি একবারও জানতে পারতেন স্বয়ং প্রেমানন্দই আমাকে ধরিয়ে দেয়, তবে বিপ্লবী সংগঠনের ওপর আর বিশ্বাস করতেন কি-না কে জানে!

আমি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কাছেই আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসের খবরটি জানি। তবে বিশেষ করে সব সময়ই জানতে ইচ্ছে করছিল—সোফিয়া আমার সংবাদ রাখে কি না। তার বাবাকে কতবার জিজ্ঞেস করব ভেবেও জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না—'সোফিয়া আমার অস্ত্রাদি রাখার সংবাদ রাখত কি?' খুব একটি সামান্য কথা তবু তা আমি তার বাবার কাছে জানতে পারছিলুম না কেন? কেন আমি তার বাবাকে একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করলাম না—সোফিয়া কেমন আছে সে এখন কোথায়—তার বিয়ে হয়েছে কি-না? ঐরূপ অতি সাধারণ কথাও সোফিয়া সম্বন্ধে আমি তার বাবার কাছে জানতে চাইনি কেন? মনঃস্তাত্বিকেরা এক-মুহূর্তে বলে দেবে কোথায় আমার বাধা ছিল—কেন আমার সহজ সরল ভাব ছিল না? সত্যে আমি ত চেতন মনে সোফিয়াকে আমার জীবনের চিরসাথী বলে কখনও একবারের জন্য কল্পনা করিনি? অবচেতন মনের বিকার ছাড়া এই মনোভাবের অন্য কি ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি? সোফিয়া সম্বন্ধে আমার এত সংকোচ কেন? 'সে কোথায়, তার বিয়ে হয়েছে কি না?'—এই সংবাদ—আগ্রহে আমার অন্তরের গোপন কোঠায় একটি বিশেষ স্থানের খোঁজ দিচ্ছিল তাই হয়ত আমার এত সংকোচ, এত দ্বিধা, নীরবতা।

শেষ পর্যন্ত নীরব আর থাকতে পারলাম কোথায়? একদিন আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম—'মা ঐ যে সেই মেয়েটি—' যেন তার নাম আমার জানা নেই—'এখন কোথায়, তার কি বিয়ে হয়ে গেছে? মার কাছে ভাব দেখিয়েছিলাম—যেন হঠাৎ মনে পড়লো তাই কথায কথায় জিজ্ঞেস করছি। মা'কে অত বোকা ভাবলে চলবে কেন? মা হয়ত ভেবেছিলেন 'হঠাৎই সোফিয়ার কথা আমার মনে পড়েছে। তাই আমি সাধারণ ভাবে তার খোঁজ নিচ্ছিলাম।' মা যদি সাধারণ ভাবে জিনিসটাকে নিতেন তবে নিমেষের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কেন? তারপর কিঞ্চিৎ চক্ষু সংকুচিত করে সহজ ভাবে বলেছিলেন—'মাত্র কিছুদিন আগে সোফিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। শুনেছি তার বর টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার। বরটি খুব ভাল হয়েছে—সোফিয়ার বিয়েতে আমি সোফিয়াকে কিছু গয়না দেব—তা আর হয়ে উঠল না। মাত্র একটি বেনারসী দিয়েছি। এবার যখন সোফিয়া বাপের বাড়ি আসবে, তখন তার শ্বশুরবাড়ীর খবর সব নেব।

মা এইসব বলার সময় আমাকে লক্ষ্য করছিলেন কি-না, তা আমি দেখিনি—অর্থাৎ মায়ের দিকে ইচ্ছে করে না তাকানোর ভান করেছিলাম।

না তাকানোর ভানও, লক্ষ্য রাখলে খুব ভাল করে বোঝা যায়। সোফিয়ার বিয়ে হয়েছে শুনে আমার যেন ভালো লাগেনি। বিয়ে হয়েছে শুনে আমার খুব ভাল লাগেনি কেন? কেন আমি বিশেষ আনন্দিত হই নি? মা তাকে বেনারসী দিয়েছেন সোনার অলঙ্কার দিতে পারেননি শুনে আমার স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না কেন? কেন মাকে বলিনি, সোফিয়া তার বাপের বাড়ী এলে তাকে তুমিত তোমার মনের মত অলঙ্কার দিতে পার— ইচ্ছা করলেই হার, বালা, চুড়ি প্রভৃতি দিতে পার।

মার সঙ্গে তখন আর আমার কথা হোল না। কিন্তু সোফিয়ার বিয়ের সংবাদ শুনে—বিশেষ করে সরকারী টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে জেনে ভাবতে শুরু করেছিলাম—যদি সোফিয়া আমাদের অস্ত্র শস্ত্রের কথা জানত এবং তাতে তার সমর্থন ও বিশেষ উৎসাহ থাকত তবে বিয়ের পর আমাদের কাজে লাগত। আজ তার স্বামীকেও আমাদের সমর্থনে পাওয়ার হয়ত চেষ্টা করত—আমরা তাঁর সমর্থনও হয়ত পেতাম। এখন আমার কর্তব্য সোফিয়ার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করা ও তাঁকে আমাদের সমর্থক হিসাবে পাওয়া। তবে তার আগে হানিফদার কাছে একবার জেনে নিই 'সোফিয়া' কতটুকু জানত এবং কতখানি তার উৎসাহ ছিল।

হানিফদা'র কাছে খুব গুছিয়ে নিয়ে কথাটা পাড়লাম—'হানিফদা আমাকে বাস্তবিক একটা চিত্র দিনত সোফিয়ার—তার মার ও আপনার আমাদের প্রতি সমর্থনের কথা কতটুকু জানত? সে কি অস্ত্র শস্ত্র কখনও হাতে নিয়ে দেখত? সে কি যন্ত্রপাতিগুলির পূর্ণ মর্যাদা দিত? প্রফুল্ল রায় নিহত হওয়ার পর তাদের ও আমাদের একই পাড়া থেকে প্রেমানন্দকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। শহরে রটে গেল প্রফুল্ল রায় অনন্ত সিং-কে গ্রেপ্তার করেছিল বলে তাকে প্রেমানন্দের গুলিতে প্রাণ দিতে হোল—এই কথা কি আপনারা শুনেছিলেন? সোফিয়া কি শুনেছিল? হানিফদা উৎসাহের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—'প্রফুল্ল রায়কে গুলি করার সংবাদ শুনে আমরা খুবই খুশী হয়েছিলাম। আমার মেয়ে আপনার গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে আল্লার কাছে প্রার্থনা করত যেন আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ হয় এবং আপনি যেন তাড়াতাড়ি মুক্তি পান। প্রফুল্ল রায় আপনাকে ধরেছিল বলে মেয়ে'র সে কি ভীষণ রাগ! যেন পারলে সে তাকে তক্ষুণি গুলি করে। সোফিয়ার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে আমার খুব ভালই লাগছিল। আমার মনে হচ্ছিল যদি আমাদের সেইরূপ কোন ব্যবস্থা থাকত

তবে আমার দিদির মত সেও হয়ত গুলি চালানো শিখে নিত। যাই হোক সোফিয়ার মনের যতটুকু পরিচয় পেলাম তাতে তার স্বামীর খোঁজটি নিতে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করেছি।

যা ভাবা যায় তা কার্যত সব সময় হয়ে ওঠে না। টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ারের সন্দেহাতীত বাসা আমাদের দলের 'গুপ্তধন' রাখার পক্ষে অনুকূল ছিল বটে, কিন্তু গুপ্তধন ত পাওয়া চাই। রিভলভার পিস্তল কার্তুজ ও বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্র যোগাড় ত করা চাই। বিশ্বাসী জানা লোকের বাড়ি যোগাড় করার মধ্যে কোন রোমান্স নেই। নেই কোন বিপদের আশংকা। হয় তিনি রাজী হবেন, না হয় প্রস্তাব প্রত্যাখান করবেন। এতে আশংকা নেই বল্লেই চলে। তবে যদি পাত্র মনোনয়নের সময় ভুল হয়—অর্থাৎ একজন পুলিশ বন্ধুভাব দেখিয়ে তাঁর বাসায় বা হেপাজতে অস্ত্রশস্ত্র মজুদ রাখার প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে তবে সিংহের গহ্বরে ছাগ শিশুর নিবাস বলে তাকে ধরে নেওয়া যায়। এরকম ফাঁদ এড়াবার রাস্তাও আমাদের চিন্তা করে বার করতে হয়েছিল। যথা, সহৃদয় বন্ধুটিকে নিয়ম অনুযায়ী কখনও বুঝতেই দিতাম না, যে তঁাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না। তাকে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি তা প্রতি পদে পদে বুঝাতাম। তারপর অতি বিশ্বাসী লোকের কাছে যেন একেবারে অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমাদের গুপ্তধন রাখছি। প্রথম প্রথম অস্ত্র মজুদ রাখার বাড়ি-গুলিকে এমনিভাবে পরীক্ষা করতাম। তারপর বিভিন্ন পরীক্ষার পর যখন বুঝতাম সে পুলিশের লোক নয়—অস্ত্র নিয়ে আসতে যেতে কোন বিপদই ঘটেনি তখন সেরূপ গুপ্ত স্থানটিকে আমরা বিপদমুক্ত বলে গণ্য করেছি। এই সব প্রাথমিক নিয়ম খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতাম।

আমি যখন আমাদের বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হানিফদার সঙ্গে সোফিয়ার স্বামীর বাড়ি যাব বলে ঠিক করছিলাম তখনই আমি সংবাদ পেলাম বিকেলে আমাকে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাদের দলের একটি ছেলে এসে আমাকে এই খবর দিয়েছিল। কাজেই সোফিয়ার স্বামীর বাড়ি যাওয়ায় প্ল্যানটি স্থির হয়নি। আমি মাষ্টারদের সঙ্গে দেখা করি। কেন ডেকেছিলেন তা আর এখন মনে নেই। মাষ্টারদা সঙ্গে দেখা করে শহরের প্রধান রাস্তা, আন্দারকিল্লা রোড ধরে ফিরছিলাম। তখন রাত্রি নটা বেজেছে। স্বদেশী স্টোর্সের কাছে দেখলাম রাজেন দাস অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা করছে। এই প্রধান রাস্তা থেকে আরেকটি রাস্তা টেরিবাজার গেছে।

দুটি রাস্তার সংযোগ স্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। 'রাজেন দাসকে সেখানে অত ব্যস্ত হয়ে ঘুরতে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—হয়েছে কি? আপনি এত ব্যস্ত কেন? রাজেন আমাকে জানালো স্বদেশী স্টোর্সে যে দুটি ভোজালী আছে তা সরাতে চাই। বড় রাস্তার ওপর পুলিস ফাঁড়ির সামনে এই দোকানটির তালা খুলে ঢুকতে হবে। কোন চাবিই লাগছে না। আমি অবলীলাক্রমে বললাম—সে ক্ষেত্রে ভেঙ্গে ঢুকতে হবে। রাজেনের তালা ভাঙ্গার ব্যাপার জানা ছিল না। এ ক্ষেত্রে মাত্র একটি লোহার রডের প্রয়োজন। টেরিবাজারে লোহার দোকান খুব কাছেই ছিল। তক্ষুনি আঠার ইঞ্চি লম্বা একটি লোহার রড কিনে কামারশালায় গিয়ে একটা দিক পিটিয়ে চোখা করে নিলাম। দুটি মোমবাতি ও ম্যাচ বাক্স কিনলাম। আমার বন্ধুকে বললাম, সোজা গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে লোহার দুটি বাড়ের তালা খুলতে হবে, তারপর দোকান খুলে তোমায় ভিতরে গিয়ে আলমারী থেকে ভোজালী দুটি আনতে হবে। আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তার একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখে আমি বলেছিলাম—ভয় বা ভাবনার কি আছে? এই বড় রাস্তার ওপর আমাদের দোকান খুলতে যারাই দেখবে তারা আমাদের দোকানের লোকই মনে করবে। চুরি করার কথা আমাদের ভুলতে হবে। দোকানের লোক দোকান খুলেছে, এমন ভাবটি সব সময় বজায় রাখতে হবে।

আমরা দু'জনেই দোকানের বারান্দায় উঠলাম। আমি প্রাথমিক কাজ শুরু করি—অর্থাৎ লোহার রড ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে তালা ভাঙ্গার কাজটি শেষ করি। প্রকাশ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার বন্ধু আমাকে আলো দেখাচ্ছিল। দুটি লোহার বার যা কোনাকুনি ভাবে দরজার উপর ছিল তা সরিয়ে ফেলা হল। রাজেন জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে দোকানের ভিতর ঢুকলো। মিনিট দুইয়ের মধ্যে ভোজালী দুটি আলমারী থেকে বার করে প্রথমটি আমাকে দিল ও পরেরটা সে নিজে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি অর্থাৎ রাস্তার লোক বা ফাঁড়ির পুলিশ বা দোকানের মালিক পক্ষের কেউই আমাদের সন্দেহ করেনি বা কেউই হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি করেনি।

আমরা চাদর ঢাকা দিয়ে ভোজালী দুটি নিয়ে সোজা নির্মলদার বাড়ি গেলাম। নির্মলদা ভাগ্যিস বাড়ি ছিলেন! না থাকতেও পারতেন। পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এরূপ অ্যাকসন রীতিবিরুদ্ধ। যা করা আমাদের উচিত

হয়নি। তবু একটি অ্যাডভেঞ্চার ত - তাই আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। বিপ্লবী দলে এই অপরাধের ক্ষমা ছিল না। তবু আমরা ক্ষমা পেয়েছিলাম। তার একমাত্র কারণ হোল এই দুটি ভোজালীর ওপর আমাদের সবার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এমনকি মাষ্টারদাও মত প্রকাশ করেছিলেন যে, সতীশ নাগদের স্বদেশী স্টোর্সে ভোজালী রেখে বিপ্লবীপনা না দেখালেও চলবে। তারা ত তার কখনও বিপ্লব করবে না তবে দোকানের শোভাবর্ধন বা যুবকদের মিথ্যে বিভ্রান্ত করার সুযোগ তাদের থাকা উচিত নয়। কোন বিভ্রাট ছাড়া ভোজালী দুটি নিয়ে আসা হয়েছে শুনে পরিকল্পনাবিহীন অ্যাকসনের অপরাধের গুরুত্ব ততখানি ধরেননি। বড় রাস্তার উপর পুলিশ ফাঁড়ির একেবারে কাছে ঐরূপ অ্যাকসন না করা উচিত ছিল সবাই একবাক্যে সমালোচনা করেছিল। যদিও অ্যাকসনের সমর্থনে আমার বলার ছিল। তবু আমি পরিকল্পনা ছাড়া অ্যাকশনের বিপক্ষে আমার মত রাখি ও নিজের দোষ বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি।

যদিও এই একটি অতি ক্ষুদ্র অ্যাকসন তবু জীবনে এইটি হোল আমার সফল বৈপ্লবিক কাজ। মনে হয়েছিল যদি সোফিয়া তার বাপের বাড়ি থাকত তবে দুটি ভোজালী নিয়ে আসতাম। সোফিয়াদের বাড়িতেই মজুদ করা হোত। ছোট অ্যাড্‌ভেঞ্চার, কেউ জানে না। তাই আপন জনের কাজ থেকে প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাদের খুব জানাতে ইচ্ছে হোত। গোপন কাজের সফলতার প্রশংসা পাওয়ার তীব্র ইচ্ছাও বিপ্লবী যুবকদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। নামের মোহ ছাড়া কাজ করে যাব—কত ভেবেছি। তবু নামের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি কাম, মোহ পরিত্যাগ করে চলব—কত ভেবেছি। তবু কঠিন, সাধনার মধ্যেও কোন দুর্বল মুহূর্তে নিজের অজান্তে সোফিয়াও দেখা দেয়।

আমার অধুনা বিপ্লবী সাথীরা আমাকে হুঁশিয়ার করেছে যে জীবনে সোফিয়ার মত ঘটনা আপনি লিখবেন না। 'শত্রুরা এতে আপনার নামে কুৎসা রটাতে সুবিধা পাবে। আপনার যে ভাবমূর্তি বাংলার তরুণদের মনে আছে তা শিথিল হবে। আমাদের বন্ধুদের সেরূপ 'যুক্তি মেনে নিয়ে সেদিনও আমি গোপন রাখতে পারিনি ১৯৩০ সালে পুলিশের কাছে আমার ধরা দেওয়ার প্রকৃত কারণটি। আমার প্রতি মানুষের মিথ্যা একটা ইমেজ (ভাবমূর্তি) থাকত তা আমি চাই না। আমি মিথ্যা আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতে চাই না। তাই আমি নিজের দুর্বলতাও বলতে চাই—নিজের সমালোচনা চাই।

স্বদেশী স্টোর্স।

জিনিস সব স্বদেশী। বাবুরা স্বদেশী অর্থাৎ কেউ কেউ অন্তরীণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেবল একজন জেল ফেরতা—গিরিজাশংকর। আমাদের মধ্যে তাঁর পরিচয় শংকরদা। অন্যান্য যুবকরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রতাপ রক্ষিত, সতীশ নাগ প্রমুখ সবাই খুবই জনপ্রিয় যুবক। তাঁদের প্রশংসা সবাই করত, আমরাও করতাম। তবে খুব ভালভাবে বুঝতাম যে, তাঁদের দৌড় গান্ধীজি আন্দোলন পর্যন্ত—একেবারে নিরামিষাশী, ভুলেও হিংসাত্মক ভয়ংকর রক্তাক্ত বিপ্লবের চিন্তাও করবে না। তাই সে সব স্বদেশীবাবুর স্বদেশপ্রেম, অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত নিবদ্ধ ছিল। এইরূপ সীমারেখার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার যুদ্ধ কখনও ভাবি নি। চরম সংগ্রাম, চরম আত্মত্যাগ ছাড়া যে কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে, তা আমরা মন থেকে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। অবাস্তব স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিনি। মনে হতে পারে, অসহযোগ ও অহিংসার পথে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এল ত? ইতিহাসকে অস্বীকার করে বা ঐতিহাসিক তথ্যকে নিছক বাদ দিয়ে, স্বাধীনতা লাভ করেছি বলা যায় বটে কিন্তু তা সুপরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মিথ্যা প্রচার।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে কি করে আমরা সিপাহী বিদ্রোহকে বাদ দিতে পারি? কি করেই বা বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনকে হিসেবের বাইরে রাখা যায়—বাঙলার শহীদদের রক্ত দান কি দেশ কখনও ভুলতে পারে? এতগুলি ও এত ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ কি নিষ্ফল গেছে! নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সশস্ত্র অভিযান কি হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লেখা হয়নি? ব্যাপক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কি নিছক শান্ত-অহিংস আন্দোলন? নিরস্ত্র শান্ত জনসাধারণ কি বুক পেতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গিন ও বুলেটের বিরুদ্ধে সর্ব উপায়ে যুদ্ধ করতে করতে বীরের

মৃত্যু বরণ করেনি ? ভারতীয় নাবিকের রণপোত কি বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি ? অহিংসারই জয় আর হিংসার পথে আমাদের পরাজয়—এইকি ভেবে নিতে হবে ? সেই দিন এত সব ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ মারফৎ স্বদেশী স্টোর্সের বাবুদের মাহাত্ম্য বুঝতে চাইনি। তবে তাঁরা যে অতি সাধু ব্যক্তি, অতি অবিপ্লবী হয়েছেন, তা তাঁদের কথাবার্তায়, হাবভাবে, ব্যবহারে খুব ভালভাবে প্রকাশ পেত। সব চাইতে খারাপ লাগত যখন তাঁরা তাঁদের বৈপ্লবিক দৈন্যতা ঢাকবার জন্য স্বদেশী-গিরির বড়াই করার বিশেষ চেষ্টা করতেন। এই স্টোর্সের প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী স্টোর্সই হবে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি, কার্যালয়। ভাবটা হোল সেইজন্য যেন নেপাল থেকে ভোজালি আমদানি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যে যা ভাবুক না কেন, তাঁরাই গান্ধীপন্থী ভোজালি মার্কা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী।

পুলিশ কিন্তু স্বদেশী স্টোর্সের উপর যথেষ্ট কড়া নজর রাখত কারণ গান্ধীপন্থী হয়েও ভোজালি মার্কা স্টোর্স। তাঁদের দোকানে এই ধরনের চুরির হদিশ করতে গিয়ে তাদের চোখে পড়ল চোর আর কিছুই নিল না—নিয়েছে মাত্র দুটি ভোজালি। ভোজালি বিক্রি করে কটি টাকা পাবে ? আর বিশেষ গবেষণা না করেই সহজে ধরে নিয়েছিল কোন্ চোরের ঐ দুটি ভোজালিরই বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে ? তাঁরা বেশ হিসেব করে বুঝেছিলেন, যে সব যুবক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে তারাই এরূপ হটকারিতায় লিপ্ত হতে পারে। আর সেরূপ যুবক আছে মাস্টার সূর্যসেনের দলে। যা হউক না কেন তারা পুলিশের কাছে ডাইরী করলেন—তাদের দোকান থেকে সন্ধ্যের সময় বড রাস্তার উপরে দুটি বড় তালা ভেঙ্গে লোহার বার দুটি সরিয়ে দোকানে ঢুকে আলমারি খুলে মাত্র ভোজালি দুটি চুরি করেছে—অন্য কোন জিনিসই তাদের প্রয়োজন ছিল না। এরূপ চোর বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়ে এরূপ চুরি করতে পারে না। কাজেই পুলিশ ধরে নিল ঐ চুরির পেছনে কারা থাকতে পারে ? অধিকমাত্রা বিপ্লবী দলের সভ্যদেরই যে এই কাজ, তাতে পুলিশের কাছে আর কোন সন্দেহ ছিল না। যদিও চুরি করার পর আমাদের বাজিমাৎ হয়েছে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পুলিশ সেরূপ ভাবতে পারেনি। তাদের একটানা গবেষণা চলেছিল। পুলিশ যে এই নিয়ে সত্য তথ্য আবিষ্কার করতে গবেষণা করছে বা তাদের সেরূপ গবেষণা না করে নিস্তার ছিল না, তা আমরা ভাবি নি। এই হচ্ছে সরকারী পুলিশ ও পদস্থ কর্মচারীদের সম্ভাব্য দায়িত্ব জ্ঞান যেরূপ দায়িত্ব জ্ঞান বিপ্লবী দলের মধ্যে সাধারণত থাকত না। এরূপ ঔদাসীন্য বিপ্লবীদের সচরাচর ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমরা যখন এ ব্যাপারে উদাসীন পুলিশ তখন

সন্দেহভাজন যুবকদের ফর্দ প্রস্তুত করছিল। পরে যখন বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধরা পড়লাম পুলিশের কাছে, অনেক ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলাম। সব জানা জিনিসের প্রতিশেধক খুঁজেছিলাম বলে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের কার্যকলাপ সেরূপ সাবধানতার সঙ্গে তাল রেখে সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলাম।

আজকে যখন স্মৃতিচারণ করছি তখন স্বভাবতঃ মনে হচ্ছে এই সব কথা। বিশ্বনায়ক লেনিন বলেন যদি মস্কো অভ্যুত্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকত, তবে অক্টোবর বিপ্লবের কথা ভাবাই যেত না। মস্কো ইন্‌করেকসন্স একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যে পদক্ষেপ না থাকলে সফল অক্টোবর বিপ্লব আজ আর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেত না। আমাদের চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহও সফল প্রতিপন্ন হোত কি না তা কে বলতে পারে যদি স্বদেশী স্টোর্স থেকে ভোজালি উধাও হওয়ার মত বহু ঘটনার ইতিহাস এর পেছনে না থাকত। সেই হিসেবে ভোজালি অপহরণ না করে, কিনে নিলে কি ভাল হোত? কিনে নিলে যে লাভ হোত তার চাইতে অনেক বেশী লাভ হয়েছিল যেহেতু আমরা ভোজালি দুটি অপহরণ করাই শ্রেয় মনে করেছিলাম। অপহরণ করার জন্য যে সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং অপহরণ করার জন্য আমাদের যে সাহস ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়েছিল—টাকা দিলাম, আর ভোজালি দুটি ক্রয় করে নিয়ে এলাম—তাতে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন করার সুযোগ পেতাম না। জিনিসটি খুব ছোট। কাজেই বিচার করে না দেখলে বিপ্লবে এই সব ছোটখাট জিনিস উপেক্ষা ও অবহেলা করে যাওয়া হয়। আমরা সজ্ঞানে সেরূপ চেষ্টা করতাম এবং পরে পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী করে যেতাম।

আমরা ভোজালি নিয়ে এসে সিন্দুকে বন্ধ করে রেখে দিইনি। কাজে লাগাবার সুযোগ খুঁজেছিলাম। সেই সুযোগটি এলো এক সরস্বতী পুজোর রাতে। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগারে একটা ইন্‌ডাক্‌টিভ কয়েল ছিল। সেই কয়েলটির উপরে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই কয়েলটির সংবাদ আমার দাদা শ্রীনন্দলাল সিংহের কাছ থেকে পাওয়া। তিনি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছেই আমি শিখেছিলাম কয়েলের বিশেষ এক ধরনের প্রয়োগ সম্বন্ধে। কয়েল থেকে দুটি তার সংযোগ করে দূরে নিয়ে গিয়ে কিছু তফাৎ করে ধরলেও ব্যাটারী সংযোগ করার পর সুইচ টিপলে দুইটি তারের বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ বার হয়। এই বিচ্ছিন্ন স্থানটি কিছুটা কম বেশী করা যায় যদি সেই অনুপাতে ব্যাটারী সংযোগ করা হয়। দাদার কাছে যেদিন এই জিনিসটা আমি দেখলাম, সেদিন থেকে আমার মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো

ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দূর থেকে আগুন জ্বালাবো এবং সেই আগুনে দূর থেকে বোমা বা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটাবো। গোপনে ব্যাটারী রাখা, দেখতে না পাওয়ার মত করে ইলেকট্রিক তার দূরে নিয়ে যাওয়া, সেগুলি গেরিলা পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। সে শিক্ষার জ্ঞান বই পড়ে পাওয়া যায়, কিন্তু বই না পড়েই আমার চিন্তা দিয়ে অনেক কিছুই ঠিক করে নিয়েছিলাম। কয়েল ও ব্যাটারী যত বেশী শক্তিশালী হবে, ততই দূর থেকে ডিনামাইট ফাটানো সম্ভব। এইটি চিন্তা করে নিয়েই ভেবেছিলাম সরকারী কলেজে যে 'ইনডাকৃটিভ কয়েলটি' ছিল, তা পেলেই আমি আমার কাজের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করতে পারি। আর বেশী দেরী করতে ইচ্ছে করছিল না। তাই সরস্বতী পূজার রাতে কলেজের গবেষণাগার থেকে সেটিকে আমরা নিয়ে আসবো। এই উদ্দেশ্যে আমি নির্মলদা ও দাদাকে এই পরিকল্পনার কথা বললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজটা করার জন্য যে ছকটা করেছিলাম তাও জানালাম।

আমরা সঙ্গে নেব আত্মরক্ষার জন্য দুটি ভোজালি, একটি ছোট ড্যাগার। ভোজালি দুটি থাকবে আমার ও নির্মলদার সঙ্গে ছোট ড্যাগারটি দাদা রাখবে তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য। গবেষণাগারের জানলা বেশ উঁচুতে। আমি আগে সেই জানলার তালা ভেঙ্গে খিল্ খুলে দেব। তারপর দাদা ভেতরে ঢুকবেন, যেহেতু দাদাই গবেষণাগারে কয়েলটি কোথায় রাখা আছে জানতেন। দাদার সঙ্গে থাকবে একটি সাইকেলের লাইট। আর থাকবে বড় ইস্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস এবং লোহার রড—তালা ভাঙ্গার জন্য। আমাদের বাড়ি থেকে বড স্ক্রু-ড্রাইভার, লোহার রড, প্লাস নেওয়া হয়েছিল। সাইকেলের লাইটটিও—নিজেদের সাইকেলের। আমি জানলা খোলার পরে তাঁরা যখন গবেষণাগারে ঢুকবেন, তখন আমি গবেষণাগার ছেড়ে একটি রাস্তা পার হয়ে মেন-বিল্ডিংয়ের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পোজিশন নেব। আমি ডাকাতের মত গোঁফ-দাড়ি ও পরচুলা পরেছিলাম। নির্মলদা আমারই মত ছদ্মবেশে ছিলেন। আমার দাদা সাধারণ বেশেই ছিলেন, যেহেতু তাঁর কোন লোকের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আমার উপরে ভার ছিল যদি কোন লোক কলেজের সরস্বতী পূজার আসর থেকে বেরিয়ে গবেষণাগারের সামনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য এদিকে এসে পড়ে এবং সন্দেহ ক'রে চেঁচামেচি করে আমাদের ধরতে আসে তবে তাদের ঢোকার মুখেই আমি বাধা দেব। আর পেছন দিক দিয়ে যদি কেউ আসে, তবে তার দায়িত্ব নির্মলদার ওপরে। বাস্তবিক পক্ষে সেই সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে কারণ তখন রাত

প্রায় ১২টা। তবু এই রকম ছোটখাট একটি মিলিটারী প্ল্যান করে নিজেরা আনন্দ পেয়েছিলাম এবং প্রস্তুত হয়ে অ্যাকসন করতে যাই। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো।

আমি আমার কাজ করে পাহারা দেবার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কলেজের পূজোর মণ্ডপ থেকে একজন দু'জন লোক বেরিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল অত রাত্তিরে গবেষণাগারের সামনের রাস্তা দিয়ে কেউই যাতায়াত করবে না। আমার সেই ভুল ভেঙ্গে গেল। সাধারণ বেশে দু'জন লোক পূজামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল তারাও অন্যান্যদের মত সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেখি তারা হঠাৎ বাঁ দিকে মোড নিয়ে গবেষণা-গারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। এখন আমি কি করে, কি করি—ভাবছি। কিন্তু সেরকম ভাবার সময় তখন ছিল না। মন বলছে এক্ষুনি বাধা দাও নইলে আত্মসমর্পণ কর। ঐ দু'জন ইতিমধ্যে গবেষণাগারেব সামনে এসে থামলো। শোনা গেল তাদের কথা হচ্ছে—'ঔমাঁ' এত রাত্তিয় লেবরেটরীর দুয়ার খোল কেয়া? কঁন? অর্থাৎ ওমা, এত রাত্তিরে লেবরেটরীর দরজা খোলা কেন? কে?' আমি ভোজালিটি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে উপরের বারান্দা থেকে নীচে লাফিযে পডলাম। ভোজালির ফলাটি বেঁকিয়ে চওডা করে দেখালাম, যেন তারা দেখতে পায় কারণ সেই জায়গাটা খুব অন্ধকার ছিল। লাফিয়ে নামবার সময় তাদের প্রশ্ন 'কঁন'-এর উত্তরে বলেছিলাম 'হাম, তোদের যম।' এই শুনেই তারা কাঁপতে কাঁপতে এক পা দু'পা পেছনে সরে গিয়ে দু'জনে একত্র হোল। আমি যখনই বললাম 'ভাগ' তক্ষুনি তারা ঘুরে ছুট দিল। ইতিমধ্যে আমার দাদা একটানে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। দাদা ছুটছেন। আমিও ছুটলাম। নির্মলদাও আমাদের পেছনে ছুটতে শুরু করলেন। আমরা বড রাস্তা পার হয়ে সামনের দিকে দেব পাহাড়ে চলে গেলাম। পেছনে দু-একবার ফিরে তাকালাম। কেউ আসছিল না। তবু আমার ভিতরের কাঁপুনি থামেনি। নিজেদের মধ্যে দু-একটা কথা বললাম, তাও কেঁপে কেঁপে। তখন দাদার কাছে শুনলাম তিনি সাইকেলের লাইট, বড় স্ক্রু-ড্রাইভার আর প্ল্যাসটা গবেষণাগারে ফেলে এসেছেন। কাজেই এইসব সূত্র থেকে পুলিশ যদি অনুসন্ধান করে, তবে বেরিয়ে পড়বে এসব জিনিস আমাদেরই। এই ঘটনায় অনেক অভিজ্ঞতা হলো বটে, কিন্তু অনেক সমস্যাও রয়ে গেল।

দেব পাহাড় থেকে নেমে আমরা বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, বাড়ির দিকে যাব বলে। তখনও গায়ে কাঁপুনি, কথা বলতে পারছিলাম না। সামনের দিকে একটা ভিড় দেখলাম। আলো জ্বলছে। গান-বাজনা শোনা যাচ্ছে। মনে হলো সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সেখানে থিয়েটার হচ্ছে। আমরা ভাবলাম যদি পথে কেউ ধরে জিগ্যেস করে, এত রাত্রে কোত্থেকে আসছি, তবে থিয়েটার দেখে ফিরছি বলবো। সেইজন্য থিয়েটারের নাম জানা উচিত, প্রোগ্রাম জানা উচিত এবং কারা করছে তাও জানা উচিত ভেবে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেষ্টা করে দুটো প্রোগ্রাম যোগাড করলাম। নির্মলদা একটা রাখলেন অন্যটি আমরা নিলাম—যদি কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় এদিকে কোথায় এসেছিলাম, তবে সেই থিযেটারের প্রোগ্রাম অব্যর্থ প্রমাণ হিসাবে জানিয়ে দিত যে আমরা সরস্বতী পুজোয় আসগার খাঁ দীঘির পাড়ে থিয়েটার দেখছিলাম। এইসব ঠিক করে আমরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরব ঠিক করলাম। ভোজালি দুটো নির্মলদাকে দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একজনের পক্ষে দুটি ভোজালি লুকিয়ে নিযে যাওয়া অসুবিধা বলে, একটি ভোজালি আমরা সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। যখন বাড়িতে পৌঁছালাম তখন রাত দুটো।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই আমি দোকানে ছুটেছিলাম যে সব জিনিস গবেষণাগারে ফেলে এসেছি হুবহু সে রকম জিনিস কিনে বাড়িতে রাখবো বলে। কিনেও এনেছিলাম। মনে হয়েছিল যাইহোক, একটা দিক কোনমতে সামাল দেওয়া গেল।

ঘটনা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কতখানি বিচলিত তা দেখবার জন্য আমি ভাত খাবার পরে দুপুর ১১টা নাগাদ সাইকেল নিয়ে বেরোলাম। এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে কলেজেব সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে ছিল গবেষণাগার, কলেজ—সব দেখে যাব। কি আশ্চর্য। কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁ দিকে ঘাড ঘুরিয়ে কলেজেব দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না—এত ভয়—যেন আমাকে কেউ চিনে ফেলবে, যে আমিই রাত্রির ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

কি অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া। এত দুর্দমনীয় সাহসী অনন্ত সিং তার প্রথম জীবনে এই ছিল।

আমি এই যে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম (অবশ্য অন্যরা এই অভিজ্ঞতাকে বিরাট ভাববে না, তুচ্ছ বলেই মনে করবে, যদি তার জীবনে কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য না থাকে) তার জন্য আমি আমাদের বিপ্লবী যুবক বন্ধুদের ট্রেনিং

ফোর্সে কেবল পিস্তল রিভলবার দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করাই একমাত্র কাজ বলে মনে করিনি। ডন-কুস্তি মুষ্টিযুদ্ধ যুযুৎসু প্রভৃতিকেও সর্বোচ্চ স্থান দিইনি। কেবলমাত্র শরীরে খুব জোর আছে, অত্যন্ত সাহসী যুবক হলে চলবে না। নিশীথ রাত্রে কলেজের গবেষণাগারের নিকটে নির্জন পথে নিরস্ত্র দু'জন দপ্তরীকে দেখে আমাদের মত ভয় পাওয়া চলবে না। সেই রকম শিক্ষাপদ্ধতি দিয়ে বিপ্লবী যুবকদের মন তৈরী করতে হবে যেন বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সাহস না হারায় এবং ভয়ে না পালায়। যদি মনে করি শারীরিক শক্তির তেমন প্রয়োজন নেই, মুষ্টিযুদ্ধ বা জাপানী কুস্তী অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নেই, তবে কিন্তু মহাভুল হবে।

মাস্টারদা আমাকে বলেছিলেন রামমূর্তি হওয়া ও ক্ষুদিরাম হওয়া এক বস্তু নয়। শারীরিক শক্তি থাকলেই সব হয় না। শারীরিক শক্তি, ফাঁসীর দড়ি গলায় পরার জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতি। সে রকম মানসিক প্রস্তুতি আসতে পারে—যদি আমাদের চিরসাথী হয়—(১) বিপ্লবের বই, (২) বিপ্লবের চিন্তা ও (৩) বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে সব সময় মেলামেশা।

কলেজের সেই ঘটনা নিয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হলেন। তাঁরা পুলিশকে খবর দিলেন। পুলিশ যথারীতি অনুসন্ধান আরম্ভ করল, তবে পুলিশ হদিশ না করতে পারার কারণ পুলিশ বুঝতেই পারেনি আমরা কী চুরি করতে গিয়েছিলাম। ছেলেদের মধ্যে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি হল। আমাদের বিপক্ষ বিপ্লবী দল যদিও সঠিক বুঝতে পারেনি, যে এই চুরির প্রচেষ্টার পেছনে আমরা ছিলাম, তবুও তারা ভেবেছিল গবেগণাগারের জিনিসপত্র চুরি একমাত্র বিপ্লবীরা—যারা বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত করবে, তারাই করবে। সঠিক প্রমাণের অভাবে এইটি যে আমাদেরই কাজ, তা তারা ধরে নিতে পারে নি। আমাদের বিপক্ষ দল, স্বদেশী স্টোর্সে ভোজালি অপহরণ করাটা যে আমাদেরই কাজ—সে বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিল। গবেষণাগারে চুরির ঘটনায় যদি ভোজালি সম্বন্ধে কোন তথ্য থাকত, তবে পুলিশও আমাদের বিপক্ষ দল ভেবে নিত যে এটা আমাদেরই কাজ। কিছুদিন আমরা দম নিলাম। তারপর মাষ্টারদাকে আমি আমাদের দুর্বলতার কথা বলেছিলাম। কতখানি স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলে পরে আমাদের ভিতরে সেইরূপ কাঁপুনি ও চব্বিশ ঘণ্টা পরেও কলেজের দিকে তাকাতে না পারা। তারপর আমি আমার বক্তব্য রাখি যে, আমাদের সংগঠনের মধ্যে সাহস বাড়াবার জন্য বাস্তবিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বললাম বেছে বেছে আমাদের দলের সভ্যদের পরীক্ষা করে দেখা উচিত, কারণ তাদের অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাও হবে।

আমাদের মধ্যে রাজেন দাস সবাইকে সমালোচনা করতেন এবং আমরা যে কেউ কোন কিছু করব না'—সেই কথা বলে সবাইকে তিরস্কার করতেন। তিনি মাষ্টারদা, অম্বিকাদা প্রমুখকে বলতেন—তোদের গুজ-গুজানি, ফুসফুসানি আর ভাল লাগে না। বিপ্লব, বিপ্লব অনেক বলেছিস, কিন্তু কাজের নামে অষ্টরম্ভা। এই সব বলে কেবল ছেলেদের মাথাই খাওয়া হচ্ছে।'

প্রথম প্রথম সবাই তাঁর কথা শুনত, তারা ভেবে নিত, সেইই চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে প্রধান বিপ্লবী নেতা। আমরা যারা তাঁর সম্বন্ধে জানতাম, তাঁর কথা শুনে মনে মনে হাসতাম। এই রাজেন দাস কলকাতায় সন্তোষদার (সন্তোষ মিত্র, হিজলী বন্দীশালায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন) দলে থেকে কাজ করেছেন। তাঁরা তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে খুব খুশী ছিলেন না। একবার তাঁদের সঙ্গে রাজেন দাস কোন একটি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করতে যান। কিন্তু স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। আরও দু'বার রাজেন দাস তাঁর দুর্বলতা দেখিয়েছেন। তাই তাঁরা তার মুখের বড়াই শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন না। রাজেন দাসের এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী যে আমাদের জানা ছিল, তা তিনি জানতেন না। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের মাঠে তিনি একলা খেলোয়াড়। সেহেতু বিপ্লবের নামে বড়াই করা এবং অন্যকে অনায়াসে তিরস্কার করে যাওয়া তাঁর পক্ষে খুব যেন সোজা ব্যাপার। বিশেষ করে এই কারণেই সাহস পরীক্ষা করার জন্য রাজেন দাসকেই প্রথম বেছে নিয়েছিলেন। প্ল্যান ছাড়া ত বিশেষ ধরনের সাহসের পরীক্ষা করা যাবে না। সেজন্য ছকটি এইভাবে প্রস্তুত করি। রাজেন দাস আমাকে ডাকতে যাবে মাঠের ওপর দিয়ে একটি পায়ে-চলা শর্টকার্ট রাস্তা ধরে। এই রাস্তার ওপর সন্ধ্যে ৮।৮-৩০টার সময় এক গুণ্ডার বেশে আমি বসে থাকব তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ভয় দেখাবার জন্য। আমার পরণে থাকবে লুঙ্গি, শার্ট, শার্টের হাতা গোটান, ওপরে একটি কাল ওয়েস্ট কোট। মুখে কৃত্রিম গোঁফ-দাড়ি, মাথায় টুপি। আবছা অন্ধকারের রাতে আমার অতিপরিচিত লোকেরও আমাকে চেনার উপায় ছিল না। অম্বিকাদা রাজেন দাসের সঙ্গে ন্যাশানাল স্কুলের মাঠে এসে রাজেন দাসকে বললেন—তুমি গিয়ে অনন্তকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এস। বল খুব দরকারী কথা আছে। সে এলে পরামর্শ করে ঠিক করব সতীদাকে বলব কি-না। এই স্কুলেরই কয়েকটা ঘর নিয়ে সতীদারা থাকতেন,

কারণ স্ট্রাইক-হওয়ার পর স্কুল বাড়িটা খালিই পড়েছিল। আমরা মাঠে খেলতাম আর কয়েকটা ঘরে ব্যায়াম করতাম।

আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি মাঠে পথচলা রাস্তার ওপরে বসে রইলাম। অদূরে দেখতে পেলাম রাজেনদা খুব খোস মেজাজে তুড়ি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। আমার সেই বিকট চেহারা দেখে তাঁর গান থেমে গেল, গতিও মন্থর হয়ে এল। তারপর দেখি তিনি আর এগোচ্ছেন না। অগত্যা আমিই কয়েক পা এগিয়ে যাবার ভঙ্গিতে তাঁকে স্পর্শ করলাম, তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ধড়াস করে পড়ে গেলেন। সেই নির্জন মাঠে সাড়ে ৮ টার সময় এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ রাজেন দাসের এই দুরবস্থা দেখে আমি নিঃশব্দে হাসতে হাসতে দৌড় দিলাম। যেতে যেতে বাঁ হাত দিয়ে এক টানে ওয়েস্ট কোট ও লুঙ্গি খুলে ফেললাম আর ডান হাত দিয়ে দাড়ি, গোঁফ, মাথার টুপী খুলে নিয়ে সব একসঙ্গে সুকুমারদের বাড়ির কম্পাউণ্ডের ভিতরে ছুঁড়ে ফেললাম। এই স্থান থেকে স্কুলের মাঠটি ২০০ গজের মধ্যে। আমি ভদ্রলোক সেজে অম্বিকাদার কাছে এসে হাজির হলাম। অম্বিকাদা যখন আমার ঘটনার ইতিবৃত্তান্ত শুনলেন, তখন হেসেই খুন। রাজেনদা অম্বিকাদাকে নানাভাবে সমালোচনা করতেন। তাই রাজেন দাসের বীরত্বের এই নজিরটি পেয়ে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম রাজেন দাস, আমার দাদা, আমাদের বাড়ির চাকর লাঠি হ্যারিকেন নিয়ে উপস্থিত। অম্বিকাদা ওদের দেখে আগে থেকেই হাসতে শুরু করেছেন। আমি চিমটি কেটে, চোখ টিপে অম্বিকাদাকে হাসতে বারণ করছি পাছে রাজেনদা বুঝতে পারেন যে, আমরাই এই ফন্দি এঁটেছিলাম তাঁর সাহস পরীক্ষা করার জন্য। আমি খুব গম্ভীর হয়ে অবাক হবার ভান করে ওদের জিগ্যেস করলাম, 'কি হয়েছে কি ? তোমাদের হাতে লাঠি, হ্যারিকেন দেখছি, সঙ্গে আবার রামকে (বাড়ীর চাকর) দেখছি।' দাদাই উত্তর দিলেন—'মাঠে গুণ্ডারা রাজেনদাকে আক্রমণ করেছিল।' তারপর রাজেনদা বলতে লাগলেন—'মাঠের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় গুণ্ডারা আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করল। টাল সামলাতে না পেরে আমি পড়ে গেলাম। আমার পেছনের হাড়ে খুব চোট লেগেছে।' এইটুকু শুনেই অম্বিকাদা আবার হাসলেন। রাজেন দাস বিরক্ত হয়ে বলল—'হাসছিস কেন ? দেখ না কতখানি ফুলে গেছে, ভীষণ ব্যথা করছে। আমি রাজেনদার বিভ্রান্তি বজায় রাখার জন্য খুব গম্ভীরভাবে বলতে লাগলাম—

"'অম্বিকাদা এই ঘটনাকে খুব হাল্কাভাবে নিলে চলবে না। পাড়ার মধ্যে কোন গুণ্ডা রাজেনদাকে মারতে আসবে ? রাজেনদা কখন তাদের লক্ষ্য হতে পারে না। তাবা আমাকেই মারতে এসেছিল। আমি যে এই পথেই রোজ বাড়িতে ফিরি তা অনেকেই জানেন না। কাজেই গুণ্ডারা আমাকে মারবে বলে ঐ জায়গাটা বেছে নিয়েছিল। আমাকে মারাটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু পাড়ার মধ্যে যে এই গুণ্ডামী করে গেল, তাব একটা বিহিত কবতেই হবে।' এতক্ষণে অম্বিকাদা বুঝতে পেরেছিলেন, যে আমি এই ব্যাপাবটা রাজেনদার কাছে লুকোতে চাইছি। অম্বিকাদাও নিজেকে সংযত করলেন। রাত প্রায় ১০টার সময় আমবা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে চলে গেলাম।

পবের দিন এই ব্যাপাবটা মাষ্টারদাকে জানালাম এবং বললাম আমাদের সংগঠনে এই রকম আরও অনেক ট্রেনিং হওয়া দরকার। মাষ্টাবদা অনুমোদন করলেন। ঠিক করলাম আমারই সহপাঠী নবীনের এই রকম একটা পরীক্ষা হওয়া উচিত। নবীন শারীরিক গঠনে প্রায় আমাবই মত। 'বেশ স্মার্ট ও বলিষ্ঠ। কথা হচ্ছে আমারই সমসাময়িক সহপাঠী বলিষ্ঠ যুবকের পরীক্ষা আমি একা নেব। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে কাজটি অত সহজ নয়। সবাই জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে, তা নাও হতে পারে। প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়াই যে এক হবে তা ভেবে নেওয়ার কোন কারণ ছিল না। নবীন হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে প্রতি আক্রমণ যে করবে না, তাব কোন গ্যারাণ্টি ছিল না। সেইজন্য পরীক্ষকের শারীরিক শক্তি ও যুযুৎসু প্রভৃতি ভাল জানা দরকার। আমার খুব ভাল জানা ছিল কিনা জানি না তবে, আত্মবিশ্বাস ছিল, যে নবীনের যে কোন প্রতিআক্রমণ আমি রোধ করতে পারবো। বোধ করার অর্থ এই নয়, যে তাকে আমি মেবে ফেলবো বা সাংঘাতিক ভাবে জখম করব। তাকে অক্ষত রেখে, তার হঠাৎ আক্রমণকে বাধা দিতেই হবে। সেইরূপ মানসিক প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এইরূপ একটি পরীক্ষা নবীনের উপব চালাবার জন্য স্থির করি।

রাজেন দাসেব পরীক্ষা অনুযায়ী অম্বিকাদা নবীনকেও আমায় ডেকে আনার জন্য সেই মাঠের পথে পাঠালেন। এখানে একটু বলি, আমাব দাদা এই পরীক্ষার কথা আগে থেকে জানতেন। নির্জন মাঠ, রাত প্রায় ৮-৩০টা। আমি আগের মত সেই ডাকাতের বেশে ওৎ পেতে বসে আছি পায়ে হাঁটা রাস্তার উপরে। নবীন বেপরোয়া ভাবে যথাসময়ে এই নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে আসছিল। এই নির্জন পথে অস্বাভাবিক ভাবে আমাকে বসে থাকতে দেখে সে একটুখানি থমকে

গেল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব তখন মাত্র কয়েক হাতের। আমার সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সে চিনতে পারে নি যে আমি তারই সহপাঠী অনন্ত সিং তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছি। যেমনি দাঁড়ানো, তেমনি আমি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তার ডান বুকে ছোট একটা ঘুসি মারলাম। সে আমাকে ঘুসি মারতে দেখেই প্রাণের ভয়ে তারস্বরে চট্টগ্রামের ভাষায় চেঁচাতে লাগলো 'উজা, উজা', মানে 'এসো এসো'। সেই রকম ভাবে হঠাৎ যে সে চিৎকার করবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। এই চিৎকার এক মহাসমস্যার সৃষ্টি করলো। এই মাঠের তিন ধারে লোকের বাড়ির পেছন দিকটায় এই মাঠটি। ভেবেছিলাম বাড়ির লোকেরা ছুটে আসবে। পালাবার রাস্তাটি আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। অবশ্য রাস্তা বলতে একটিই ছিল, সেখান দিয়ে আমি ছুটলাম। সুকুমারের বাড়ির কোণা পর্যন্ত আসার পথে আমি আমার কালো ওয়েস্ট কোটটি ও গোঁফ-দাড়ি-টুপী সব খুলে ফেললাম এবং ওদের কম্পাউণ্ডের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর আবার ঘুরে মাঠের দিকে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ যেন আমি 'উজা, উজা' ডাক শুনতে পেয়েছি এমন ভাব করে চেচিয়ে বলতে লাগলাম—'কে কে, কি হয়েছে।' এগিয়ে দেখলাম নবীন। বললাম—'নবীন, কি হয়েছে?' অকস্মাৎ আমার আবির্ভাব দেখে নবীনের মনে কেমন একটা খটকা হয়েছিল। কিন্তু আমার অভিনয় দেখে তার খটকা কেটে গেল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল 'গুণ্ডারা আমাকে একা পেয়ে আক্রমণ করে, আর ঘুসি মারে। আমি চেচিয়ে উঠলাম বলে তারা পালালো।' 'তোমার টাকা পয়সা কিছু নিয়ে যায় নি তো?' সেই রকম উদ্দেশ্য তাদের ছিল বলে মনে হয় না। আমাকে মারাটাই বোধ হয় তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।' আমি বিজ্ঞের মত একটা বড় রকমের 'হুঁ' বললাম। তারপরে তাকে জিগ্যেস করলাম—'গুণ্ডারা কয়জন ছিল।' সে অবলীলাক্রমে বলল—'তিনজন।' 'কোন্ দিকে গেছে?'—জিগ্যেস করতে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণটি। ইতিমধ্যে মাঠের তিন দিক থেকে লাঠি ও বাতি হাতে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এলো। সবাই আমার পরিচিত। সবাই এক-সঙ্গে জিগ্যেস করতে লাগলো—'ব্যাপারখানা কি? কি ঘটেছে?' আমি তাদের সংক্ষিপ্ত ভাবে ঘটনাটি বললাম। আরও বললাম—টাকাপয়সা নেওয়ার কোন চেষ্টাই করল না, কেবল মারার উদ্দেশ্যেই মারলো—এতে আমার মনে হয়, নবীন তাদের লক্ষ্য ছিল না, আমাকেই হয়ত মারতে এসেছিল। ভুল করে নবীনকেই মেরে গেল।' পাড়ায় এরকম গুণ্ডামী সহ্য করা যাবে না। আমাদের সজাগ

থাকতে হবে। আজকে না হয় নবীন হলো, কে জানে আরেক দিন আর কে এ রকম ভাবে মার খাবে।' ধীরে ধীরে সবাই চলে গেল। নবীন আমাকে বলল— 'তোকে অম্বিকাদা ডাকছে।'

আমরা দু'জন অম্বিকাদার কাছে গেলাম এবং তাঁকে সব খুলে বললাম নবীনের কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখি। পরদিন মাষ্টারদার কাছে সব বলে একটু আলোচনাও করলাম। আমি বললাম—'দেখুন, কত প্রকৃতির লোক আছে। রাজেনদা গুণ্ডাকে' নির্জন স্থানে দেখে ভয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন, আবার নবীনের সম্পূর্ণ উল্টো প্রতিক্রিয়া। 'গুণ্ডা' তাকে মারতে যাচ্ছে দেখে সে প্রাণপণে চিৎকার করে লোক ডাকতে লাগলো। অন্য প্রকৃতিরও লোক থাকা সম্ভব, যে হয়ত উল্টে মারতে আসবে। সেইহেতু এই ধরনের শিক্ষা যে দেবে, তার কিন্তু আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া উচিত।' যাই হোক না কেন সংগঠনের মধ্যে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন থাকা কর্তব্য।' 'তোমরা কর' বলে ছেড়ে দিলে হবে না। যে ট্রেনিং দেবে, তাকেও আমাদেরই শেখাতে হবে এবং এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' মাস্টারদা আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন এবং এইরূপ ট্রেনিং যে প্রযোজন, তা স্বীকার করলেন এবং বললেন—'কিন্তু উল্টে মারবে এমন ছেলে কে আছে? আর যদি কেউ আছে ধরে নি তবে সে রকম বিপ্লবী যুবককে আমাদের মধ্যে শিক্ষা দিতে পারে এমন কে আছে?' মাস্টারদা আলোচনার মাধ্যমে আমাকে অন্তত বোঝালেন যে দলে সংগঠকদের যে উপযুক্ততা থাকা উচিত, তা আমাদেব মধ্যে নেই। তাঁর নিজের এই ধরনের শারীরিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা যে নেই, তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন। কি করে তাঁর পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধ, জাপানী কুস্তি প্রভৃতি শেখা যায় সেরূপ একটি পারকল্পনা যেন আমি তাঁর জন্য ঠিক করি। তাও বললেন। আমি অবশ্য তাঁর উপযুক্ত একটি ট্রেনিং কোর্স তৈরি করেছিলাম এবং কিছুটা কাজ চালাবাব মত তাঁকে শিখিয়েছিলাম।

আমি ও গণেশ, মাস্টারদাকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলাম। মজার কথা হলো চট্টগ্রামের পাহাডী রাস্তাগুলো নীচে থেকে উপরে ওঠে, আবার উপর থেকে নীচে নামে। প্রায় রাস্তা সেরকম। মাস্টারদা সে রকম রাস্তার মুখে এসে যখন পডতেন তখন সাইকেল চালিয়ে নিজে উপরে উঠতে পারতেন না। সেই সময় গণেশ বা আমি ঠেলে ঠেলে তাঁর সাইকেলের সঙ্গে দৌড়তাম। এই করতে করতে তাঁর পায়ের জোরটাও বাড়লো। তারপর নিজেই প্যাডেল করে উপরে উঠতে

পারতেন। মাস্টারদা তাঁর শক্তির সীমারেখা যে কী তা বুঝতেন। তাঁর ছোট বন্ধুদের কাছে তিনি সেটা গোপন রাখতেন না। আমাদের তুলনায় এই ছিল মাস্টারদার বৈশিষ্ট্য।

বাস্তব সামরিক শিক্ষা বলতে আমরা কেবল বন্দুক, পিস্তল নিয়ে শিক্ষা দেওয়াটাই মনে করতাম না। আর দলের সভ্যদের সাহসী করে তোলার জন্য সহজ শিক্ষা—যাও অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসো কিংবা অমাবস্যার রাতে শ্মশানে লাঠি পুঁতে এসো প্রভৃতি প্রচলিত শিক্ষা আমাদের সংগঠনের প্রয়োজন মেটাতো না। অমাবস্যার রাতে শ্মশানে যাওয়ার সাহস আর বড় রাস্তার উপরে স্বদেশী স্টোর্সের দরজা ভাঙ্গা, কলেজের গবেষণাগারের সামনে হঠাৎ দপ্তরীর কাছে বাধা পাওয়ার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সাহস প্রয়োজন, সে সাহস ভূত-প্রেত উপেক্ষা করে চলার সাহস এক নয়। সেই কারণে আমাদের সংগঠনে আমরা অন্য প্রকারে ট্রেনিং দিতাম, যার বর্ণনা আগে দিয়েছি। বুঝেছিলাম যে মানুষকে ভোজালি বা ছুরি বা রিভলবার নিয়ে ভয় দেখিয়ে কিছু অপহরণ করা খুব সহজ নয়। তার জন্য বাস্তব অনুশীলন প্রয়োজন। সেইজন্য প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা আমাদের মধ্যে যুবকদের বেছে নিয়ে দু'জনকে এক নির্জন রাস্তায় পাঠাবো কোন একজন পথিককে ভয় দেখিয়ে কিছু ছিনতাই করার সাহস অর্জন করার জন্য নবীন ও নারায়ণ দাসকে ছোট ছোট দুটি ড্যাগার দিয়ে বললাম, তারা যেন চট্টেশ্বরী কালীবাড়ীর নির্জন পথে সন্ধ্যে ৮টার সময় কোন একজন পথিকের অপেক্ষায় থাকে। যখন কোন এক পথিককে ফিরতে দেখবে তখন দু'জনে মিলে ড্যাগার খুলে ভয় দেখিয়ে সেই পথিকের কাছ থেকে ম'নিব্যাগ প্রভৃতি ছিনতাই কিংবা ছিনতাই করার ভান করবে।

দু'জন বলিষ্ঠ যুবক নির্জন পথে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনতাই করবে সেটি আবার সাহসের বস্তু কি হতে পারে। অনভিজ্ঞ লোকের কাছে তাই মনে হবে। আমারও তাই মনে হোত, যদি না আমার নিজ অভিজ্ঞতা না থাকত—স্বদেশী স্টোর্সে তালা ভাঙ্গার সময় বুকের মধ্যে যে কাঁপুনি অনুভব করেছিলাম, আমার মনে সেরূপ চিন্তাই হোত—এ আবার সাহসের কী পরীক্ষা যে, দু'জনে একাকী একটি পথিককে নির্জন রাস্তায় ধরে ছিনতাই করবে? কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। দু'জন দফতরীর খালি হাতে আকস্মিক ভাবে নির্জন রাতে কলেজ গবেষণাগারের সামনে আবির্ভাব আমাকে ও আমাদের তিনজনকে কতখানি বিচলিত করে তুলেছিল, তা আমার সব সময় মনে হোতো বলেই এইভাবে ছিনতাই করার

মহড়া যে একটি খুবই বাস্তব শিক্ষার বিষয়—তাতে কোন ভুল নেই। নবীন ও নারায়ণকে সমস্ত বুঝিয়ে এবং তাদের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। তাদের চট্টেশ্বরী কালীবাড়ীর পেছনের রাস্তায় পাঠানো হলো।' ওদের পাঠিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হলো না। কলেজে পড়ে ভদ্রলোকের ছেলে জীবনে কখন ভাবেনি যে ছিনতাই করবে। তার যদি ছিনতাই করতে যেতে হয়, তবে তার কারণ যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। যুক্তি দিয়েই তাদের বুঝিয়েছিলাম, তারা বাস্তবে ছিনতাই করতে যাচ্ছে না। এইটি হবে তাদের একটি মহড়া মাত্র। এই মহড়ার সময় যদি কোন কারণে কোন একটি তেমন পথিকের কাছে তারা পড়ে যে, ধরা পড়ার আশংকা আছে, তবে তা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোক, পাড়া প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের কাছে কী বলে তারা মুখ দেখাবে। এইরূপ ছিনতাইয়ের কী বা অজুহাত দেবে। সেই কারণে এই ট্রেনিংয়ের প্ল্যানের গুরুত্ব আমাদের অনুভব করতে বাধ্য করেছিল যে কোন মতেই তারা যেন ধরা না পড়ে এবং তার জন্য আমরা যেন সব রকম ব্যবস্থা রাখি।

আমি একটি খাঁকি ফুলপ্যান্ট, খাকি শার্ট, মাথায় একটা হ্যাট পরলাম। সঙ্গে নিলাম একটি রিভলবার। নির্মলদাও খাঁকি হাফপ্যান্ট, সাদা শার্ট ও টুপী মাথায় দিলেন। প্রধান কারণ, খুব দূর থেকে তাদের ফলো করলেও তারা যেন আমাদের চিনতে না পারে। এইরূপ ব্যবস্থা করে আমরা গিয়েছিলাম। তাদের বলা ছিল, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে, যদি কাউকে না পাও, তবে ফিরে চলে আসবে। সেইদিন কোন লোকই সেইরূপ নির্জন পথ দিয়ে ৮টা থেকে ৮-৩০টার মধ্যে যায়নি। অগত্যা তারা ফিরে আসছিল। তাই দেখে আমি নির্মলদা আমাদের অস্তিত্ব বুঝতে না দিয়ে চলে আসি। তারা যখন শহরের ভিতরে চলে এলো, তখন নির্মলদা ও আমি নির্মলদার বাড়িতে সাদা পোশাকে উপস্থিত ছিলাম তাদের মুখ থেকে রিপোর্ট শোনার জন্য। তারা এলো রিপোর্ট দিল, কাউকে পাইনি, কাজেই প্ল্যান অনুযায়ী কিছুই করা গেল না।' এই যে রিপোর্ট তারা দেবে, তাতো আমরা আগেই জানি। তবু আমরা ভান করে সবই তাদের মুখ থেকে শুনলাম।

তারপর আমি বললাম—'অত দূরে শহরের বাইরে নির্জন পথে ৮-৩০টার সময় কোন লোক পাওয়া যাবে না। কাজেই জালে মাছ ধরা পড়বেই। এই ভেবে ঐখানে যাওয়ার আর দরকার নেই। এইজন্য আমাদের বিকল্প স্থান বেছে নিতে হবে। আমি মনে করি, টেলিগ্রাফ অফিসের পাহাড়ের নীচে যে মাঠ আছে সেই মাঠেই অপেক্ষা করতে হবে এইরূপ একটি মহড়া দেওয়ার জন্যে।

পরদিন নির্মলদা আমার সঙ্গে দেখা করলেন। নির্মলদা বললেন, 'নারায়ণ আমার কাছে বলেছে যে সে এ ধরনের কাজে আর যাবে না। সে আরো বলেছে—'আমি লেখাপড়া করব, আপনাদের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য যদি এই ধরনের ট্রেনিং অপরিহার্য হয়, তবে আমাকে মাপ করবেন, আমি তা করতে পারব না। আপনারা আমার ওপর রাগ করবেন না আমাকে ক্ষমা করবেন।' নির্মলদা এইটুকু জানিয়ে আমায় বললেন, 'নারায়ণ আমাদের সঙ্গে সক্রিয় বিপ্লব করবে না, এটা অন্তত ঠিক। আমাদের যে সে আগে বলে দিল, সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষে খুবই ভালো হলো।' আমি নির্মলদাকে জানিয়েছিলাম, আমার মনে হয় নারায়ণের আপনাকে এভাবে খোলাখুলি না বলে তার নিস্তার ছিল না। যদি না বলত, তবে তার নতুন নতুন এই ধরনের ট্রেনিং কোর্সে অংশ গ্রহণ করতেই হোত। এই কারণে সে ভয়ে আপনাকে বলতে বাধ্য হয়েছে। নির্মলদা এখন বুঝে দেখুন আমাদের বিপ্লবী সদস্যদের মুখে বিপ্লবের বড়াই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই। আমাদের ট্রেনিং হবেই। আর যারা এরূপ ট্রেনিংয়ে সামিল হবে না তাদের সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। এইসব সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নির্মলদা আমার সঙ্গে একমত হলেন, তবে তাঁর সদস্যদের প্রতি তখনও ভুল ধারণা ছিল। তাঁর ধারণা ছিল ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে বিপ্লবী সদস্যরা তাদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। বাস্তবে তা হয় না। সেইজন্য সংগঠনে ঐ ধরনের সামরিক শিক্ষার কর্মসূচী রাখতেই হবে। তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের কাছে খবর এলো পাড়ার একটি বাড়িতে সন্ধ্যের সময় রোজই ঢিল পড়ে। যার বাড়িতে ঢিল পড়ে সে বেচারী ভয়ে অস্থির। কারণ তাঁর বিবাহযোগ্যা দুটি মেয়ে ছিলেন। খবরটি পেয়ে আমরা বেছে বেছে ৫।৭ জন সেই বাড়ির উপর এইরূপ ঢিল পড়া বন্ধ করতে গিয়েছিলাম। মনে আছে সেই ৫।৭ জনের মধ্যে নবীনও একজন ছিল। আমরা অন্যের অজ্ঞাতে গোপনে বেছে বেছে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়েছিলাম। নবীন একজনকে ঢিল ছোঁড়ার সময় ধরে ফেলল। তারপর আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের গ্রুপের সবারই সংবাদ পেলাম। বিচার তখনই করলাম। বিচারের রায়ও তখনই দিলাম। তাকে ধমক দিয়ে জানিয়ে দিলাম—'ঢিল পড়ার সংবাদ আর যেন না পাই। যদি আমাদের কাছে সেইরূপ সংবাদ যায় ও আমাদেরই সাহায্য প্রার্থনা করে তবে আমরা বাড়ির কর্তাকে সাহায্য করব এবং আমাদের কঠোর পাহারার মধ্যে যারা ঢিল মারবে, তারা ধরা পড়বে।

যারা ধরা পড়বে, তাদের আর রক্ষা থাকবে না। যাও, এখন থেকে বুঝে চলবে।'

পাঠকবর্গ প্রশ্ন করতে পারেন, আপনারা যেমন যুবকদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচী রেখেছিলেন সেইরূপ নিয়ে আর কোন বিপ্লবী সংগঠন কী চলেছিল ? আমি যখন ডিক্‌টেশন দিচ্ছিলাম তখন আমার পরিচিত একজন আমাকে বলল—'যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন করি। আপনি যেরকম শিক্ষার কথা বললেন আপনাদের নিজ সংগঠনে এইরূপ শিক্ষা কেউ দিয়েছিল ?'—প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, কারণ বলতে হবে অন্যান্য সংগঠকদের কথা। এই সময় থেকে আরও প্রায় দু'বছর পরের সংগঠন ও সংগঠকদের অবস্থা। একদিন সকালে অম্বিকাদা আমাকে ডেকে পাঠালেন পোড়ো ন্যাশনাল স্কুলের একটি ঘরে। তিনি সেদিনই কলকাতা থেকে এলেন। মাস্টারদাদের সঙ্গে তাঁর তখনও দেখা হয়নি। তিনি বললেন—'তুই আর কেদারেশ্বর ডবল মুরিং জেটীর রাস্তা যেটি ঢেবার (একটি বড় দীঘির নাম) পাশ দিয়ে গেছে, তার উপর অপেক্ষা করবি। প্রায় ১২টার সময় সেই রাস্তার উপর দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি এ বি. রেলের টাকা নিয়ে জেটি অফিসে যাবে বেতন দেওয়ার জন্য। ফিটন গাড়ির ভিতরে পা রাখার জায়গায় টাকার থলিগুলো থাকে। তোরা গাড়িটাকে আটক করে যে কটা থলি নিতে পারিস তা নিয়ে ঢেবার উত্তর দিকের মাঠ দিয়ে দৌড়ে চলে আসবি। তুই রিভলবারটা সঙ্গে রাখবি, কেদারকে দিবি একটা ড্যাগার। তাকে আমি খবর পাঠিয়েছি, সে এক্ষুনি এসে পড়বে।

অম্বিকাদাকে আমি কোন সমালোচনা করিনি, করার ইচ্ছাও ছিল না। আমি খুশী হই, প্রথম একটি ডাকাতি করার জন্য আমাকে পাঠানো হচ্ছে বলে। কিন্তু মজার কথা হলো, আমি বা কেদারেশ্বর কেউই অম্বিকাদার রিক্রুট নই। এই প্ল্যানটা যে কার এবং এই অ্যাকশনের সিদ্ধান্তটা কে নিয়েছে তা বোঝা গেল না। তবে এই সিদ্ধান্ত যে মাস্টারদার নয়, তা বুঝেছিলাম, কারণ এরকম খেলো ও সুপরিকল্পনাবিহীন অ্যাকশনের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। এইভাবে কোন নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া আমাদের সংগঠনও চলেছিল। আর ভাবলেও অবাক হতে হয় কি করে এক মিনিটে রেলের টাকা ডাকাতি করার প্ল্যান করে ফেলেছিলেন এবং আমাদের দু'জনকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। অম্বিকাদা তখনও জানতেন না ছ'ঘড়া রিভলবারে কার্তুজ ছিল মাত্র পাঁচটি। একটা কার্তুজ আমি ফায়ার

করেছিলাম। আর ঐ বুলেটটার মত, সীসা ঢালাই করে আরেকটা বুলেট ঐ খালি খোলের মুখে লাগিয়ে রাখি। জানা না থাকলে এটা যে একটা ফায়ার করা কার্তুজ তা অম্বিকাদার মত লোকেরও বোঝার ক্ষমতা ছিল না। রিভলবারের পাঁচটি কার্তুজ নিয়ে ও একটি ড্যাগার নিয়ে ডাকাতি করতে দিনের বেলায় শহরের রাস্তার উপরে যেতে হবে—অম্বিকাদা ঠিক করে ফেললেন।

কিশোর বয়সে আমাদের উদ্ভট উদ্ভট গল্প বিপ্লবী দাদারা বলতেন। জুলুদা একদিন তার শোনা গল্প আমাদের কাছে বলেন। বোধ হয় তিনি শুনেছিলেন বিপিনদা, যতীনদা—কারো কাছ থেকে বা তিনি নিজের মন থেকেই বানিয়ে বলেছিলেন। গল্পটা হলো এই—দেখ তোমরা জান না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দও অস্ত্র চালানো শিক্ষা দিতেন। যখন ক্ষুদিরামকে লাটসাহেবকে গুলি করার জন্য দার্জিলিংয়ে পাঠানো হয় তখন অরবিন্দ বলেছিলেন, 'খুব টেষ্ট করে সিলেক্ট করে তবেই পাঠাতে হবে।' সেইজন্য কয়েকটি ছেলের সঙ্গে একটি পাতাল কক্ষে তাঁরা মিলিত হলেন। অরবিন্দ আছেন আর ৫।৬টি ছেলে উপস্থিত। অরবিন্দ টেবিলের উপরে একটা রিভলবার রাখলেন এবং সভ্যদের বললেন—'অ্যাকশনে কে যাবে? কে রিভলবার নেবে? সে এই রিভলবারটি তুলে নাও।' সবারই হাত বেরিয়ে এলো। অরবিন্দ তাদের সাবধান করে বললেন, 'পরীক্ষায় পাশ না করলে রিভলবার দেওয়া হবে না, অ্যাকশনেও পাঠাবো না।' এই শুনে সবাই নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল। তারপর অরবিন্দ বলল—'দয়া নেই, মায়া নেই। তোমার অন্তর নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ায় ভরে উঠবে, তবেই তুমি গুলি করে মারতে পারবে। তুমি কি তোমার অতি প্রিয়জনকে প্রয়োজনবোধে গুলি করে মারতে পার? পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে দেখে নিতে হবে প্রিয়জনকে গুলি করতে তোমাদের হাত কাঁপে কি না। তাই রিভলবার নিয়ে দেওয়ালের ঐ পাশে গিয়ে দাঁড়াও। ক্ষুদিরাম তুমি রিভলবারটি নাও। আমি তোমার সামনে ঐ পাশের দেওয়ালটিতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমি আমার মুখের সামনে রুমাল ধরছি। তুমি আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। ওয়ান, টু থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপবে।

দু'জনে ঘরের দুদিকে রেডি হয়ে দাঁড়াল। রুদ্ধশ্বাসে অন্যরা প্রমাদ গুণছিল কি হবে, কি হবে। ক্ষুদিরাম কোন কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে রিভলবারটা নিশানা করল। অরবিন্দ এক, দুই তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ফায়ার করল; রুদ্ধ কক্ষে জোর আওয়াজ হলো, বাতিটি নিভে গেল। সবাই যখন সম্বিত ফিরে পেল, তখন

দেখা গেল অরবিন্দ তড়িৎ গতিতে বসে পড়েছেন। আর রিভলবারের গুলিটা দেওয়াল ভেদ করেছে। আমি এই গল্প শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম এবং অরবিন্দের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হই। তখন দাদাদের কাছে এরকম বহু আজগুবি গল্প শুনেছি। কিন্তু তখন আজগুবি ভাবতে ইচ্ছে করত না।

এই আজগুবি গল্পের প্রভাবে আমি ভেবেছিলাম অম্বিকাদাকে এইরূপ একটি টেষ্ট করব। আমার কিশোর মনের অতিশয্যে এইরূপ একটি ডামি কার্তুজ তৈরী করি এবং প্ল্যান করেছিলাম অম্বিকাদাকে বলব—যদি কোন সভ্য পুলিশের চর হয়েছি জানেন, তবে আপনি তাকে গুলি করে মারতে পারবেন? সেই পরীক্ষাটা আজ দিন এবং সবাই দেখুক আপনি আমাকে গুলি করুন। এই বলে অম্বিকাদাকে আমি রিভলবারের ঘড়াগুলি এমনভাবে ঘুরিয়ে দেব যাতে তিনি ট্রিগার টিপলে পরে রিভলবারের ঘোড়াটি নকল কার্তুজের উপরে গিয়ে পড়ে। অম্বিকাদাকে টেষ্ট করার এই প্ল্যানটি মাষ্টারদাকে জানিয়েছিলাম। মাষ্টারদা হয়ত আমার এই আতিশয্যের কথা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। কিন্তু আজকে যখন কোন অগ্রিম প্ল্যান ছাড়াই একটি অ্যাকসনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তখন তাকে বলতেই হলো রিভলবারে পাঁচটি কার্তুজ আছে, ছুটি নেই। অতিরিক্ত কার্তুজ একটিও ছিল না। আজ খুব পরিষ্কার করে বলতে পারি, সেই প্ল্যানবিহীন অ্যাকসনে আমরা ধরা পড়তামই। ভাগ্যিস সেই পথে অম্বিকাদার সংবাদ অনুযায়ী কোন গাড়ি রেলের টাকা নিয়ে জেটিতে বেতন দেওয়ার জন্য যায় নি। এই ছিল সংগঠনের আসল চেহারা। বড়াই করে বলা যায় আমরা সেরকম সবাইকে ট্রেনিং দিতাম। বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। তার একমাত্র কারণ আমবা দলের নেতারা উপযুক্ত সংগঠক ছিলাম না।

শীতের সকাল।
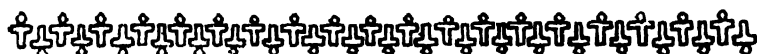
আমি ঘুম থেকে উঠে আমার টেবিল চেয়ারে বসেছি তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। আমাদের সামনের বাড়ীর গোরার মা আলুথালু বেশে কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে জানালেন, 'দাদা, পুলিশ আমার গোরাকে ধরে নিয়ে গেল।' আমি মনে মনে জানতাম পুলিশ হয়ত আমাকে খুব শীঘ্র ধরবে। আমার এ রকম ভাবার কারণ ছিল। পুলিশ মাস দুই-তিন আগে থেকে আমার উপর চব্বিশ ঘণ্টা প্রখর নজর রেখেছিল। আমাকে স্পষ্ট বুঝতে দিয়ে তারা তাদের পুলিশের চরদের সাদা পোশাকে গাড়ি নিয়ে পাহারা দিতে নিযুক্ত করেছিল। আমি বেরোলে গাড়িতেই বেরোতাম সেইজন্য কলকাতার ডি. ডি. তাদের এজেন্টদের সাদা পোশাকে আমাকে গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করার জন্যই বহাল করেছিল। তারা খুব খোলাখুলি ভাবে আমাকে বুঝতে দিয়ে সব সময় গাড়ি নিয়েই অনুসরণ করত। আমার গাড়ি মাসিমাকে নিয়ে যখন তাঁর অফিসে যেত, তখন সেই গাড়িও অনুসরণ করত। তাঁর অফিসে গিয়ে খোঁজ করত তিনি কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন এবং তাঁর অফিস রেকর্ড কী রকম। মাসীমার অফিস রেকর্ড খুব প্রশংসনীয় ছিল। তিনি ও তাঁর স্বামী এ. জি. বেঙ্গল অফিস থেকে সর্বপ্রথম মনোনীত হয়ে এ. জি. বেঙ্গলের ইংলণ্ডের শাখা অফিসে ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পাঁচ বছরে কাজ সমাপ্ত করে আবার এখানে ফিরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গেও তাঁদের কাজে উচ্চ মহল খুবই সন্তুষ্ট ছিল। মাসীমা কোন দিনই স্ট্রাইক প্রভৃতিতে যোগ দেননি। অফিস টাইম কখনও অপচয় করতেন না। সেই মাসীমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু কলকাতার ডি. ডি. পুলিশ আমার মোটর গাড়ির কল্যাণে তাঁকেও রেহাই দেননি।

পুলিশ এইভাবে খুব দেখিয়ে বুঝিয়ে আমাকে অনুসরণ করল কেন? আমার মনে হয় তার একটাই কারণ—আমি পালিয়ে যাই কি-না তা দেখা।

কয়েকদিন বাদে খবরের কাগজে বেরোলো শ্রীকল্যাণ বোস ওরফে গোরা হাকিমের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। এই সঙ্গে আরো খবর ছিল তাকে সেই হাকিমের কাছে স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ করার জন্য পুনরায় উপস্থিত করা হবে। এটা আরেকটা পুলিশী চাল বলে আমার মনে হয়েছিল। তারা দেখতে চেয়েছিল এই খবর বের হওয়ার পরে অনন্ত সিং ফেরার হয় কি না। অগত্যা পুলিশ যখন দেখতে পেল ভয় পাওয়ার লোক অনন্ত সিং নয়, তখন পুলিশ আর কোন গত্যন্তর না দেখে আমাকে ধরার জন্য মনস্থির করলো।

বিকেল পাঁচটা।

একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে বাড়ির দরজায় থামলো। বেল বাজলো। ছবি (আমার বোন) উপর থেকে দেখলো বাড়ির দরজার সামনে সাধারণ পোশাকে দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা ছবিকে বললেন, 'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। লেক কলোনীর বাড়ি কেনার জন্য অনন্তবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' ছবি বলল, 'দরজা খুলে দিতে বলছি, উপরে এসে বসুন।' ছবি ডাকলো, 'আনন্দ' দরজাটা খুলে দিয়ে আয়। বাবুরা উপরে এসে বসুক।'

ছবি আমাকে এসে বলল, 'দাদা, কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ি কেনার জন্য, কিন্তু তাঁদের দেখে আমার মনে হচ্ছে তাঁরা পুলিশ—সাদা পোশাকে এসেছেন আপনাকে ধরার জন্য।'

ছবির পক্ষে এই রকম ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাত্র একমাস আগে সকালবেলা গোরাদের বাড়িতে পুলিশ যে কাণ্ড করে গেল তারপর থেকে ভদ্রলোক দেখলেও তাদের পুলিশ সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নয়। গোরা তখন তাদের বসার ঘরে। তিনজন ভদ্রলোক সেই ঘরে ঢুকে বেশ ভদ্রলোকের মতই গোরাকে বলল, আপনাকে আমাদের সঙ্গে লালবাজারে যেতে হবে।

গোরা—'হেতু।'

'তা গেলেই জানতে পারবেন। সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

ইত্যবসরে গোরার বাবা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সেই বিশিষ্ট তিন ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা কল্যাণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কেন? কোথায়?'

'আমরা লালবাজারের পুলিশ। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রাসেল স্ট্রীট ব্রাঞ্চের ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কল্যাণবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কল্যাণের বাবা এই কথা শুনে যে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেই আগন্তুকদের মধ্যে একজন খুব মোলায়েম করে বললেন, 'আপনার এতে কিছু ঘাবড়াবার নেই। স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতি গতকাল হয়ে গেছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার ছেলেকে কিছু প্রশ্ন করা হবে। আপনি বেলা এগারোটার সময় যাবেন, ওনাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন।'

মিস্টার বোস একজন টিম্বার মার্চেন্ট। তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন কি না জানি না, তবে কিছুটা নিশ্চয় আশ্বস্ত হয়েছিলেন। পুলিশ এইভাবে নিঃশব্দে পাড়ার ভেতর থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল, কেউ জানতেও পারলো না।

যে কল্যাণ বোসকে পুলিশ কয়েক ঘণ্টা পরেই ছেড়ে দিচ্ছিল, তাকে আট বছর বাদে আমাদের সঙ্গে ১০-১০-৭৭-এ ছাড়লো।

কানু (বাড়ির একজন চাকর) দরজা খুলে তাঁদের ডেকে এনে বসবার ঘরে বসালো। বসবার ঘরটা দোতলার উপর আমার ঘরের সংলগ্ন একটা ঘর। তাঁরা বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাঁদের মধ্যে একজন (মনে হলো তিনি দলের প্রধান) একটু ঢোক গিলে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে মাতব্বরি চালে বললেন, 'আমি আপনাকে এ্যারেস্ট করলাম স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে।' আমার চেহারা বদলাতে লাগলো। আমি ক্রমশঃ গম্ভীর হতে লাগলাম। আমি বললাম, বেশতো, বলুন এখন আমায় কি করতে হবে ?

আপনাকে আমাদের সঙ্গে লালবাজারে যেতে হবে। আমরা এখন আপনার বাড়ি সার্চ করব।

ডি. সি. ডি. ডি. দেবীবাবু বীরদর্পে এক পা সামনে এসে তাঁর নিজের প্যাণ্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে হাতে নিলেন এবং আমাকে খুলে দেখালেন তাতে দু'টি কার্টিজ চেম্বারে পোরা আছে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে সার্চ করে দেখুন। আমি সার্চ পার্টি নিয়ে বাড়ি তল্লাসী করব।'

দেবীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডি. সি. এস বি. অরুণবাবু খেলা দেখাতে অবতীর্ণ হলেন। তিনিও বেশ একটু ভঙ্গিমা করে এক পা সামনে এগিয়ে এসে

তাঁর পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন আর বীরদর্পে ঘোষণা করলেন, এই দেখুন, ম্যাগাজীনে ছ'টি কার্টিজ। আমিও সার্চ করতে যাচ্ছি।'

নিয়ম আছে, সার্চ করতে যাওয়ার আগে পুলিশ অফিসাররা তাঁদের কাছে অস্ত্রাদি কি আছে তা দেখিয়ে যাবে এবং সঙ্গে যে কিছু নিচ্ছেন না তা বোঝাবার জন্য তাঁদের শরীরও সার্চ করতে বলে থাকেন।

যদি কোন বে-আইনী জিনিস গোপনে বাড়ির কোন জায়গায় রেখে দিয়ে তারপর বাড়ি থেকেই তা উদ্ধার করেছে বলে প্রতিপন্ন করতে চান, তবে তা তাঁরা অনায়াসে করতে পারেন। পুলিশের এই খেলায় আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। আমার ঔদাসীন্য তাদের যে যথেষ্ট নিরুৎসাহ করেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

ডি. সি. এস. বি. মহাশয় এই রকম অবস্থাকে তাঁদের অনুকূলে আনবার জন্য একটি প্রচেষ্টা করলেন। তিনি বেশ জোর গলায় আমাকে উপলক্ষ করে অভিযোগের সুরে বলতে লাগলেন, এই কটা বছর আপনি কি করেছেন? ছোট ছোট ছেলেদের বিভ্রান্ত করেছেন তাদের মাথা খেয়েছেন।' এই রকম প্রত্যক্ষ দোষারোপ হজম করে নেওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাই বলে অতি বিপ্লবী কমবয়সী যুবকদের মত তাঁকে আমার মত প্রবীণ লোকের পক্ষে অশোভন ভাষায় গালাগালি দেওয়াটাও প্রশংসনীয় নয় ভেবে আমি খুব গম্ভীর হয়ে গেলাম আর একটু কঠোর ভঙ্গী করে মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। জয়েণ্ট কমিশনার বুঝলেন কোথায় যেন একটু চালে ভুল হয়ে গেল, তাই তিনি অবস্থাটাকে সহজ করার জন্য প্রসঙ্গ বদলালেন। জয়েণ্ট কমিশনার গলার স্বর মোলায়েম ও ভদ্র করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অনন্তবাবু, সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি কি খান?'

একজন ছোট অফিসারকে বললেন, তুমি কাগজে কলমে নোট কর।

আমি বললাম, 'একটা ডিমের পোচ আর দুটো টোস্ট। চা আমি খাই না, খাই বোর্নভিটা।'

তারপর তিনি সেই ছোট অফিসারটিকে আমাকে শুনিয়ে বললেন, মনে করে এই ব্যবস্থাটুকু করতে হবে।'

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বেড-টি খান না?'

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'বেড-টি আমি খাই না।' আমার ব্রেকফাস্ট ৭-৩০-টায় দিলেই চলবে।'

জয়েণ্ট কমিশনার মহাশয় একে একে জিজ্ঞেস করে নিলেন দুপুরে, বিকেলে ও

ও রাত্রে আমি কি খাই। তিনি তার পর অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনার টেলিফোনটা কি একটু ব্যবহাব কবতে পারি?'

'খুব আনন্দেব সঙ্গে।'

টেলিফোন আমার পাশেই ছিল। তিনি উঠে এসে রিং করলেন কমিশনার অফ পুলিশ, লালবাজার। টেলিফোনে তাঁদের যা কথা হল, তা এই—'প্রেসের লোক লালবাজারে কমিশনারের অফিসে বসে আছে, তাঁদের সার্চ করা আর কত বাকী, কতক্ষণে তাঁরা লালবাজারে পৌছাবেন।'

উত্তরে জয়েন্ট কমিশনার বলেছিলেন—এক ঘণ্টার ভিতরে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন।

তিনি তাঁব আসনে ফিরে গেলেন। পর মুহূর্তে তিনি বাথরুমে গেলেন। বাথরুম থেকে ফিরে এসে পুলিশদের হুকুম করলেন, খাবার ঘরের আলমারীটাও সার্চ করবে। সেই আলমারীতে কাঁচের বাসন, আচার, কাসুন্দি প্রভৃতি থাকত। কিন্তু বন্ধ আলমারীর ভিতরে যে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, তা তিনি কি করে জানবেন, তাই তাঁর হুকুম, 'ওটাও সার্চ কব।' সার্চ পার্টির এইজন্য কিছু কাজ বেড়ে গেল।

সার্চ করতে যাওয়ার সময় সার্চ উইট্‌নেস্‌ পুলিশের নিতে হয়। যাঁব বাড়ি সাচ কববে নিয়মানুযায়ী তিনি সার্চ উইটনেস দেবেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়। তার কারণ প্রথমেই আমি তাঁদের বলে দিলাম, 'সার্চের ব্যাপার সম্পূর্ণটা আপনাদের। আমি এর সঙ্গে একটুও সহযোগিতা করব না। কাজেই সার্চ উইটনেস আমি দিলাম না। অগত্যা সার্চ উইটনেস তাঁরাই নিয়ে এলেন। আমার সামনেই তাঁরা কি পরামর্শ করলেন এবং সার্চ উইটনেস আনতে পাঠালেন। কলকাতার সব জায়গায় ডি ডি পুলিশের থাকে। লোকালিটিব লোক কেউ আসতে চায়নি। মনে হয়েছিল তাঁদেবই কোন একজন এজেণ্টকে ধরে নিয়ে এসেছেন। যাঁকে দেখলাম, তাঁকে দেখে আমার মোটেই মনে হলো না তিনি একজন উপযুক্ত সার্চ উইটনেস। তিনিও পুলিশেব ভঙ্গিমায় আমার সামনে এসে বললেন, 'আমাকে সার্চ করে দেখুন।' আমি হেসে তাঁকে বললাম, 'এই সার্চের ব্যাপারে আমি সহযোগিতা করছি না। পুলিশ তাঁদেব নিজেদের দায়িত্বে এই সার্চ করছে। কাজেই আপনার যদি কিছু বলার থাকে, তবে তাঁদের কাছেই বলুন।' সেই ভদ্রলোক তখন পুলিশের কাছে তাঁর নাম, ধাম, গ্রাম ইত্যাদি বললেন এবং পুলিশও তা লিখে নিলেন। বোধ হয় সার্চের সময় তিনিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। যখন সার্চ হচ্ছিল, তখন আমি ও জয়েন্ট কমিশনার বসবার ঘরে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে জয়েন্ট কমিশনার লালবাজার থেকে আরো দু'টি ফোন পান। ফোনের মূল বিষয় ছিল সাংবাদিকরা

বসে আছেন, কতক্ষণে আপনারা আসছেন। কাজেই পুরো সার্চ সম্পূর্ণ করে আমাকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জয়েণ্ট কমিশনার অপেক্ষা করতে পারলেন না। জয়েণ্ট কমিশনার নিজে আমার রাইটিং ব্যুরো থেকে দুটো কলম ও দুটো সুলেখা কালির দোয়াত নিতে বললেন। দুটো টাইপ-রাইটার তাও যেন নেওয়া হয় বললেন। হল ঘরে আমার একটা লোহার আলমারীতে আমার নামে লাইসেন্স করা একটা দোনালা বন্দুক ছিল। এই বন্দুকটাই নেওয়া হবে কি-না সেই কথাটাই তাঁরা পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো যে বন্দুকটা নেওয়া হবে না। বন্দুক না নেওয়ার পেছনে কি নিগূঢ় কারণ ছিল, তা বুঝতে আমাব কোন অসুবিধা হয়নি। আমাকে নন্ পলিটিক্যাল বানাতে হবে এবং মামলাটা যে নন্ পলিটিক্যাল তা বিশেষ করে প্রমাণ করতে হবে। পুলিশের সব রিপোর্ট আমার অনুকুলে না থাকলে লাইসেন্স গ্রাণ্ট করা চলে না। এই সর্ববিদিত সত্য কথাটা সবার জানা, যে একজন অসাধু ক্রিমিন্যাল ব্যক্তিকে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া চলে না। লালবাজারে প্রেসের লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে আমাব অ্যারেস্টেব সংবাদ জানার জন্য—আমার দেহ তল্লাসী কবে ও আমার বাড়িতে কি বে-আইনী জিনিস পাওয়া গেছে। একটা লাইসেন্স করা বন্দুক পাওয়া গেছে—এই কথাটা যদি পুলিশ কমিশনারকে সাংবাদিকদের বলতে হয় তবে সেটা পুলিশের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক তাই তাঁরা এই ব্যাপারটা কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।

তখন প্রায় সাড়ে আটটা বেজেছে। তল্লাসী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বাড়িতে বসে থাকা আর চলছে না। জয়েণ্ট কমিশনার অফ পুলিশ যাঁরা সার্চ করছেন তাঁদের সার্চ করতে বলে, আমাকে তাঁর বড গাড়িতে কবে লালবাজারে নিয়ে চলছেন। রাইফেলধারী পুলিশকে নিয়ে সামনে দুটো জিপ, পেছনে একটা পুলিশ ভ্যান আর মোটর সাইকেলে একজন পুলিশ সার্জেণ্ট তাদের গাইড কবছিল। বিজয়োল্লাসে তাঁরা লালবাজারে এসে উপস্থিত হলেন। তিন তলায় ডি সি ডি.ডি. দেবী রায়েব অফিসে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে তাঁরা টেলিফোনে কি কথাবার্তা বললেন, তারপর তাঁরা চলে গেলেন (মনে হলো তাঁরা পুলিশ কমিশনারের ঘরে প্রেস কনফারেন্সে গেলেন)। আমার বাড়ি থেকে আমার দু'জন কেরাণীকেও (অশোক সেনগুপ্ত ও শ্রীকানাই হাজরা) লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের বুঝতে দেওয়া হয়নি যে, তাদেরও অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লালবাজারে আমার সামনেই তাদের জিনিসপত্রের ফর্দ তৈরী করা হল এবং তাদের পুলিশ হাজতে রাখাব আদেশ দিল। আমি তাঁদের বললাম,

'আপনাদের খুবই অন্যায় হয়েছে এইভাবে না বলে তাদের এখানে এনে অ্যারেস্ট করে হাজতে রাখা। ওদের বাড়ির লোক জানতেও পারবে না, যে ওরা কোথায়!' পুলিশ আমার কথা ভ্রুক্ষেপও করলো না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোন রিপোর্টও ছিল না। অনন্ত সিং-এর বাড়িতে তারা ছিল—তাদের গ্রেপ্তার করার এটাই ছিল যথেষ্ট কারণ। ইন্দ্রদেও সিং (আমার ড্রাইভার) আমার জামা-কাপড়, বিছানা, সুটকেশ প্রভৃতি নিয়ে দেবী রায়ের অফিসে যেখানে আমি বসেছিলাম সেখানে এলো। একজন যুবক সাব-ইন্সপেক্টার (দিব্যেন্দুবাবু) যাঁকে মনে হলো দেবীবাবুর অত্যন্ত প্রিয়জন, তিনিই সব ফর্দ করে নিলেন। আমি কারো সঙ্গেই তখন কথা বলছিলাম না। একজন অফিসারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা সবাই পুলিশ কমিশনার শ্রী পি কে সেনের ঘরে প্রেস কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। আমার দু'জন ক্লার্ক কানাই ও অশোককে নিয়ে চলে গেল। ইন্দ্রদেও তখনও ছিল। আমাকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাজত ঘরে রাখার জন্য আদেশ দিল। সেখানে যাওয়ার পরে যে ইনচার্জ তিনি আমার সঙ্গের মালপত্রের হিসাব নিলেন এবং একজন সাব-ইনস্‌পেক্টার তালার চাবি নিয়ে দোতলার একটি 'চারজনের সেল' খুললেন এবং বিছানাপত্র সেখানে রেখে দিয়ে বললেন, 'আজকের মত এখানে আপনাকে রাত কাটাতে হবে। কালকে কর্তারা ঠিক করবেন' আপনাকে কোথায় রাখা হবে।'

আমাকে যখন দেবীবাবুর ঘর থেকে হাজত বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ইন্দ্রদেও খুব সন্তর্পণে পুলিশের চোখ এড়িয়ে কেবল আমার শুনতে পাওয়ার মত করে বলল, 'সুকুবাবুকেও এখানে নিয়ে এসেছে, এখনো ছাড়েনি, কোথায় রেখেছে জানি না। আমি ইন্দ্রদেওকে বললাম, 'তুমি এভাবে ঝুঁকি নিয়ে আমায় কিছু ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে চেষ্টা কোর না, তোমাকেও আটকে রেখে দেবে।' মনে হতে পারে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যেও ইন্দ্রদেও-র এত সুযোগ ছিল কি করে? প্রথমতঃ আমি যে কখনও গোপনে কোন চিঠিপত্র বা কোন সংবাদ পাঠাই না পুলিশ তাদের আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। আর দ্বিতীয় কথা হলো ইন্দ্রদেওকে পুলিশ মোটেই সন্দেহ করত না। ইন্দ্রদেও অতীতে একজন সরকারী পুলিশ ছিল। সে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে নিযুক্ত ছিল। সেখানে সে চোরাচালানের ব্যাপারে মিথ্যা অভিযুক্ত হয়। প্রমাণের অভাবে তার সাজাও হলো না, চাকরিও গেল না। কিন্তু পুলিশের চাকরি করতে তার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। তার পর থেকে সে আমার কাছেই প্রায় সাত-আট বছর চাকরি করছিল।

পুলিশ আমাকে এ্যারেষ্ট করতে আসার আগে সব রকম সংবাদই সংগ্রহ করেছিল। আমার অন্ত ড্রাইভার মদন পালকে তাঁরা খুবই সন্দেহ করত, কারণ আগে যাদের ধরে ছিল তাদের অনেকের কাছ থেকেই মদন সম্পর্কে সন্দেহজনক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু তারা কেউই ইন্দ্রদেও সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল সংবাদ পুলিশকে দেয়নি। অতএব এই অবস্থায় ইন্দ্রদেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানবিক কারণে আমাকে সাহায্য করেছে।

অত বড় ঘরে আমি একা। আমি দেখলাম মাত্র দুটো বালিশ আমার বিছানার ওপরে রাখা হয়েছে। আমি প্রায় পনর-বিশ বছর ধরে সাতটা বালিশ ব্যবহার করতাম ডাক্তারের পরামর্শে আধশোয়া অবস্থায় শুতাম বলে। দুটো বালিশ কি সাতটা বালিশের অভাব মেটাতে পারে? আমি অফিস ইন-চার্জকে ডেকে বললাম, 'আমি দুটো বালিশে কোন মতেই ঘুমোতে পারব না। আমায় সাতটা বালিশ দিতে বলুন।' তিনি পনের মিনিট বাদে কোথা থেকে ঘুরে এসে আমাকে জানালেন, 'দেবীবাবুর নির্দেশ, তিনটে বালিশের বেশী দেওয়া যাবে না। দুটো আপনাকে দেওযা হযেছে, আমি আর একটা নিয়ে এলাম।'

তখন রাত সাডে বারোটা। আমি ঘুমিয়ে পডলাম। পাঠকবর্গের মনে হবে, এত সব দুশ্চিন্তা নিযে কি ঘুম আসে? আমার ঘুম আসে। আমার তালাবন্ধ সেলের সমানে একজন সেপাই পাহারায় ছিল আর একজন সাব ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি এসে আমাকে নমস্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু আপনার দরজার সামনেই আছি, প্রয়োজন হলেই আমায় ডাকবেন কোন সংকোচ করবেন না।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিযে জানিয়েছিলাম, 'যখন আপনাদের কাছে আছি তখন প্রয়োজনে আপনাদের সাহায্যে আমায় নিতেই হবে।

শীতের রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে যখন উঠলাম তখন সাডে আটটা বেজে গেছে। তখন আর সেই অফিসারকে দেখলাম না, তাঁর জায়গায় অন্য আর একজন সার্জেণ্ট এসেছেন। আট ঘণ্টা অন্তর তাঁদের শিফ্‌ট ডিউটি। ঘুম থেকে উঠেই আমি দেখি ক্যান্টিন থেকে বোর্ণভিটা, ডিমের পোচ, মাখন দিয়ে দুটো টোস্ট নিয়ে এসেছে। আমার বলা ছিল যে, আমি গরম জলে স্নান করি। তাই সে ত্রুটিও তাঁরা রাখে নি। এক বালতি গরম জল স্নানের ঘরে দিয়ে গেল। সেখানে কলের জল ছিল। অসুস্থতার কারণবশতঃ আমায় কমোড ব্যবহার

করতে হোত। পায়খানায় কোন কমোডের ব্যবস্থা ছিল না। আমাকে দাঁড়িয়েই পায়খানা সারতে হোল।

ক্যান্টিন থেকে খাবার এলো। সার্জেন্ট আমাকে বললেন, 'আপনি খেয়ে নিন্। কোর্টে যেতে হবে। আমি খেয়ে নিলাম। পুলিশ ভ্যানে করে রবিবার দিন আমাকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে হাজির করা হোল। তিনি আমাকে না দেখেই পুলিশ হেফাজতে রাখার জন্য আদেশ দিলেন। সেইদিন কয়েকজন চেনা-অচেনা উকীল উপস্থিত হলেন এবং আমাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁদের আবেদনে কিছুই হোল না। মাননীয় সি পি. এম. (চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) আদেশ দিলেন যেন আমাকে পুলিশ হেফাজতে রেখে পুলিশ তাদের অনুসন্ধান চালায়।

রবিবারে সাধারণতঃ কোর্টে লোকের ভিড় হয় না। কিন্তু যেহেতু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই খবরের কাগজে দেখলো অনন্ত সিং ডাকাতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে, তখন থেকেই জনসাধারণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল কতক্ষণে অনন্ত সিংকে তারা কোর্টে দেখতে পাবে। তাই পুলিশের সতর্কতা সত্বেও ভীড় ঠেকানো গেল না।

আমার পক্ষে দাঁড়াবার জন্য দু'জন অ্যাডভোকেট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে গেলেন। সিনিয়র অ্যাডভোকেটের নাম ছিল মনোরঞ্জন বাবু। আরেক জনের নাম আমার এখন মনে পড়ছে না। মনোরঞ্জনবাবু আমাকে শারীরিক কারণে জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য হাকিমের কাছে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু মাননীয় হাকিম তা অগ্রাহ্য করলেন। তাই আধ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টের কাজ শেষ হয়ে গেল, আর আমাকেও লালবাজারে ফিরিয়ে আনলো।

হাজত ঘরে না নিয়ে আমাদের দেবীবাবুর অফিস ঘরে বসালো। আমাকে চা দিল। তখন দেবীবাবু ও জয়েন্ট কমিশনার আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাদের কথা বলার মূল বিষয়-বস্তু ছিল দশ পনের বছর আগের ডাকাতির কথা বলা। কথাটা তুললেন এইভাবে—'আপনি তো আমাদের কোন কথার জবাব দেবেন না, তবে এই কলকাতা শহরে একটা ডাকাত দলের অক্ষয় কীর্তির কথা শুনুন, তারা ঠিক করল বিনা রক্তপাতে সোনা-রূপোর দোকান থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কারাদি লোপাট করবে। কিন্তু তাদের সমস্ত প্ল্যানটা হবে যেন ডাকাতিটা খুবই নিঃশব্দে হয়। একটা গুলিও ছুড়বে না, একজনও খুন বা জখম হবে না। এইরকম ডাকাতি হওয়া সম্ভব যদি সেইরকম কোন দোকানের বিশদ খোঁজখবর

থাকে। সেই ডাকাত দলের চার-পাঁচ জনের স্বীকারোক্তি থেকে যাচাই করে নিয়ে এই তথ্য আপনাকে জানাচ্ছি। যে দোকানে ডাকাতি করবে ঠিক করেছিল, সেই দোকানটা ছিল ভবানীপুরে সিঙ্গার মেশিনের দোকানের পাশে। তাদের প্রথমে অনুসন্ধানের পালা চললো—এই দোকানে কটা আলমারী, কিভাবে এইসব লোহার আলমারী খোলা হয়, চাবি কোথায় রাখে, দোকানের মালিক ও কর্মচারী কয়জন, তারা কটার সময় দোকানে বন্ধ করে আর বন্ধ করার পরে মালিক ও কর্মচারীর কোন্ পথে তাদের বাড়ি যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব বিস্তারিত নিখুঁত সংবাদ তারা পনের-বিশ দিনে জোগাড় করতে পেরেছিল। নানা সময়ে তারা দোকানের সামনে দিয়ে ঘুরেছে। কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার ভান করছে। সেই সময় দেখেছে অন্য গ্রাহকরা কে কি কিনেছে এবং মালিকরা কোন আলমারা থেকে কি ধরনের জিনিস বার করে দিয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করে তারা দেখলো মালিক নিজে ও একজন কর্মচারী রাত আটটা সাড়ে আটটায় দোকান বন্ধ করে। দুটো লোহার বার কোনাকুনি ভাবে দরজার উপরে আঁটা থাকে আর দরজার আংটায় তালা দেওয়া থাকে। সবশুদ্ধ বড় বড় সাতটা তালা ঝোলানো থাকে। এইসব তালার চাবিগুলো একটা রিং-এ বাঁধা থাকতো। সেই সাতটা চাবি ও ভিতরের আলমারীর সব চাবিগুলো একসঙ্গে বেঁধে একটা থলিতে পুরে নেয়। এখন মশায় শুনুন তারা এইসব খবর পাওয়ার পর ডাকাতের মত সোজাসুজি পিস্তল নিয়ে সন্ধ্যের সময় দোকানে ঢোকেনি। তারা ঠিক করলো এখানে ডাকাতি হওয়ার সময় কেউ টের পাবে না। সেইরকম একটা প্ল্যান উদ্ভাবন করে পরের ব্যবস্থাগুলো করলো।

দোকান বন্ধ করার পরে মালিক এক রাস্তায় যেত, কর্মচারীটা অন্য পথ ধরে তার গন্তব্য স্থানে যেত। এই ডাকাত দল ঠিক করেছিল এই দু'জনকে তারা ধরে বেঁধে একটা গুপ্ত স্থানে নিয়ে আসবে। তারপর প্রায় সারারাতই ঐ ঘরে তাঁদের বেঁধে রাখবে। আর এরই মধ্যে ওর দোকান রাত্রিবেলা খুলে লুঠ করে নেবে।'

পুলিশ অফিসাররা এইভাবে ঘটনা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। আমি সাধারণ ভাবেই তাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম আমার কোন রকম প্রতিক্রিয়া তাঁরা দেখতে পান নি। তাঁরা আবার বিবরণ দিতে শুরু করলেন—কলকাতার রাস্তার উপর থেকে দু'জনকে কিডন্যাপ করে আনতে অন্তত দুটো গাড়ি তো প্রয়োজনই। কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে মাত্র

দুটো পরিচিত গাড়ি ছিল। এই দুরূহ কাজে মাত্র দুটো গাড়ির উপর নির্ভর করা তো চলে না, কারণ পথে যে কোন সময় গাড়ি বিগড়ে যেতে পারে। সেইজন্য তাদের প্রত্যেকটা গাড়ির পেছনে আর একটা গাড়ি রাখা দরকার। কিন্তু প্ল্যান করলেই তো সব হয় না। গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে? একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ভক্সল গাড়ি তারা বারোশ টাকা দিয়ে কেনে। পার্ক সার্কাসে একজন ডাক্তারের প্রাইভেট গাড়ি। প্রতি সান্ধ্যবেলা প্রায় তিন-চার ঘণ্টা তাঁব ডিসপেন্সারীর সামনে দাঁড়ানো থাকত। সেটি অস্টিন গাড়ি। ঠিক হলো সন্ধ্যার সময় তারা এই গাড়িটা চুরি করে নেবে আর তার পর দিন রাত আটটার সময় সেটা কিডন্যাপ করার জন্য ব্যবহার করবে। ততক্ষণ নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করে লুকিয়ে রাখতে হবে। তাদের ভেতরে যে ছেলেটা গাড়িটাকে নেবে, সে দু'এক দিন আগে সেই গাড়িতে উঠে বসেছে, দরজা খুলে দেখেছে—এইভাবে প্রাথমিক মহড়া শেষ করার পরে সে নির্ধারিত দিনে গাড়িটা চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বরানগরে দুপুর বেলা গাড়িটা নিয়ে সে যখন একা বসেছিল তখন সেই পাড়ার কয়েকটি ছেলে তার বসার স্থান ও ধরন দেখে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন যদি সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলত, তবে হয়ত বিভ্রাট হোত না। কিন্তু সে তাদের সঙ্গে চটাচটি করে, ফলে পাড়ার ছেলেরা তখন তাকে থানায় যেতে বাধ্য করে। থানায় তার গাড়ির ভিতরে নাম্বার প্লেট রং করার জন্য সাদা রং দেখতে পায়। এতে ওদের সন্দেহ বাড়ে। আগের দিন গাড়ি চুরির খবর সব থানায় জানানো হয়েছিল। সেই কারণে অস্টিন গাড়ি দেখে পুলিশ নির্ঘাত ধরে নিয়েছিল এইটাই সেই চুরি যাওয়া গাড়ি। পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী কোন চুরি যাওয়া মোটরগাড়ি ধরা পড়লে তার খবর লালবাজারে পাঠাতে হয়। সেই ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করে গাড়ি সমেত তাকে লালবাজারে পাঠিয়ে দেয় লালবাজারের ডি. ডি. পুলিশ আর তাদের কায়দায় সত্যি কথাটা জানার জন্য তার উপর অত্যাচার চালায়। সেই অত্যাচার অবশ্য খুব বেশী নয়। সামান্য একটু সুঁচ-টুচ ফোটানো হয়, পোড়া সিগারেট আর গায়ের বিভিন্ন স্থানে চেপেও ধরা হয়েছে, কিন্তু তার মুখ থেকে একটা শব্দও বার হয়নি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেনি?'

'প্রতিবাদ তো করেইনি, প্রতিবাদ করার মত তার অবস্থাও ছিল না। সে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তরেই কেবল না, না বলছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে উলঙ্গ

অবস্থায় বরফের উপরে শুইয়ে রাখা হয়। আশ্চর্য তবুও সে একটুও কাঁপলো না, ঠোঁটও নড়লো না। দেখতে লাগলাম ক্রমেই সে সাদা হয়ে যাচ্ছিল। তারপর একজন বৃদ্ধ পুলিশ অফিসারকে সে বলল, 'আমি এই গাড়িটার পার্টস খুলে বিক্রি করতাম। এটাই আমার ব্যবসা। আমার সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা।'

তাকে শেষ পর্যন্ত আমরা কড়ায়া থানায় পাঠিয়ে দিলাম যেন তারা তার বিরুদ্ধে রীতিমত মামলা চালায়। এইতো শুনলেন এই ছেলেটির কথা। তাদের দলের কথা আরও শুনুন—'ওদের দলে খবর চলে গেল যে এর বিরুদ্ধে মামলা চালাবার জন্য নির্দেশ দিয়ে আমরা তাকে কড়ায়া থানায় পাঠালাম। থানা পর্যায়ে তাদের তৎপরতা ছিল যেন যে-কোন উপায়ে তাকে জামিনে খালাস করে নিয়ে যেতে পারে। হোলও তাই। থানার বড়বাবু, ছোটবাবু প্রভৃতিকে ঘুষ দিয়ে ওর জন্য কোর্টে জামিনের দরখাস্ত করা হোল। থানার রিপোর্টের পরে তার জামিন নির্ভর করছিল। থানার অফিসাররা ঘুষ নিয়ে একটা ভাল রিপোর্ট দিল। সে গাড়ি চুরি করেছে পার্টস বিক্রি করার জন্য। হাকিম তাকে জামিনে মুক্তি দিলেন। তাদের লোক কোর্টের ও থানার অন্যান্য খরচপত্র বহন করেছিল। সবকিছু করার পরও এই সবল, সুস্থ ছেলের টাইফয়েড হোল। বিভিন্ন সূত্রে চেষ্টা করে ওকে এস. এস. কে. এম হাসপাতালে ভর্তি করল। কিন্তু দলে সক্ষম একজনের অভাব মেটানো খুবই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐদিকে তাদের ফাণ্ডে টাকা নেই, গাড়ি নেই, আর একজন লোক নেই। এই রকম অবস্থাতে তাদের এই অভিনব কৌশলে ডাকাতি সম্পন্ন করা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

এখন মশায় ওদের ডাকাতির কাণ্ডটা শুনুন। এই ডাকাতিতে সাহসের কাজ ছিলই, কিন্তু তার থেকে বেশী ছিল কৌশল। জোর-জবরদস্তি করে নয়, কৌশলে তাদের দু'জনকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

ঘটনার দিন সন্ধ্যা আটটার সময় ডাকাত দলের দু'জন প্যান্ট, কোট, টাই পরে ডাক্তার সাজলো। ডাক্তারের হ্যাণ্ডব্যাগ আর স্টেথিসস্কোপ নিল। দু'জন ডাক্তার ওদের পথে দুটো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে সেই দোকানের মালিক আর কর্মচারী দোকান থেকে বেরিয়ে যে যার পথে বাড়ি ফিরছিল। প্ল্যান ছিল সেই সময় ওদের বাড়ির কাছের একটি বাড়ির

নম্বর তারা জিজ্ঞেস করবে। কাছাকাছি বাড়ির নম্বর জানাতো সবার পক্ষেই স্বাভাবিক। তারাও প্ল্যান মাফিক জিগ্যেস করলো আর দু'জনের কাছ থেকে একই ধরনের উত্তর পেল, 'হ্যাঁ নম্বরটা জানি, আমার বাড়ির কাছেই। ডাক্তার-বাবুরা উত্তর দিলেন, 'বেশ তাহলে ভালই হোল। আসুন না আমার গাড়িতে! ঐ দিকেতো যাচ্ছি, আপনাকে নামিয়ে দেব।' ডাক্তার বাবুরা তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলে তাদের তুলে নিল।

গাড়ি এগিয়ে চলছে এদিকে তখন আর এক নাটক শুরু হোল। তাদের এখন প্রধান কাজ সবার দৃষ্টির অগোচরে দু'জনকেই বিনা বাধায় গাড়ির ভেতর সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে এনে বেঁধে ফেলা। এরজন্য এ ব্যাপারেও তারা আগেই রিহার্সাল দিয়েছে আর কী ধরনের সাইকোলজিক্যাল কথা বলবে তাও ঠিক করে নিয়েছিল। যেমনি পেছনের সীটে ডানদিকে মালিক উঠে বসলেন তখন ডাক্তার-বাবু একটি রিভলবার বার করে তার বুকের দিকে তাক করে ধরলেন। ডান হাতে রিভলবার ছিল কিন্তু হাতটা সামনের দিকে না বাড়িয়ে বুক দিয়ে হাতটা আড়াল করে ছিল, আর তাব বাঁ হাতটা বাড়িয়ে তাঁকে ঠেলে ধরে রেখেছিল যেন হঠাৎ রিভলবার ধরতে না পারে। এই সময়ে সামনের সীটে ড্রাইভারের বাঁদিকে যে বসে ছিল সে ঘুরে বসে প্রথমে বাঁ হাত ও পরে ডান হাত পেছনে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল। তুলোর প্যাড দিয়ে আঁটা গগলস রেডি ছিল, সেটাও পরিয়ে দিল যেন সে রাস্তা চিনতে না পারে কোন্‌দিক দিয়ে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়িতে যে এত কাণ্ড হচ্ছে তা যেন বাইরের লোকে দেখতে না পায, তার জন্য গাড়ির কাঁচে পালিশ করার ক্রীম লাগানো ছিল।

দুটো গাড়ি আলাদা আলাদা রাস্তা ধরে একটা নির্ধারিত বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। তারা বাড়িটা ঠিক করেছিল খিদিরপুরে একটা বড রাস্তার উপরে তাও আবার কলকাতার ডি সি. পুলিশের ব্রাঞ্চ অফিসের ৩০-৪০ গজের মধ্যে। মস্ত বড বাড়ি। বাড়ির ডানপাশে দুটো তিনটে গাড়ি রাখার মত লম্বা একটা গ্যারেজ ছিল। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করলে ভিতরে আর কিছু দেখা যায় না।

কর্মচারীকেও এইরকম কৌশলে গাড়িতে তুলে হাতে হাতকড়ি আর চোখে প্যাড লাগানো গগলস্ লাগিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে এলো। সেই বাড়ির একটা ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে আগে থেকেই তাদের রাখার ব্যবস্থা ছিল। বিভ্রাট হোল মালিককে যে গাড়িতে করে আনা হচ্ছিল, সেই গাড়িটা মাঝপথে বিগড়ে গেল। সেটাকে ফার্স্ট গিয়ারে চালানো হচ্ছিল। খুব কষ্টে গাড়ি ভিড় রাস্তা ছেড়ে যখন

সারকুলার রোডে এলো, তখন ঠিক ক্যাথাড্রাল রোডের উপর গাড়ি পরিবর্ত্তন করে মালিককে পরিচিত একটা গাড়িতে করে সেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। তখনও পথচারী দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে, দু-একটা গাড়িও পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের দলপতি স্বয়ং সেখানে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন এক মুহূর্ত দেরী না করে সোজা তার গাড়িতে মালিককে তুলে আনা হোক। সঙ্গে সঙ্গেই সেইমত কাজ হোল। দরজা খুলে তাঁকে সেই গাড়িতে হাত ধরে নিয়ে আসা হোল। বিনা প্রতিবাদে তিনি চলে এলেন। এক মিনিট দেড মিনিটে এই কাজটা সারা হয়েছিল। কোন লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে দেখতে চায়নি। কোন মোটর গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়েনি। কাজ সমাধা করেই তারা পূর্ব নির্ধারিত বাড়ির দিকে চললো। বাড়ির কাছে এসে তারা ডি. ডি. অফিসকে লক্ষ্য করে দেখলো সেখানে লোকজনের ব্যস্ততা আছে কিনা। সব শান্ত, তাদের বাড়িটাও শান্ত। তারপর তারা হর্ণ বাজিয়ে গ্যারাজে ঢুকলো। সাংকেতিক হর্ণ আগে থেকে ঠিক করা ছিল। গ্যারাজের ভিতরে গাড়িটা ঢোকবার পর গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে দোকানের মালিককে তারা হাত ধরে নামালো। চোখ বন্ধ ছিল বলে তাঁর হাঁটতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তাঁকে হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল আর যাওয়ার সময় তার বিভ্রান্তি ঘটাবার জন্য তারা এই রকম বলছিল—'দেখুন পুকুরের ধার দিয়ে যাচ্ছেন। ডানদিক ঘেঁষে যাবেন। আসলে কিন্তু পুকুর ছিল না। একটু এগোবার পরে তার সামনে থেকে একটা কলা গাছের পাতা সরিয়ে দেওয়া হোল। এ সবই মিথ্যা। তারপর তাকে বলা হোল, 'চলুন সিঁড়ি ধরে একটু উপরে উঠতে হবে'। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তারপর এই বাড়ির দুটো ঘর ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের যে ঘরে থাকার কথা সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল। সেই ঘরে আগে থেকে তার কর্মচারী বন্দী ছিল। তাঁকে বলা হোল, এখানে আগে থেকেই আপনার কর্মচারী উপস্থিত আছেন। আপনি তো তাকে দেখতে পাচ্ছেন না তবে কথা শুনতে পারবেন, আপনারা কথা বলুন। তাঁদের চা, সিগারেট দেওয়া হোল। 'যা খেতে চান, তাই দেওয়া হবে'—এও বলা হোল; তবু তাঁরা খেতে চাইলেন না তক্ষুনি। দোকানের মালিক মনের আক্ষেপ জানাচ্ছিলেন, কারণ তাঁর কাছ থেকে দোকানের চাবিগুলো চেয়ে নেওয়া হয়েছিল আর তাঁকে বলা হয়েছিল, চাবিগুলো কাল ফেরত পাবেন।

তিনি বড়লোক, তবে খুব বড়লোক তো নন। ডাকাতদের তাঁকে সর্বস্বান্ত

করে ফেলার ইচ্ছে ছিল না। তারা তাঁকে বলেছিলো, 'দেখুন, আপনার টাকা আমরা নিচ্ছি, কিন্তু যদি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, তবে আপনার এই টাকা আমরা ফেরত দেব।' উনি বুঝতেই পারছিলেন যে, ডাকাতরা তাঁর সব টাকাই নিয়ে যাবে। তাই বুঝে চুপ করেছিলেন। যে ক'জনের সেই বাড়িতে পাহারা দেবার কথা, তারা রইল, আর যে চাবি নিল সে চলে গেল।

দোকানের দরজা খোলা হবে রাত বারোটার পরে। দোকানের দরজা খোলার সময় কোন বিভ্রাট হোক, তা তারা চায়নি। সেইজন্য তারা কতকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রথম ব্যবস্থা ছিল যেন দোকানের সামনের রকটাতে কোন অপরিচিত লোক শুয়ে না থাকে সেইজন্য নিজেদের একজন লোক শুয়ে থাকবে। যে শুয়ে থাকবে সে কিন্তু দরজা খুলবে না, কারণ সে তখনও চাবি পায়নি। রক ছাড়া রকের সামনে ফুটপাতেও মাঝে মাঝে দু'একজন লোক শুয়ে থাকতো। সেই জায়গাও খালি রাখার জন্য তারা গোবর ছড়িয়ে রেখেছিল। চাবি নিয়ে যাকে দেওয়া হবে সেই দোকান খুলবে। সে ততক্ষণ কোথায় থাকবে। তার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল গাঁজা পার্কে। সে সেখানে শুয়ে থাকবে।

প্রায় রাত এগারোটার সময় গাঁজা পার্কে গিয়ে তাকে দরজা ও আলমারী খোলার চাবি দেওয়া হোল। সে টাইম অনুযায়ী রকের সামনে গিয়ে শুয়ে পড়লো, আর আগের লোকটা উঠে চলে গেল। ক্রমশঃ রাস্তায় গাড়ি চলা কমতে লাগলো আর আশপাশের লোকজনের নাক ডাকার আওয়াজ শোনো যাচ্ছিল। এখন সে দরজার বার আর সাতটা তালা খুলতে শুরু করবে। মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্যান প্বাস করে যাচ্ছে। তবুও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে দরজার তালা খোলার কাজ শুরু হোল। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বড় রাস্তা ধরে যেসব গাড়ি আসছিল তা দূর থেকে দেখে আগে' থেকে সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু যদি কোন গাড়ি বিশেষত পুলিশের গাড়ি নন্দনরোড থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে তবে সেটাকে কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে তাই নিয়ে তাদের একটু চিন্তা ছিল। তারা লাল বাতি সমেত রোড ক্লোজার লাগিয়ে দিল। অতি সন্তর্পণে ও নির্বিঘ্নে তারা দরজা খোলার কাজ শেষ করেছিল। আলমারীর চাবিগুলো নিয়ে এবার সে দোকানের ভিতরে ঢুকলো। ঠিক ছিল সে একাই রাত তিনটে পর্যন্ত ভেতরের সবকিছু অনুসন্ধান করে সোনা-দানা যা পাবে সব নিয়ে আসবে। আরো দুটো সমস্যা তাদের সামনে ছিল। একেকটা এলাকার দোকানদাররা মিলে দারোয়ান নিযুক্ত করত। এলগিন রোড থেকে শুরু করে পূর্ণ সিনেমার মোড় পর্যন্ত একজন দারোয়ান

পাহারা দিত। উত্তর থেকে দক্ষিণ হয়ে ঘুরে আসতে তার সচরাচর তিন ঘণ্টা লাগতো। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও হোত। দারোয়ানটা পূর্ণ সিনেমার মোড় থেকে আগে ঘুরে আসতো। যদি দারোয়ানটা পূর্ণ সিনেমা থেকে দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করে, তখন তারই আশেপাশে তার পকেট থেকে কিছু টাকা-পয়সা রাস্তার ওপর ফেলে দেবে আর তারই সঙ্গে এমন ভাব দেখাবে যেন কোন একটা দামী আংটিও তার সঙ্গে পড়ে গেছে। দারোয়ান দেখবে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিনিসগুলো খুঁজছে। সে দারোয়ানকেও ডেকে নেবে ভাই একটু খুঁজে দাও। সত্যি এই ঘটনা ঘটেছিল আর দারোয়ানও সেই কৌশলে আটক হয়েছিল।

ডাকাতদের দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দোকানের মালিক ও কর্মচারী তাঁদের নিজেদের বাড়ি ফিরছিল না বলে তাঁদের উভয়ের বাড়ি থেকেই দোকানে খোঁজ করতে আসতে পারে। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাত দশটায় তারা তাদের দলের দু'জনকে তাঁদের দু'জনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল এই কথা বলতে যে, 'উনি বলে পাঠালেন, আজ রাতে তাঁর বাড়ি ফিরতে দেরী হবে।'

নিশ্চিন্ত মনে দোকানের ভিতর যে ঢুকেছিল সে যে কটা আলমারী ছিল সবই খুলে দেখলো আর সোনা-দানা, টাকা-পয়সা যা পেল তাই নিল। তিনটে বাজলে নিঃশব্দে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সে পোঁটলা নিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আরেকটা বাড়ির উদ্দেশ্যে।

জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ফিরে এলো খিদিরপুরে ওই বাড়িতে। চোখে চশমা আঁটা অবস্থায় ওঁদের দু'জনকেই গাড়িতে তোলা হোল। পেছনে তাদের হাতকড়া বাঁধাই ছিল। একজন গাড়ি চালাচ্ছিল আর তার পাশে আর একজন বসেছিল। তাদের কারো সঙ্গেই কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। রাত চারটের সময় গাড়ি চলল লেকের দিকে। লেকের উত্তরদিকের কোন একটি কোণায় তাঁদের দু'জনকে নামিয়ে আনা হোল। দু'জনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে তাঁদের হাতে হাতকড়ার চাবি দিয়ে দেওয়া হোল। যেন নিজেরা খুলে নেয়। আর একটা থলি করে দোকানের চাবি তাঁদের ফেরত দেওয়া হোল। তখনও তাঁরা ভয়ে কাঁপছিলেন। কথা বলতে পারছিলেন না। সেই অবস্থায় তাঁদের সেখানে রেখে তারা গাড়ি নিয়ে চম্পট দিল। পুলিশ যখন খবর পেয়ে তাঁদের দোকানে ও বাড়িতে গেল, তখনও তাঁদের পুরো জ্ঞান ফিরে আসেনি। কোথায় কোন্ বাড়িতে তাঁদের বেঁধে রাখা হয়েছিল তার কোন সন্ধানই তাঁরা দিতে পারেন নি।

দেখুন মশাই এতক্ষণ আপনাকে গল্প বললাম। আমাদের কী সুস্পষ্ট ধারণা

তা এখন আপনাকে জানাচ্ছি। এই ধরনের ডাকাতির খবর আমরা আগে কখন শুনিনি। আমাদের পুলিশের ফাইলে এই রকম রেকর্ড আর একটিও নেই। কি সেই ডাকাত সর্দার? আমাদের সবারই সুচিন্তিত অভিমত যে এই ডাকাতদলের নায়ক আপনি। তারা সবাই আপনার নামই বলেছিল। আমাদেরও বিশ্বাস আপনি ছাড়া এইরকম বিচক্ষণতার সঙ্গে এই ডাকাতি আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না। আপনি কি অস্বীকার করবেন?

যেভাবে তাঁরা গল্প শুরু করেছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত হয়ত এমনি প্রশ্ন করেই তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। তাঁদের মুখে শেষের কথাগুলো শুনে আমি ভিতরে ভিতরে খুবই চটেছিলাম, কিন্তু তা নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করার কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না। আমি কেবলমাত্র তাঁদের বললাম, 'নিজের নিজের ধারণা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।' তাঁরা বললেন, 'প্রায় দশ-পনের বছর আগের ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ পুলিশের কোন উৎসাহ নেই। বর্তমানের বড় বড় ডাকাতি ও দুর্গাপুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের জানা বাকী আছে। সেই সম্বন্ধে আপনি আমাদের কিছু বলুন। আপনার কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে কিছু জানতে চাই না। স্বেচ্ছায় আপনি যতটুকু জানাবেন, তা নিয়েই আমরা আপাতত সন্তুষ্ট থাকবো। আমি তাঁদের দু'জনের দিকে আড়চোখে তাকালাম। তারপর ধীরকণ্ঠে বললাম, 'শুনুন, আপনারা আপনাদের ধারণা নির্ভুল মনে করে বসে থাকতে পারেন, তাতে আমার কিছু করার নেই। আপনাদের সন্তুষ্টির জন্য 'হ্যাঁ'-ও বলব না, 'না'-ও বলব না।'

তাদের ভিতরে একজন বললেন, আপনি স্বীকার করছেন, তা যদি ধরে নিই, তাহলে কি তা আমাদের পক্ষে ভুল হবে?

সে অবশ্য আপনাদের ইচ্ছে তার ওপর আমার হাত নেই।

এই কথা যে অতি সত্যি, তা আপনি বুঝতে পারছেন। আপনি মুখে অস্বীকার করলে তা করতে পারেন। আমরা সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি সঠিক মূল্যায়নবোধ আছে বলেই পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসের ডাকাতি সকালে অফিসের সময় দু-তিন মিনিটে ঘটে গেল আর পার্ক স্ট্রীট থানা একশ গজের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারলো না। তারপর যে রাস্তা ধরে ডাকাত-দলের গাড়ি উধাও হয়ে গেল, সে পথে পুলিশ ভ্যান তাদের বাধা দিতে পারলো না। চার লক্ষ টাকা নিয়ে চলে গেল আর সামালও দিয়ে রেখেছে। এইসব

ভাবতে গিয়ে আমাদের দৃঢ় ধারণা এই ডাকাতিটা আপনার পরিচালনায় ঘটেছে।

তারপর তাঁরা স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, অদ্ভুত,আপনার পরিকল্পনা, অদ্ভুত আপনার ট্রেনিং। আমরা পুলিশ হতে পারি, তবু আপনাকে আমরা আপনার দক্ষতার জন্য শত সহস্র নমস্কার জানাই। ইচ্ছে করে আপনার মাথাটা কেটে পরীক্ষা করে দেখি ঐ মাথায় কি আছে। দেখুন আপনি আমাদের কাছে স্বীকার করুন আর না-ই করুন, তাতে মোকদ্দমাতে কিছুই হচ্ছে না। আমরা কেবল আপনার কাছে জানতে চাইছি এই ডাকাতির পরিচালক আপনি ছিলেন কি না। আমরা এটি কাগজ-পত্রে লিখে নিচ্ছি না, কেবল আপনার মুখের কথায় জেনে নিতে চাই।'

আমার মুখের কথা না পেলেও আপনাদের কাজের কোন অসুবিধা হবে না। আপনারা নিজেদের বুদ্ধিতে কাজ করে যান। গীতায় বলেছে মা ফলেষু কদাচন।

তাঁরা হতাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

আপনি যে, অনমনীয় ভাব নেবেন তা আমরা জানতাম। কিন্তু অনন্ত বাবু বোধ হয় ভালো করলেন না। যদি তদন্তের সময় আপনি আমাদের সাহায্য করতেন, তবে হয়ত অনেক নির্দোষ ব্যক্তি ও অনেক নিরীহ আত্মীয়-স্বজন পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেত। সবগুলো প্রমাণ নিয়েই অনুসন্ধান করি তা নয়, প্রমাণ পাওয়ার জন্যই অনুসন্ধান করি। সেইক্ষেত্রে আপনার সাহায্য পেলে আমরা অনায়াসে নির্দোষ ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজনকে বাদ দিতে পারতাম। সেইজন্যই বিশেষ করে আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তবে বলতে পারি, এই ডাকাতি মামলাগুলির সমাপ্তি খুব সহজে ঘটবে। অন্যথায় আমাদের কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকবে আর আমাদের কর্তব্য পালন করার সময় অনেকে হয়ত কষ্ট পাবে।

অতঃপর আমার বক্তব্য আমি খুব জোরের সঙ্গেই তাদের শোনালাম, শত্রুর সঙ্গে আমি হাত মিলিয়ে চলতে চাই না। আপনারা আপনাদের সৎ-বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করে চলবেন। অকারণে উৎপাত করবেন না, আর কোনমতেই কারো উপর শারীরিক অত্যাচার করবেন না। আপনাদের সুবুদ্ধি হবে কি-না জানি না সর্বমঙ্গলময় ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

৭
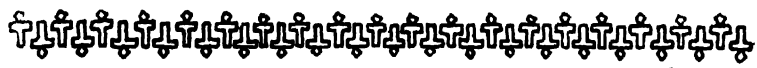
আমার শেষ কথাগুলো শুনে তাঁদের যে খুবই খারাপ লাগছিল, তা বুঝতে পারছিলাম। তাঁরা বললেন, 'আপনার অহেতুক শেষ উপদেশগুলোর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আপনি অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ, চেষ্টা করবো আপনার কথাগুলো অবজ্ঞা না করার।'

তাঁরা আবার বললেন, অনন্তবাবু আমাদের কথা শুনলে ভালো করতেন। আপনার সাজা হবেই।

এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শোনার পর, আমিও গম্ভীর হয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলাম, 'আমার বিরুদ্ধে আপনারা যত ইচ্ছা মামলা চালান না কেন আমাকে আপনারা কখনও দোষী প্রমাণ করে সাজা দিতে পারবেন না। আমি মুক্তি পাবই।'

লালবাজারের ভি-আই-পি সেলে আমি ছাড়া আর অন্য কোন বন্দী থাকত না। দরজার সামনে একজন কনস্টেবল ও একজন ডি-ডি, সাব-ইন্সপেক্টর সর্বক্ষণ বসে থাকত। খাওয়ার পর লালবাজারের মধ্যেই অন্য অফিস-বাড়ি যেখানে ডি-সি, ডি-ডি-ও থাকতেন সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোল। কেবল সেদিনই নিয়ে গেল না, প্রতিদিনই নিয়ে যেত। যদি আমি শারীরিক কারণে না যেতে চাইতাম, তবে বোধ হয় জোর করে নিয়ে যাবার কোন অর্ডার ছিল না। ঠাণ্ডা, অন্ধকার ঘরে থাকার চাইতে কয়েক ঘণ্টা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলে ভালোই লাগতো, তাই আমার নিজের যাওয়ার গরজটাও ছিল। আমাকে নিয়ে গিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বা ইন্সপেক্টর বা ডি-সি-এর ঘরে রাখত। তাঁরা আমার সঙ্গে নানা গল্প-গুজব জমাতেন। সব গল্পের উদ্দেশ্য একটাই ছিল। আমার কাছ থেকে অধুনা চারটে ডাকাতির খবর জানা। আর বিশেষ করে তাঁদের জানবার প্রয়াস ছিল দুর্গাপুরের ন্যাশানাল স্টেট ব্যাঙ্কের উপর ডাকাতির প্ল্যানটা।

পার্ক-স্ট্রীট পোস্ট অফিসের ডাকাতি, তার পর ন্যাশন্যাল গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের দু'টো ডাকাতি ও সর্বশেষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া রাসেল স্ট্রীট ব্রাঞ্চের ডাকাতি সম্বন্ধে কলকাতা শহরের সবাই জানতো, কারণ এই চারটে ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার পর প্রধান প্রধান দৈনিক খবরের কাগজ খুব ফলাও করে পাবলিসিটি দেয়। কিন্তু তখনও কেউ জানতো না যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার দুর্গাপুর ব্রাঞ্চে এক কোটি টাকা ডাকাতি করার জন্য প্রকাণ্ড আয়োজন চলেছিল। পুলিশ গোপনে এই তথ্য আবিষ্কার করে। দু'তিন মিনিট মধ্যে কলকাতা শহরে চারটে বড ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল। একটাও ডাকাতিব হিল্লে তখনও পর্যন্ত পুলিশ করতে পারেনি। কাজেই গুজবের ছড়াছড়ি। এমতাবস্থায় দুর্গাপুরে এক কোটি টাকা ডাকাতির প্ল্যান পুলিশের কাছে খুব কঠিন প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিল। তাঁরা এইসব ডাকাতির তথ্য সংগ্রহ কিভাবে কববেন বা কি করে সংশ্লিষ্ট সবাব বিরুদ্ধে মামলা সঠিকভাবে পরিচালিত কবে দণ্ড দেবেন তা নিয়েই পুলিশেব যত মাথাব্যথা। ডাকাতির নামে লোক ধরে ফেলাতো সোজা। কিন্তু আসল লোককে ধরতে পারাটাই ছিল প্রধান কাজ। তাব জন্য পুলিশ যাদের ধবেছিল, তাদের মধ্যে অনেকের প্রতি অভাবনীয় অত্যাচার করেছে। যুবক আসামীরা পুলিশ অত্যাচারের গল্প কোর্টে জজ্ সাহেবের কাছে বলেছে যা পুলিশ কখনও খণ্ডন করতে সাহস করেনি।

এই কারণেই হাজত-বাসের সময় সেইসব বন্দীদেব মধ্যে অনেকের গুরুতব প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, কেউ কেউ প্ল্যান কবে জেল থেকে পালাবাব চেষ্টা করেছে আব পালিয়েছেও। পালাবার জন্যই পালানো কাজেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবাই ধরা পড়ে গেল। এইবকম পবিস্থিতিতে আমার সঙ্গে উপবওয়ালা কয়েকজন পুলিশ অফিসার পবামর্শ কবতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দু'জন আফসার দশ বাব বছর আগেব ডাকাতিব কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন, 'দেখুন, ঊষা কোম্পানীব টাকা যে ডাকাত দল ডাকাতি করেছিল তাবাই দশ-বারো বছব পবে এইসব ডাকাতি আরম্ভ করেছে। ঊষা কোম্পানীব টাকা ডালহৌসীর ব্যাঙ্ক থেকে নির্ধারিত দিনে পেমেণ্টেব জন্য নিয়ে যাওয়া হোত। নিখুঁত সংবাদ তাদের কাছে না থাকলেও বেশ মোটা টাকা মোটব গাড়ি করে দারোয়ানরা নিয়ে যেত। ডাকাতদের ইচ্ছে ছিল গাড়িটা থামিয়ে পিস্তল দেখিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে। সেই জন্য তাদের প্রথম প্ল্যান ছিল যখন গাড়িটা ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়বে, তার বেশ কিছু আগে বিভিন্ন পোষ্টে

জানিয়ে দেওয়া হবে। যখন গাড়িটা ঊষা কোম্পানীর ভিতরে প্রবেশ করবে, তখন সেটাকে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নেবে।

টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় দারোয়ানদের সঙ্গে দুটো বন্দুক, একজন কেরানি আর একজন ড্রাইভার থাকত। তারা রোজ একই গাড়িতে একই রাস্তায় টাকা নিয়ে যেতেন না। কিছু রাস্তা কমন্ যা তাদের অতিক্রম করতেই হোত। সেই কমন্ রাস্তাটা তাঁরা ঠিক করলো ঊষা কোম্পানীর মুখে আনোয়ার শা রোডের উপরে। গাড়ি কিভাবে তারা থামাবে তার প্ল্যান ছিল এইরকম—গাড়ি ঘুরে ঢোকার সময় যখন গতি মন্থর করবে, তখনই গাড়ির সামনে ও পেছনের দুটো চাকায় ব্রেক দেবে। সঙ্গে সঙ্গে যারা বন্দুকধারী প্রহরী, তাদের প্রতি রিভলবার উঁচিয়ে ধরে হুকুম করবে 'বন্দুক ফেক'। হাত ওঠাও। আর দু'জন তখনই টাকার বাক্স টেনে নামিয়ে নিজেদের গাড়িতে নিয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে আর পেছনের চাকা পাংচার করে দেবে। সেইজন্য খুব তীক্ষ্ণ ছুরি জাতীয় জিনিস কাঠের ডাঁটে লাগানো ছিল। মোটরের চাকা খুব ধারালো ছুরি দিয়েও খুব সহজে পাংচার করা যায় না, তার জন্য সেই ধরনের উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে চাকা পাংচার করা যায় কিনা, তার জন্য তারা প্র্যাকটিশ করেছিল। কাঠের রোড ব্লক তারা পোষ্ট এণ্ড পার্সেলের মত করে টিকিট লাগিয়ে নিয়েছিল। সেটা হাতেই ধরা ছিল। গাড়ির গতি যখন মন্থর হবে, তখনই তারা স্ব-স্ব স্থানে থাকবে। আর যখনই অন্যরা রিভলবার দেখিয়ে ড্রাইভার ও দুই বন্দুকধারী দারোয়ানকে কাবু করবে তখন তারা তাদের রোড ব্লক সামনের ও পেছনের চাকায় ঠেসে দেবে। আর দু'জনে চাকাও পাংচার করে দেবে।

গাড়ি যখন ডালহৌসির ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে স্টার্ট করবে সেই সংবাদ প্রায় দশ মিনিট আগে যে পার্টি আক্রমণ করবে তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য তারা রেড রোডের বাঁ-পাশের মাঠ থেকে উচ্চ-শক্তির হাওয়াই ছেড়ে সংকেত দেবে যারা গাড়ি নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এই সংকেত পেয়েই এই গাড়িটা হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে হাজরা হয়ে রাসবিহারী এভিন্যু ধরে সাদার্ন এভিন্যু হয়ে লেকের সুইমিং পুলের দিকে আসবে। যখনই সুইমিং পুল দেখা যাবে, তখনই মোটরের হর্ণ দিয়ে সংকেত দেবে। সংকেত দেখে যে লোক এদিকে থাকবে সে মোটর গাড়ি মোছার হলদে কাপড নিয়ে বাঁদিকের ছোট প্লটটাতে গিয়ে সেটা খুলে ধরে ইঙ্গিত দেবে। এইটা দেখা যায় আনোয়ার শা রাস্তার উপর থেকে। সেই

সংকেত পেয়েই যারা প্রস্তুত হয়ে আছে উষা কোম্পানীর গাড়ি আটক করার জন্য তা তারা অনেক আগেই পেয়ে যাবে। তারা রিহার্সাল দিয়ে দেখেছিল প্রায় দশ থেকে পনের মিনিট আগে এই বার্তা পৌছানো যায়।

অনেক অভাবনীয় জিনিস ঘটে যার হিসেব আগে করা যায় না। গাড়ি মোছার হলদে কাপড় রোদে শুকোচ্ছে এই মত করে দু'-একবার সেটাকে খুলেছে আর বন্ধ করেছে। কিন্তু এতেও মাঠের কয়েকজনের সন্দেহ উদ্রেক করলো। তারা গণ্ডগোল শুরু করলো, 'কেন এই কাপড, কেন এটাকে শুকোচ্ছেন, আপনাদের এখানে কি প্রয়োজন?' এই অবান্তর বচসা শুরু হোল আর কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। পরিস্থিতি ক্রমেই বেশ ঘোরালো হয়ে গেল। এই মাঠের পথটায় তারা ঠিক করে রেখেছিল টাকার থলি নিয়ে আসবে। এই মাঠের পথে কোন গাড়ি-ঘোড়া, সাইকেল চলে না। লোকও যাতায়াত করে না। তাই ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পরে আনোয়ার শা রোডের দু'দিক থেকে যদি পুলিশ রাস্তা ব্লক করে দেয়, তবে সেই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা দুষ্কর। সেইজন্য এই তৃতীয় পথটা তারা ব্যবহার করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু এত তুচ্ছ কারণ নিয়ে সেখানে গোলমাল হয়ে যাওয়াতে সেদিন সংকেত পাঠানো গেল না আব ডাকাতিও হোল না। এই শিক্ষা নিয়েই তাদেব সেই পবিকল্পনা সেদিন বন্ধ করতে হোল। ঠিক হোল, আবার পনের দিন পরে উষা কোঁম্পানীর কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গাড়ি যখন কোম্পানীতে যাবে তখন তাঁরা স্থান পরিবর্ত্তন করে ডাকাতিটা সংঘটিত করবে।

নতুন স্থানটা হোল সিংহী পার্কের বিপবীত দিকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টোর্সের সামনের রাস্তা। ট্রাম লাইনটা দুটো রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটু উঁচু জায়গা দিয়ে পাস করছে। ট্রাম লাইনের দু'দিক সিমেণ্টের রেলিং দিয়ে ঘেরা। কাজেই দু'দিকের দুটো রাস্তা অপেক্ষাকৃত অনেক সরু। দুটো বড লরি বিপরীত দিক থেকে পাস করতে পারে না। তাই দুটো রাস্তাই একদিকমুখো। একটা রাস্তায় সব গাড়ি উত্তর থেকে দক্ষিণে পাস করে আবার আরেকটা রাস্তায় গাড়িগুলো দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যায়। তাই ডালহৌসী থেকে টাকা নিয়ে যখন গাড়িটা দক্ষিণে আনোয়ার শা রোডের দিকে যায় তখন গাড়িটাকে এই সরু রাস্তার উপরে আটক করবে স্থির করে। আগে যা বলেছি সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী খবরটা রীলে করে আগে এসে পৌছবে। তখন তাঁবা গাড়িটাকে আটক করে টায়ার পাংচার করে ড্রাইভার ও বন্দুকধারী দারোয়ানকে গাড়িতেই আবদ্ধ রেখে টাকার থলি নিয়ে সরে পডবে।

এই সব রাস্তা দিয়ে টাকা নিয়ে গাড়িটা আনোয়ার শা রোডে উষা কোম্পানীতে বেতন দেওয়ার জন্য তারা ঠিক করেছিল লম্বা লম্বা বাঁশ বোঝাই করা দুটো গাড়ি এই রাস্তার ধারে বাঁদিক ঘেঁসে রাখবে। সেই অবস্থায় টাকার গাড়িটা এই তৈরি করা ফাঁদে পড়বেই আর সেই মুহূর্তে সামনে থেকে ডাকাতদের হিন্দুস্থান ফোরটিন ফোর' গাড়িটা টাকার গাড়িটাকে আটক করবে। তারপর আগে যেভাবে বর্ণনা দিয়েছি, সেইভাবে চাকায় রোড ব্লক দেবে আর চাকা পাংচার করবে। কিন্তু সবরকম প্ল্যানই ভেস্তে গেল। ঠিক আগের দিন সন্ধ্যের সময় এয়ারপোর্টের রাস্তায় 'হিন্দুস্থান ফোরটিন ফোর' গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসলো। তারা চার-পাঁচজন একটা কাজে যাচ্ছিল। এমন সময় এয়ার ইণ্ডিয়ার কোন একটা গাড়ি এই গাড়িটাকে পেছন থেকে এসে সামনের চাকায় পাশ দিয়ে ধাক্কা মারে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো গাড়ি চালায় সেই চলাচ্ছিল। কিন্তু ধাক্কাটা খেয়ে গাড়িটা সামাল দিতে না পেরে রাস্তার উপর থেকে বাঁদিকে নীচে নেমে গেল। এটা হোল একটা মেজর অ্যাকসিডেন্ট।

একদিন পরেই ডাকাতি হওয়ার কথা আর সেদিন যদি ডাকাতি না হয় তবে তাদের আরো পনেরদিন অপেক্ষা করতে হবে। যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থায় আরো পনেরদিন অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। গাড়ির ইন্সটলমেণ্ট, বাড়ি ভাড়া প্রভৃতি না দিলেই নয়। কাজেই তাদের একদিন পরে ডাকাতি করতেই হোত। কিন্তু এ যেন এক অসম্ভব ব্যাপার। কি করে একদিনের মধ্যে গাড়ি সারিয়ে 'অ্যাকশনে' যাওয়া সম্ভব। তাদের নেতা সবাইকে বললেন, যে-কোন উপায়ে হোক, আজকে শনিবারের রাত, রবিবারের সারা দিন-রাত খেটে যেন এই মোটরটা রাস্তার ধারে যেসব মোটর-মিস্ত্রিরা কাজ করে, তাদের দিয়ে সারিয়ে নিতেই হবে। সোমবারে গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করা চাই। তাদের মধ্যে যারা সেখানে ছিল তাঁরা বোধ হয় সারানো সম্ভব হবে না বলেই মত প্রকাশ করছিল। কিন্তু তাদের নেতা অনেক ঘটনার নজির দিয়ে তাদের বলতে লাগলেন এরকম পরিস্থিতিতে যখন সব আশা ছেড়ে দেওয়া হয় তবু ধীর মস্তিষ্কে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে গেলে এইরূপ কাজ সারিয়ে ফেলা যায়। হাল ছেড়ে না দিয়ে মোটর যারা সারায় তাদের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে, আর মনে উৎসাহ যোগাতে হবে। মোট কথা হচ্ছে যদি প্রথম থেকে হবে না বলে কাজ শুরু করি, তবে তার ফল এক রকম আর যদি কাজটা হবেই—এই মনোভাব নিয়ে কাজটা শুরু করা যায় তবে ফল ভালো হতে বাধ্য।" তারা নিজেদের মধ্যে এই রকম পরামর্শ করে মনে মনে

সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেল যে রবিবারের রাত্রের মধ্যে এমনকি সারারাত জেগে মেরামতি কাজ শেষ করতেই হবে।

তারা এ মোটরগাড়ি 'অ্যাকশনের' জন্য সোমবার দিন সকাল থেকে পুরো প্রস্তুত রেখেছিল। টাকা নিয়ে গাড়ি এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময়ে উষা কোম্পানীতে যায়, আবার অনেক সময় কিছু দেরীও হয়। তারা কিন্তু প্রস্তুত হয়ে নিজ নিজ পোস্টে সাড়ে দশটা থেকে উপস্থিত ছিল। সংবাদ আসবে রীলে করে। তখন সবার মনে এক চিন্তা আজ গাড়িটা আসবে কি-না। যদি আসে তবে নির্ঘাত ডাকাতিটা হচ্ছেই। একটা মূল কথা বাদ রেখে গেছি, সেটা এখানে বলছি। কোম্পানীর টাকা দু'রকম গাড়ি করে যেত। কোনদিন প্রাইভেট আর কোনদিন কোম্পানীর ভ্যানে। ওরা কোম্পানীর ভ্যান আটক করে গাড়ি থেকে টাকাটা কিভাবে নেবে তার একটা মহড়া দিয়ে সবাইকে শিখিয়ে নিয়েছিল। মহড়াটা ছিল কোন দারোয়ান বা কোম্পানী লোকের সামনে থেকে ব্যাগটা সরাবার সময় বিশেষ কৌশল অবলম্বন করবে। পেছনের দরজা খোলা যেত। টাকার ব্যাগ থাকত পেছনের পোর্সানের সামনের দিকে। দারোয়ান ও দু'জন কেরানী ভিতরে বসে থাকত। তাদের মাঝখান দিয়ে গিয়ে টাকার ব্যাগ আনাটা সমীচীন বলে ভাবেনি কারণ ভিতরে গিয়ে ক্যাশ বাক্স যদি আনতে হয় তবে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অতদূর যাবে আর আনবে সেই সময় ভিতরে যারা আছে তারা অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে। সেই রকম আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়া চাই। সেইজন্য তারা একটা শক্ত বড়শির মত লম্বা ছিপ সঙ্গে রাখে আর সেই ছিপের মাথায় লোহার আংটা বেঁধে রাখে। তারা রিভলবার ও পিস্তল দিয়ে তাদের ভয় দেখিয়ে হাত তুলে রাখতে বলবে আর ভিতরে কেউ না ঢুকে ঐ ছিপের আংটা দিয়ে ব্যাগটাকে টেনে সামনে আনবে। এই কাজ শুরু হওয়ার আগেই তাদের বন্দুক ফেলে দিতে আদেশ করবে। যদি সেই আদেশ তারা না মানে তবে আত্মরক্ষার জন্য গুলি করার পারমিশন তাদের দিয়েছিল। তাদের ঘাটির একটা বাড়িতে ভ্যানের উচ্চতা অনুযায়ী খাট কিনে আনা হয়েছিল আর খাটের দুদিকে বেঞ্চ রেখে বসার জায়গা করে। রিভলবার দেখিয়ে প্রথম তাদের বন্দুক ফেলতে বলবে আর আংটা লাগানো ছিপ দিয়ে বন্দুক দুটো আগে বাইরে নিয়ে আসা হবে। তারপরে আদেশ হবে তোমার সামনের দিকে মুখ করে ঘুরে বস। সেই সঙ্গে ছিপের মাথার আংটার সাহায্যে টাকার বাক্স বাইরে টেনে আনা হবে। যদি ভ্যান যায় তবে এই পদ্ধতি তারা

নেবে। আর যদি কোন প্রাইভেট গাড়ি শোভ্রোলে বা অ্যামবাসাডর যায়, তবে সেই গাড়ি বাগে আনতে অন্য ব্যবস্থা ছিল। সেটা অনেক সোজা।' দু'জন দুদিক থেকে দারোয়ানকে রিভলবার দেখিয়ে তাদের বন্দুক ছাড়তে বলবে আর বন্দুক কেড়ে নেবে। তারপর পেছনের সিটের দুজনকে আদেশ দিয়ে ডানদিকের দরজা দিয়ে বার করে দেবে। ইতিমধ্যে রোড ব্লক ও টায়ার পাংচার করে গাড়িটাকে একেবারে নিশ্চল করে সেখানে রেখে দেবে। তারা টাকার ব্যাগ বা বাক্স নিয়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে চলে আসবে।

ঘটনার দিন ঠিক সময়ে সঠিক স্থানে গাড়িটা এসেছিল, ভ্যান নয়।' তাই তাদের পক্ষে ডাকাতি করাটা সহজসাধ্য হয়, কিন্তু একজন দারোয়ান ঘটনাস্থলে নিহত আর অপর দারোয়ানটা গুরুতর ভাবে জখম হয়েছিল। ডাকাতরা দুটো বন্দুক আর টাকার স্যুটকেশ নিয়ে নিজেদের গাড়িতে সুরেন রায় রোড দিয়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা রাস্তায় উপরে বন্দুক দুটি ফেলে দেয়। কিছুদূরে অন্য একটা গাড়িতে টাকার ব্যাগটা তুলে দেয়। তারপরে 'হিন্দুস্থান ফোরটিন ফোর' ওদের চারজনকে নিয়ে সুপরিকল্পিত গন্তব্য পথে এগিয়ে যায়, আর পথের পূর্বমনোনীত স্থানে কালো কাগজেব উপরে যে নাম্বাব প্লেটের উপরে লাগানো ছিল তা তুলে ফেলে দেয় আর ড্রাইভার একা গাড়িটা নিয়ে চলে যায়।'

এই ডাকাতি হওয়ার পরে শহরে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কাদের এই কাজ। পুলিশরা এই সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল যে এই কাজ অনন্ত সিং ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এই ধরনের গল্প শুনতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। পুলিশের কাছে আমি এইসব গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিনি, তবুও তারা নাছোড়বান্দা, গল্প তারা করবেই। তারা আমাকে বললেন, আপনি হয়ত সবটাই অস্বীকার করবেন। তবে আমাদের কথা আপনাকে জানালাম। আমরা এই ডাকাতির মাষ্টার প্ল্যানের জন্য আপনাকে সর্বতোভাবে দায়ী করি। আপনার বিরুদ্ধে কেস প্রমাণ করতে পারব কি-না সে অবশ্য অন্য কথা। তবে যে ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের মূলে আপনি ছিলেন আর এই ডাকাতির উদ্যোক্তা যে আপনি, তা কিন্তু আপনি কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেন না। তবে আপনাকে ডাকাতির ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে চালান দিয়েছি। আমাদের যখন কোন কথা বলতে অস্বীকার করলেন, তখন কোর্টে বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করে যা জবাব দেবার তা দেবেন। তবে আপনাকে জানাচ্ছি, এই বিচারে আপনার সাজা হবেই আর তা হবে

যাবজ্জীবন কারাবাস। সরকার পক্ষে অন্তত তাই চেষ্টা করবে। যদি আপনি এই ধরনের অনমনীয়ভাব নিয়ে আমাদের এড়িয়ে না যেতেন তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত আপনারই লাভ হোত। আপনি জ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি। আপনাকে আমরা কী আর বোঝাবে। খুব বন্ধুভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমরা পরস্পর আলোচনা করে কি কোন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারি না? যে চারটে গুরুতর ডাকাতি ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করেছি তার নিস্পত্তি কি ভালভাবে করা যায় না? আপনি মত দিলে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে পারি।

তাদের কথায় মনে সন্দেহ জাগছিল যে সাংঘাতিক ফৌজদারী মামলায় আমাদের আটক করেছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ নয়। একেবারে মিথ্যা কেস করেও আমাদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তার থেকে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে চললে ক্ষতি কি? পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের মুক্তির রাস্তা ঠিক করবো? এই রকম নির্বুদ্ধিতা আমার হোক, তা আমি কোন মতেই চাই না। 'প্রিন্সিপল' অনুযায়ী পুলিশের সঙ্গে মুক্তির ব্যাপারে কোন বোঝাপড়া হোতে পারে না, এ ধরনের কঠোর মনোভাব আমার কোন কালে ছিল না। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিচার করে ওজন করে দেখে নীতি ঠিক করবো মীমাংসা করবো কিনা। মীমাংসা হতেই পারে না, তেমন নীতি আমার মোটেই ছিল না। কলকাতার এই চারটে ডাকাতি—ভবানীপুরের সোনা-রূপোর দোকান, উষা কোম্পানীর ক্যাশ টাকা লুঠ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট আর সুরেন ব্যানার্জি রোডে সোনার দোকান ডাকাতির চার্জে যে মামলা আমাদের বিরুদ্ধে দায়ের করেছিল, তার একটিতেও কোন প্রত্যক্ষ-দর্শী সনাক্ত করার মত সাক্ষী তাদের ছিল না। একটি স্বীকারোক্তিও হয়নি, কোন রাজসাক্ষীর বালাইও ছিল না। তবে তাদের অতসব গল্পের ফাঁদে আমার পা দেওয়ার দরকার কী। আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাদের মামলা কোন মতেই টিকবে না। তারা ভেবেছিল এক-আধ জনকে তারা রাজসাক্ষী হিসাবে পেয়ে যাবে। যখন তারা একজনকেও রাজসাক্ষী হিসাবে পেল না বা কারো কাছ থেকে স্বীকারোক্তিও পেল না, তখন শেষ চেষ্টা করে দেখতে লাগলো যদি আমার সম্মতি নিয়ে মামলাটা নিস্পত্তি করতে পারে, তবু তাদের মান থাকবে আমি তাদের তখন বলেছিলাম, আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন তবে আপনারা কাউকে যে সাজা দিতে পারবেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 'কনসপিরেসি কেস করছেন, কিন্তু আপনাদের একজনও রাজসাক্ষী নেই। এগজিবিটে একটা আর্মস বা ছোট্ট একটা বুলেট, তাও দেখাতে পারেন নি। লুন্ঠিত টাকা বা সোনাদানা

বা অলংকার কিছুই মামলায় উপস্থিত করতে পারেননি। তবে কি করে আশা করেন যে মামলা চালাবেন।

সত্যি তাদের এই মূল দুর্বলতা সম্বন্ধে তারা খুবই সচেতন ছিলেন। এবং সেইজন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বিমান ভাদুড়ী ও লক্ষীবাবুর সোনা-রুপোর দোকানের একজন মালিক শ্রীপ্রভাত সেনকে নিয়ে তাঁরা খুব চেষ্টা করেছিলেন কোন-মতে একটি স্বীকারোক্তি পায় কি না; প্রভাত সেনকে রাতের পর রাত ঘুমোতে দেয়নি। প্রায় দশ বারো দিন তাকে জাগিয়ে রেখে কেবলই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, শ্রীপ্রভাত সেন কোন কিছুই জানতেন না। কাজেই কি স্বীকার করবেন? প্রভাত সেনের মতই দীর্ঘকায় ব্যক্তি বিমান ভাদুড়ীকে তদনুরূপ যন্ত্রণা দেয়। অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্য দশ-বারো দিন ঘুমোতে দেয়নি। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি না পেয়ে তারা সত্যি খুবই হতাশ হয়েছিল। আমার সঙ্গে বন্ধু বিরাজমোহন দেব ধরা পড়েছিল। সে আমার সঙ্গে আন্দামান জেলে ছিল। আসাম কোর্টে তার যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হয়। অনুরূপ দণ্ড তার বাংলাদেশেও হয়েছিল। এই দুটো দণ্ড পর পর খাটার আদেশ ছিল। তাই তাকে পঁয়তাল্লিশ বছর কারাবাসের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে জেলে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মণ্টেগু-চেমস ফোর্ডের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হোল। পলিটিক্যাল প্রিজনারস্‌রা আন্দামান ও সারা ভারতবর্ষের জেলে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করে। সেই কারণে প্রথম প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সবাইকে ধীরে ধীরে মুক্তি দিলেন। বিরাজমোহনও মুক্তি পেল। বিরাজকেও ডাকাতি মামলার অজুহাতে আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছিল।

রুবি সেন এম-এ পড়তো, তাকেও আমার সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তাকে মেয়েদের 'সেলে' রেখেছিল। কিন্তু লালবাজারে মেয়েদের সেল অত্যন্ত জঘন্য সেখানে যে কোন নীচুস্তরের মেয়েকে বন্দী করে রাখত। বেশীর ভাগ বারবণিতা। সেলটা অত্যন্ত অপরিষ্কার। কাসি, থুথু, বমি ইত্যাদি সেই সেলেই পড়ে থাকত। মেথর থাকা সত্ত্বেও সেলগুলো পরিষ্কার থাকত না এই অবস্থায় রুবির নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছিল, তবু মনোবল একটুও ভাঙ্গেনি। রুবিকে যে বাড়ি থেকে ধরে আনে সেই বাড়ির সামাজিক পোজিশন সম্বন্ধে পুলিশ খুব সজাগ ছিল। তার প্রতি একটু অসৌজন্য ব্যবহার করেনি। সার্চ পার্টিকে পাঠানো হয়েছিল একজন ডি-ডি সাব-ইন্সপেক্টারের তত্ত্বাবধানে। তিনি কোন এক কলেজের প্রফেসর ছিলেন। প্রফেসরের চাকরিতে সম্মান বেশী হলেও টাকা কম। তাই তিনি অধ্যাপকের চাকরি পরিত্যাগ

করে বুদ্ধিমানের মত ডি-ডি পুলিশের চাকরিতে যোগ দিলেন। পুলিশের চাকরিতেও তাঁর প্রায় সাত-আট বছর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতি পুলিশরা সম্মানসূচক ব্যবহার করত আর তিনি একজন অধ্যাপক ছিলেন বলে জনসাধারণ তাঁকে বিশেষ সম্মান করত। আমিও শুনেছিলাম রুবির বাড়িতে তিনি খুব ভদ্রতাসূচক ব্যবহার করেছিলেন আর যেন তাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা না হয় তার জন্য খুবই সতর্ক ছিলেন। রুবিকে লালবাজারে অফিসারের ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়নি। রুবিকে তাদের যে পুলিশ গাড়ি করে ফলো করতেন সেই ভদ্রলোক একজন বিশেষ দাগী আসামীকে ধরতে গিয়ে রিভলবারের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিনি খুব সাহসী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উপরে ভার ছিল তিনি যেন রুবিকে তার অজান্তে দূর থেকে মোটর নিয়ে ফলো করেন। তিনি তা করেছিলেন প্রায় দশদিন। কিন্তু তাঁর অস্বাভাবিক চলাফেরা সম্বন্ধে রুবির বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট ছিল না। অন্য একজন অফিসার যখন রুবিকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন তখন তারই মধ্যে তিনি অপূর্ব গাড়ি চালান। তাঁর গাড়ি ফলো করা খুবই কষ্টকর-ছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি তিনি কোনদিক থেকে কোনদিকে চলে গেলেন, বুঝতেই পারা যেত না। তাঁর স্টিয়ারিং কণ্ট্রোলকে আমি প্রশংসা না করে পারি না। এই রকম একটু কথা বলে তিনি চলে গেলেন। যে ভদ্রলোক রুবিকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, তিনি একটা ক্লু পেয়ে রুবিকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি—আপনাকে মোটরগাড়ি চালানো শেখালো কে? অনন্তদা কি শিখিয়েছেন? রুবি তাঁকে উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, আমি অনন্তদার কাছেই গাড়ি চালানো শিখি।'

এই তো গেল রুবির কথা। এইবার আসা যাক আন্দামান ফেরত বিরাজমোহন দেবের কথায়। একদিন দুপুরে জেল হাজত থেকে বিরাজ বাবুকে ডেকে জেল অফিসে নিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে বিরাজ বাবু দেখেন সেই অধ্যাপক পুলিশটি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তিনি খুব বিনয়ী, ভদ্র আর নম্র।

পুলিশ: একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম যে ল্যাণ্ডমাইন ধরা পড়েছিল সুরেন ব্যানার্জি রোডে। সেই ধরনের ল্যাণ্ডমাইন চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে ধরা পড়ে। আপনি কি কিছু বলতে পারেন সেই ল্যাণ্ডমাইনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ছিল?'

বিরাজবাবু: দেখুন, আমার শোনা ও বই পড়া জ্ঞান। উত্তরে অনেক ভুলভাল হবে। আপনাকে আমি পরামর্শ দিই, আপনি বরং অনন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আপনাকে এই সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান দিতে পারবেন।'

পুলিশ: 'দেখুন ইচ্ছে ছিল, তাঁকেই ডেকে জিজ্ঞেস করবো। সত্যি বলতে কী, তাঁকে এসব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না, ভয় লাগে। তিনি আমাদের থেকে অনেক বড। তাঁর সঙ্গে আমাদের অফিসাররা কথা বলেন। আমার ঔৎসুক্য মেটাতে আমি আপনার সাহায্য চাইছি।'

বিরাজবাবু: (একগাল হেসে) আপনি বলছেন বটে, কিন্তু আপনাকে আমি বাস্তবে কিছুই সাহায্য করতে পারব না, কারণ আমি ল্যাণ্ডমাইন সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সত্যই যদি এ সম্বন্ধে কিছু জানার থাকে তবে অনন্তদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন।'

পুলিশ: (গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে) তাহলে বোধ হয় আমার আর এ-বিষয়ে জানা হোল না।'

৮

এইভাবে তাদের সাক্ষাৎকার শেষ হোল। আমি কোর্টে জামিনের আবেদন নিয়ে বলেছিলাম, 'এই মামলা আমাদের বিরুদ্ধে আগাগোড়া সাজানো। আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের একটা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীও নেই। ডাকাতির সাক্ষ্য হিসাবে তারা একটাও প্রত্যক্ষ জিনিস হাকিমের কাছে উপস্থিত করে নি। কোন 'আর্মস' বা আর্মসের একটা টুকরোও উপস্থিত করতে পারেনি। এমনকি একটা কার্তুজও প্রমাণস্বরূপ হাকিমের সামনে নেই। তাদের হাতে কোন স্বীকারোক্তি নেই। একজন রাজসাক্ষীও নেই। এই অবস্থায় মাত্র এই সাক্ষী নিয়ে কি বিচার চলতে পারে? কাজেই আমার প্রার্থনা আমাদের সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক।'

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট জামিন নামঞ্জুর করেছিলেন। অ্যাডিশনাল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরেও আমাদের বিরুদ্ধে মামলা সোপর্দ করেছিল। এই অ্যাডিশনাল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রামে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন যখন আমার নামে '১নং আর্মারি রেড' মামলা শুরু হয়। তাঁর ঘরে যখন আমাকে ও অন্যান্যদের আনা হোল তখন এই কথা তিনি নিজে বললেন আর তাঁর ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি এই মামলা আমাদের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছিলেন না।

আমি জজ সাহেবের এই রকম মনোভাব উপলব্ধি করে আমার জামিনের জন্য তাঁর কাছে আবেদন পেশ করলাম। প্রশ্ন হোল পুলিশ কিসের উপর নির্ভর করে মামলা করবে? তাদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কোথায়? তাদের সীজার লিস্টে কি দোষণীয় বস্তু ছিল?—বন্দুক, পিস্তল, রিভলবারের কার্তুজ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তাদের লিস্টে লুণ্ঠিত মালের কোন উল্লেখই ছিল না। একটাও স্বীকারোক্তি ছিল

এই জামিনের শুনানীর সময় সরকারী পক্ষের কোন উকিল ছিলেন না। স্বয়ং ইনভেসটিগেশন অফিসার পুলিশের পক্ষে জামিন না দেওয়ার জন্য সওয়াল করলেন। তাঁর যুক্তির ভিতরে তিনি বলতে গিয়ে বললেন, 'অনন্ত সিংহের বাড়িতে এই স্যুটকেশ আর তাঁর বিছানার পাশে একটা লেডিজ স্যাণ্ডাল পেয়েছি। ঐ স্যাণ্ডালটা রুবি সেনের।"

আমি যখন আমার কথা বলতে গেলাম তখন আই ও-র কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। তাই আমার বলার মধ্যে এই কটা কথাও ছিল।

'দেখছি একটা স্যুটকেশ এখানে এগজিবিট করা হয়েছে। সেই স্যুটকেশের মধ্যে কি কোন লুণ্ঠিত টাকা ছিল? বা বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা কোন রিভলবার? অবশ্য সে রকম কোন উল্লেখই তাদের লিস্টে নেই। তারপর আই. ও. একটা বড় এভিডেন্স দেখিয়ে বললেন, 'রুবি সেনের স্লিপার অনন্ত সিংহের খাটের পাশে ছিল।'

'তিনি ভুলে গেছেন, তিনি অনন্ত সিংহের ফৌজদারী চার্জে ক্রিমিন্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রমাণ করবেন। সেটি না করে সিভিল অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁর ঐ দুটো লেডিজ স্যাণ্ডালের প্রতি এত আকর্ষণ কেন? ঐ লেডিজ স্যাণ্ডাল দুটো কি পিস্তল ও রিভলবারের প্রতিকল্প? কাজেই যদিও একজোড়া স্যাণ্ডাল ও একটা স্যুটকেশকে আই. ও. চাইছেন যেন আদালত মেনে নেন রিভলবার ও ল্যাণ্ডমাইন বলে।'

তারপর আমি আরও বলেছিলাম গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের তিনদিন তিন ঘণ্টা ধরে কি কথা হয়েছিল। গান্ধীজি আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে দিয়েছি কি না আর আমরা তা দেব কি'না। আমরা তাঁকে যুক্তি দিয়ে বলেছিলাম, 'বিপ্লবীদের জন্য সন্ত্রাসবাদী পথ কখনো সমর্থিত হতে পারে না। আর আমরা চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা 'আর্মারী রেডের সময় একটিও ডাকাতি করিনি। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলাম ডাকাতির টাকা দিয়ে যদি পরিকল্পনা শেষ করতে হয় তবে সে পরিকল্পনা শেষ হয় না। কারণ তার আগেই পুলিশের হামলা সামলাতে গিয়ে সব নষ্ট হয়ে যায়।'

গান্ধীজি আমাদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কাজেই পুলিশের আরো একটু বর্তমান জগতের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হতে হবে, নইলে ভুল পথে তারা তাদের এনার্জি শুধু শুধু নষ্ট করবে……।

জজ সাহেব খুব ধীর মস্তিষ্কে দেড় ঘণ্টারও বেশী আমার জামিনের দরখাস্তের উপর বক্তব্যটা শুনেছিলেন। মাননীয় জজ তখনই একটা আদেশে জামিন মঞ্জুর করলেন। কিন্তু জামিন পেলেও আমরা মুক্তি পেয়ে বাইরে আসতে পারলাম না, কারণ তখনও আলিপুর কোর্টে উষা কোম্পানীর টাকা ডাকাতির কেসটা ছিল।

ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আমি নিজেই জামিনের দরখাস্ত পেশ করি। মোটমাট বক্তব্য একই ছিল, 'তোমরা ডাকাতির লুণ্ঠিত টাকা বা গহনা প্রভৃতি কারো কাছে পাওনি। তোমরা তাদের কাছে রিভলবার, পিস্তল বা কার্তুজ একটাও পাওনি। তোমাদের কাছে একজনের স্বীকারোক্তিও নেই, একজন রাজসাক্ষীও নেই। এই কেস প্রমাণ ছাড়া নিষ্পত্তি হবে। কেস সেইজন্য চলতে পারে না। আমাদের সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক ইত্যাদি ইত্যাদি।'

গতানুগতিক ভাবে আই. ও. জামিনের দরখাস্ত সবগুলো নামঞ্জুর করবার জন্য জোর গলায় আবেদন জানালেন। তবু মাননীয় হাকিম মহোদয় সরকারী পক্ষের জামিনের দরখাস্তের বিরোধিতার আবেদন নাকচ করে দিলেন আর সবাইকে জামিন দিলেন।

এখন বাকী রয়ে গেল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। তার কোর্টে যেদিন আবার আমাদের উপস্থিত করলো, সেদিন আমি আমার বক্তব্য রাখবো বলে মাননীয় হাকিমকে জানিয়েছিলাম। সরকারী পক্ষের উকিল রুবির একটা রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার খাতা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটা পাতা খুলে দেখালেন আর বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা একটা ল্যাণ্ডমাইন বলে অনুমান করা যাচ্ছে। কাজেই রিপোর্টের জন্য এক্সপার্টের কাছে পাঠাতে হবে আর তার জন্য অন্তত পনের দিন সময় চাইলেন। পুলিশের বাধার বিরুদ্ধে আমাকে বলতে হয়েছিল। আমি বলতে শুরু করেই বললাম, পি. সি. সরকারের এক্সরে আই দিয়ে আমিও দেখলাম সরকারী পক্ষ খাতা দেখিয়ে আপনাকে কী বোঝালো আর বাস্তবে তাতে কী আছে। তারা আপনাকে বুঝিয়েছে ঐ আঁকাজোঁকা একটা ল্যাণ্ডমাইনের স্কেচ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সি. পি. এম. সরকারী পক্ষের কথা শুনে তাদের সাত দিনের জন্য শেষবারের মত সময় দিলেন। আর লিখে দিলেন যদি রিপোর্ট পেশ করতে না পারে তবে তিনি আমাকে জামিন দিয়ে দেবেন। সি. পি. এম পনের দিন আগে তাদের শেষ সুযোগ দিয়েছিলেন ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। যদি আজকে সেই ফাইনাল রিপোর্টটা পাওয়া না যায় তবে তিনি আমাদের জামিন দিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

আজ আবারও না পেরে অতি লজ্জায় পুলিশকে আরও সাত দিন সময় দিলেন। কাজেই সাতদিন পরে জামিন যে মঞ্জুর করবে তা আশা করার কোন কারণ ছিল না। আরেকটি গুজব শোনা যাচ্ছিল সি. পি. এম খুব শীঘ্র রিটায়ার্ড হয়ে যাবেন। আর তিনি খুব আশা করছিলেন তাঁর স্পেশাল কোর্টে এই বিচারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হবে। কাজেই তিনি জামিন দেওয়ার কোন উপযুক্ত যুক্তি খুঁজেই পাচ্ছিলেন না, যদিও অ্যাডিশনাল সি. পি. এম ও পুলিশ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জামিন দিয়ে দিলেন। সাতদিন পরে আমাদের যখন আবার সি. পি. এম-এর কোর্টে হাজির করা হোল, তখন দেখি ম্যাজিস্ট্রেট আর আসছেন না। অনেক পরে মাথা নীচু করে তাঁর সামনে উপবিষ্ট হলেন আর মাথা না তুলেই জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন। তবে আমার বিরুদ্ধে চারটে কেসের জামিনের টাকার সংখ্যা হোল পঁচিশ হাজার টাকা করে।

দেবেন আমার সঙ্গে আমারই বাড়িতে ধরা পড়েছিল। সে তখন আমার গাড়ি চালাত। আমার নির্বাচনের সময় গাড়ি নিয়ে খুব খেটেছে। যে বাড়ি থেকে আমাকে ধরা হয়েছিল, সেটা আমার নিজের বাড়ি ছিল না। বাড়িটা জে.সি. গুপ্তা-র সামনের একটা বাড়ি। এই বাড়ির খুব নিকটে কড়েয়া রোডের উপরে কমিউনিস্টদের একটি কমিউন ছিল। সেই কমিউনে মজফ্‌ফর সাহেবও থাকতেন। আমার ড্রাইভার দেবেন কমরেড মজফ্‌ফর আমেদকে আমার গাড়িতে করে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে। আমাকে যখন আমার বাসায় অ্যারেস্ট করা হোল দেবেন কী করবে ঠিক করতে না পেরে ছুটে গিয়েছিল কমিউনে মজফ্‌ফর সাহেবকে আমার অ্যারেস্টের সংবাদ দিতে, তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করেন। দেবেনের গাড়ির পেছনে পেছনে পুলিশের গাড়ি ছুটে গিয়ে কমিউনের সামনে থেকে দেবেনকে অ্যারেস্ট করলো আর নির্দেশ দিল সে যেন তাদের সঙ্গে আমার গাড়ি নিয়ে লালবাজারে যায়। দেবেন ও আমার গাড়ি লালবাজারে আটক রইল। তার জামিনেরও মূল্য একই অর্থাৎ চারটে ডাকাতিতে এক লক্ষ টাকা।

আমার জন্য যদিও জামিনের লোক পাওয়া যেত, তবু যার বাড়ির ঠিকানা ভালো জানা নেই সেই দেবেনের জন্য কে এক লক্ষ টাকা জামিনে দাঁড়াবে? সেই বিপদে ছুটে এলেন স্বনামধন্য কমল দে। তিনি কলকাতা শহরের একটি প্রসিদ্ধ মোটর কারখানা 'মোবিলিটি লিমিটেডের' মালিক ছিলেন। তাঁর শহরে বড় বড় ও প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পুলিশের বড় অফিসারদের সঙ্গে তাঁর খুব যোগাযোগ ছিল। তিনি যেমন আমার গাড়িগুলো

খুব যত্ন করে মেরামত করাতেন, তেমনি আবার পুলিশের প্রাইভেট গাড়িও সেই রকম যত্ন করে মেরামত করাতেন। স্বনামধন্য পুলিশ কমিশনার পি. কে. সেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ১৯৫২।৫৩ সালে যেদিন আমাকে ধরেছিল সেই সময় তাঁর মোটর কারখানাও সার্চ করেছিল।

মোবিলিটি লিমিটেড কোম্পানীতে যখন একদিন আমি ও রুবি গাড়ি নিয়ে যাই, তখন আমার গাড়িব ভিতর একটা টয় রিভলবার ছিল। এই টয় রিভলবারটা একটু নতুন ধরনের। এই টয় রিভলবাবের সঙ্গে মুখে লাগাবার ছিপি কিনতে পাওয়া যেত, তাতে বারুদ দেওয়া থাকত। সেই ছিপিটা এই টয় রিভলবারের মুখে গুঁজে যদি ট্রিগার টেপা হোত তবে বেশ শব্দ করে কর্কটা বেরিয়ে যেত। এইটা তাঁর টেবিলে বসে তাঁকে দেখাই। আমাদের অ্যারেস্ট করার পরে পুলিশ যখন মোবিলিটি লিমিটেডে অনুসন্ধান করতে গেল, তখন তাঁকে এই টয় রিভলবার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।

পুলিশ: আপনি সেইটা যে রিভলবার নয়, টয় রিভলবার, তা বুঝলেন কি করে?

কমল: (তিনি খুব গম্ভীর হযে ধীরকণ্ঠে বললেন) আমার নিজের কাছে লাইসেন্স করা পিস্তল এবং বন্দুক আছে।

ব্যাস, তাঁর কথা শেষ হলো আর পুলিশও নত মুখে চুপ করে বসে রইল। মোবিলিটি লিমিটেডেব সব খাতা-পত্তর পাকডাও করে লালবাজাবে ইন্সপেকশনের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে জানানো হলো, তিনি যেন লালবাজাবে গিয়ে তাদের কাছে তাঁর অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে উত্তর দেন। তাঁকে লালবাজারে তিন-চার দিন তিন-চার ঘণ্টা বসিযে রাখার পরও কোন পুলিশ অফিসার তাঁকে তাঁর অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করেন নি। তিনি যেখানে বসে ছিলেন তার আশেপাশে ছোট ছোট পুলিশ কর্মচারীরা বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, তা তিনি নিজের কানে শুনেছেন—'অত বড মোবিলিটি কারখানা ডাকাতির টাকায় হয়েছে।' 'ডাকাতির গাডিগুলো সেখানেই মেরামত হোত।' 'বিভলবার পিস্তলও নাকি সেখানে গোপনে সারানো হোত…ইত্যাদি ইত্যাদি।'

স্বয়ং কমলবাবু আমাকে এইসব কথা বলেছেন; আরও বলেছেন, 'যখন শুনলাম টয় পিস্তলকে তারা রিভলবার সাজাতে যাচ্ছে, তখন আমার কারখানায় আমি একটা রিহার্সাল দিলাম। সবাইকে বললাম, যদি পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করে রুবিদি ও অনন্তবাবু যে রিভলবারটা কমলবাবুর টেবিলের উপরে দেখাচ্ছিল সেটা কে কে

দেখেছ ? এই কথা শোনার পর কেবল বড় মিস্ত্রি এগিয়ে আসবেন। তিনি বলবেন —আমিই দেখেছি।'

আমাকে বললেন, 'আমি বড় মিস্ত্রিকে বললাম, তুমি যা দেখেছ তা সঠিকভাবে বলবে আর দেখাবে।'

এই ব্যবস্থা করার কারণ ছিল, যেন পুলিশ মিস্ত্রিদের ঘাবড়ে দিয়ে তাদের নিজেদের মত করে কথাটি সাজিয়ে বার করে না নেয়।—পি. কে. সেন, সে কি আমায় চেনে না ? কতবার যখন তখন আমার কারখানায় এসেছে। আমি তার কাছে চা খেতে গেছি। বুঝলেন অনন্তবাবু সব পুলিশই এক। আমার এখানে আসতে আমি তাদের সবাইকে বারণ করে দিয়েছি। তাদের ওপর কোন বিশ্বাস নেই।'

আমার, রুবির আর দেবেনের পক্ষে যে জামিনদার দাঁড়াবে, তার প্রচুর সম্পত্তির মালিক হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেকের নামে এক লক্ষ টাকা করে জামিনের মূল্য ছিল। বড়লোক হয়ত ছিল, কিন্তু ফৌজদারী মামলার আসামীদের জন্য কে আসবে ? কমল দে আজ অবশ্য বেঁচে নেই ! তবু তাঁর কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হচ্ছে। তিনি নির্ভয়ে আমার আর দেবেনের জন্য জামিনদার হলেন। রুবির জন্য অবশ্য ভাবনা ছিল না। কারণ তার অনেক আত্মীয়-স্বজনই বড় বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার ছিলেন।

আমার এই অসময়ের বন্ধু, তাঁর কথা দু-কথায় প্রকাশ করে বোঝানো যাবে না। আমার নীরব অন্তরে সব সময় তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

ডাকাতির গল্প তাদের মুখে শুনছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, এ কেমনতর ডাকাতি, যে ডাকাতির জন্য গোবরও প্রয়োজন হয়। আমি বহুকাল আগে ফোর্ট উইলিয়মের ভিতরে গিয়েছিলাম, দুর্গের ভেতরে কী আছে দেখতে। ওর ভেতরে এমন কোন জিনিস নেই, যা নেই। একটা সংরক্ষিত জায়গা আছে, যার মধ্যে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী ছিল, যেখানে ছোটখাট আগ্নেয়াস্ত্র সারানোও হোত আবার তৈরীও হোত। এই স্থানটি সাধারণের দেখার জন্য খোলা থাকত না। যেমন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী ছিল, তেমন এক স্থানে একটা ঘরে দেখলাম অতি তুচ্ছ আলপিন বোঝাই করা আছে। মনে মনে ভাবলাম বন্দুক নয়, সঙ্গীন নয়, অতি সাধারণ আলপিন, যুদ্ধে কোন্ কাজে লাগবে যে, একঘর বোঝাই করে রাখতে হয়। ঠিক তেমনি সাধারণ হিসাবে গেরিলা পদ্ধতিতে পরিকল্পনা ও কাজ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিরূপ প্রয়োজন সেই আন্দাজ না থাকলে 'গোবর প্রয়োগের'

প্রয়োজনও বোঝা যাবে না। আগেই বলেছি সিঙ্গার মেশিনের দোকানের পাশে একটি সোনার দোকানে নিঃশব্দে ও গোপনে ডাকাতি সমাপ্ত হয়েছিল। সেই দোকানটা নিরাপদে খোলার জন্ম তারা গোবর ফেলে রেখেছিল।

পুলিশের ধারণা এই গুপ্ত দলের সভ্যরা কেবলমাত্র ডাকাতি করে টাকা নিয়ে আসার জন্ম শিক্ষিত হয়নি। তাদের শিক্ষণীয় করে তোলা হয় গেরিলা যুদ্ধের কায়দায়। বিশেষ প্রয়োজনে গোবর ব্যবহার করেও লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়।

এটা কি ডাকাতি? না কি বিপ্লবের জন্ম অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে গেরিলা ট্রেনিংও?

পুলিশের কথায় এই সব কটি ডাকাতি আমাদের মনে যথেষ্ট দাগ কেটেছে। আমরা এই সব ডাকাতিকে না পারছি আনন্দমঠের ডাকাতির পর্যায়ে ফেলতে, আবার না পারছি ভাবতে সাধারণ ডাকাতের ডাকাতি। তারপর দেখুন, তারা টাকার গাড়ি থামাবার জন্ম যে কৌশল অবলম্বন করলো, তাও কত অভিনব। রাস্তার প্রসারতা সংকীর্ণ করলো রাস্তার পাশে বাঁশ বোঝাই ছুটো ঠেলা গাড়ি রেখে; তারপর গাড়ি একেবারে নিশ্চল করার জন্ম ড্রাইভারকে পিস্তল দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে চাকাব রোড ব্লক দিল। তাছাড়া সামনের পেছনের চাকাও পাংচার করলো। আমাদেব মনে হয়েছিল এ যেন বিশেষ বাড়াবাড়ি। কিন্তু বাংলাদেশে পুলিশ রিপোর্টে আছে যে, রিভলবাব দেখিয়ে গাড়ি থামাবার পরে ড্রাইভার আকস্মিক ভাবে তীব্র গতিতে গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এই ধরনের অনিশ্চয়তা তারা রাখতে চায়নি। এইসব দেখে আমরা ধরে নিতে পারি এই ডাকাতি সাধারণ ডাকাতদের কাজ নয়—গেরিলা পদ্ধতিতে শিক্ষিত হলে, তবেই সম্ভব। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের ভবিষ্যতে কোন অবস্থাতে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে সেই রকম কর্মসূচী চোখের সামনে নেই। তাই তারা এইসব ডাকাতিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচার করেছে, যে এগুলো অসামাজিক অরাজনৈতিক।

সেই প্রতিধ্বনি বারো চৌদ্দ বছর পরেও তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার মিস্টার পি. কে. সেনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—এই ডাকাতিগুলো অরাজনৈতিক, অসামাজিক।' এই প্রতিধ্বনি আবার শুনতে পাই, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অবলীলাক্রমে প্রেসের লোকদের বলেছেন—আমার মতে অনন্ত সিংহ নন-পলিটিক্যাল।

কেবলমাত্র গালি বর্ষণ করেই আর লেনিনের মূল বক্তব্য প্রকাশ না করে যে, কোন ডাকাতিকে একই ভাষায় প্রকাশ্যে নিন্দা করে এত বড় শক্তিশালী কম্যুনিস্ট

পার্টির দায়িত্ব সম্পন্ন করা যায় না। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে লেনিনের কথার নজির তুলে ধরে যদি ডাকাত ও ডাকাতি ব্যাখ্যা করে পার্টির সভ্যদের কাছে দেখাতেন, তবে অনেক ভালো করতেন। সেই পথে না গিয়ে সোজাসুজি গালি দিয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখলে কেউ তাতে বিশ্বাস রাখতে পারবে না। এই মনোভাব নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ 'অনন্ত সিংহের ডাকাতিগুলোকে দেখেছেন, আর তাঁদের নিন্দার পদ্ধতিতে তাদের অবৈপ্লবিক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। যদি তাই না হোত, সামান্য যে কোন ডাকাতি, ছিনতাই ও পাইপগান প্রভৃতি নিয়ে সাধারণ ডাকাতির কথাও তারা উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের সংবাদপত্রে পরিবেশন করে থাকেন, তবে কেন তাঁদের এত আপত্তি স্টেট ব্যাঙ্কের অভিনব ডাকাতির কথা প্রকাশ করতে। কেন তাঁরা কিছুমাত্র বলেন না স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা? কেন তাঁরা লেখেন না সেই স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে ডাকাতির সময় টেপ রেকর্ডার বেজেছিল? কেন গোপন রাখেন ওঁদের ছাপানো ঘোষণাপত্র সেখানে বিলি করা হয়েছিল? কেন এই দুটো কোর্ট-এগজিবিট থাকা সত্ত্বেও তার বিবরণ দিতে তাঁরা এত কুণ্ঠাবোধ করেন? তাঁরা কি করে সদুত্তর দেবেন এই অবাঞ্ছনীয় মানসিকতার? পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট পার্টির এই সব অর্থপূর্ণ ঔদাসীন্য দিনের আলোর মত প্রতিপন্ন করে তাঁদের আসল চরিত্রটা কি। তাই কি অনন্ত সিং তাঁদের কাছে সমাজবিরোধী ও অরাজনৈতিক?

জোর গলায় বার বার অনন্ত সিংহ অরাজনৈতিক ও তাকে ছাড়া যেতে পারে না বলে কঠোরতা প্রকাশ করলেই কি তাঁদের কমিউনিস্ট সততা বেড়ে যাবে বলে তাঁরা মনে করেন? মিলিটেণ্ট কমিউনিজমকে যে কোন ভাষায় কেবল গালি দিলে কি তা কম্যুনিস্ট সভ্যদের শিক্ষণীয় জিনিস হয়? মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষায় কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে ডাকাতি বর্জনীয়, আর কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য—তা বলা আছে। লেনিন ও স্ট্যালিনের বলশেভিক পার্টিও ডাকাতি করেছে (সেই কথা লেনিন স্বয়ং তাঁর কালেকটেড ওয়ার্কসে ১১ নং ভল্যুমে লিখে গেছেন)। আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সেইসব উল্লেখ করে তারপর বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাতে সাহস করেন না কেন? এইসব লেনিন তাঁর বইতে লিখেছেন বাহান্ন বছর ধরে ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতারা সেগুলো সযত্নে গোপন রেখেছেন। ইতিহাস গোপন রেখে ভুল নীতি চালাবার এইটা সবচেয়ে ভাল উপায় বলে তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু মার্কস-লেনিন-মাওবাদীরা সেই ধরনের ভগ্ন তত্ত্বে বিশ্বাস রাখতে কখনই পারবে না। যদি লেনিনবাদ অব্যর্থ হয়, তবে তা ইতিহাসের

পাতা থেকে মূল তত্ত্ব দেখিয়ে সব লেনিনবাদী কম্যুনিস্টদের কাছে নেতাদের বলার সাহস নেই কেন? গোপন ও বিকৃত করে সত্য কি কখনো নির্ভুল বলে সত্যকার লেনিনবাদী সভ্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? সি. পি. আই. এম নেতারা কোন্ সাহসে সত্য গোপন রাখতে চান? কোন্ সাহসে লেনিনের লেখাও সভ্যদের পড়াতে চান না? তাঁরা জানেন ডেমক্রেটিক সেণ্ট্রালিজমের মহা অস্ত্র তাঁদের হাতে আছে। নেতাদের তত্ত্ব যে ভুল, তা কেউ যদি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁর পার্টিতে স্থান থাকবে না। তাঁদের তত্ত্বের পেছনে এইটা হচ্ছে প্রধান জোর। যার অর্থ হোল পার্টিতে সেণ্ট্রালিজম আছে, কিন্তু ডেমক্রেসি বা গণতন্ত্র নেই।'

আমার লেখা পড়ে স্বভাবতই মনে হতে পারে আমি কেবলই ডাকাতির সমর্থনে বলে যাচ্ছি। সে রকম ভাবলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আমি ডাকাতি সমর্থন করছি না, আর করবোও না। তবে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ প্রত্যেক ডাকাতিকে স্থান, কাল পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখে। আমি এতক্ষণ বলেছি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা এই বিষয়ে একদম উদাসীন। কেবল ডাকাতি হলেই হোল, তাকে নিন্দা করতেই হবে। এই রকম কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের মনোভাবকে আমি এতক্ষণ সমালোচনা করেছি।

এখন ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি। যখন একদিক থেকে এই ধরনের ডাকাতি হচ্ছিল, তখন আমার অতীতের কথা ক্রমাগতই মনে পড়ে যে, আমিই গণেশকে প্রতিবাদ করে বলেছিলাম আর্মারি রোডের আগে ডাকাতির কর্মসূচীকে বাদ দিতে হবে। একবার না, বহুবারই ডাকাতির কথা উঠেছে, আর আমিই সোচ্চার হয়ে ডাকাতির প্রতিবাদ করেছি। আনন্দ গুপ্তের 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহ' বইতে আমিই ভূমিকা লিখেছিলাম। তাতে আমি কারণ দেখিয়েছিলাম যে বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে যদি 'ডাকাতি' একটা বিষয় হয় তবে বৈপ্লবিক কর্মসূচী পরিপূর্ণ করার আগেই শত্রুপক্ষ দলের উপর আক্রমণ চালিয়েই দল ভেঙে দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ নেবে। আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতার ভেতরেই যা ঘটেছিল তা আমি সবার সামনে উপস্থিত করে বলেছিলাম যে, 'আমরা আর ডাকাতি করবো না, আমরা টাকা সংগ্রহ করবো নিজেদের বাড়ি থেকে। তাও হবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে। যে সব সদস্যদের অবস্থা কিছুটা ভালো তারা নিজেদের বাড়ি থেকে হয় গয়না, না হয় টাকা আনবে, কিন্তু যেন দুশো টাকার বেশী বা একশ টাকার কম না হয়। আর একটা শর্ত ছিল— হাতেনাতে ধরা পড়বে না। সন্দেহ করুক, আপত্তি নেই।'

৭

এইভাবে অস্ত্রাগার দখল করার আগে প্রস্তুতি-পর্বে একটা ডাকাতিও আমাদের করতে হয়নি। সেই সময় এই নিয়ে আর একটা চিন্তাধারা ছিল—সশস্ত্র ডাকাতি না করার পেছনে সাহসের অভাব ও দুর্বলতা লুকোনো আছে। তখন বিখ্যাত বিপ্লবী দাদারা যাঁরা আমাদের পরিচালনা করছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই রকম একটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে আমাদের নির্দেশ দিলেন আমরা যেন ডাকাতির পরিকল্পনা কোনমতেই পরিহার না করি। চট্টগ্রাম জেল থেকে ফিরে এসে দাদাদের মধ্যে একজন ডাকাতি করার জন্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বারবার বক্তব্য রেখেছিলেন। আমার ধারণা, এই রকম অভিমতের পেছনে তার ও তাদের এর আগে ডাকাতি করার অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু যুবকদের তীব্র ইচ্ছা ছিল অন্তত একটা ডাকাতি করেও অভিজ্ঞ হবে। আমি অবশ্য এটা বুঝেছিলাম, তাই তা থেকে আমি দলকে নিরস্ত করেছিলাম। কারণ বিপ্লবের স্বার্থে ঐ ধরনের বিপদের ঝুঁকি সেই অবস্থায় নেওয়া যায় না।

যখন ১৮।২০ বছর আগে এই ডাকাতিগুলো সংগঠিত হচ্ছিল, তখন আমার মনে প্রশ্ন এলো—'দলে ডাকাতির কর্মসূচী থাকবে কেন? ডাকাতি করে টাকা খরচ করার আগেই পুলিশের আক্রমণে দল বিধ্বস্ত হবে, বিপ্লবের কোন কর্মসূচীই নেওয়া সম্ভব হবে না।'

যে এক সময় ডাকাতি সম্বন্ধে এত বাধা দিয়েছে, সে আবার এই সময় ডাকাতি করলো কেন? কারণ মার্কসবাদ, লেনিনবাদ পড়ে বুঝেছিলাম যে, বিপ্লবী কর্মসূচী কাজে পরিণত করতে হলে, অর্থের প্রয়োজনে যদি ডাকাতি করা অপরিহার্য হয়, তবে তা করতেই হবে। সেইজন্য আমার 'মত' অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত হোল।

যখন ভবানীপুরে সোনা-রূপোর দোকানে 'নীরব ডাকাতিতে' আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেল না, তারপর ঊষা কোম্পানির দু-লক্ষ টাকা ডাকাতি করে আনার পরিবর্তে জানা গেল মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর সেই ডাকাতিতে

একজন দরোয়ান খুন আর একজন গুরুতর ভাবে আহত হোল, তখন তারা ভাবতে লাগলো উষা কোম্পানির টাকা ডাকাতিটা ঠিক হয়নি যেহেতু তাদের কাছে ঠিক সংবাদ ছিল না কোন্ দিন কত টাকা গাড়িতে যাবে।

অনেক কোম্পানিতেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা যায় কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য। কোন্ দিন কত টাকা যাচ্ছে তা সঠিক জানার জন্য অফিস বা ব্যাঙ্কের মধ্যে তাদের নিজস্ব লোক থাকা প্রয়োজন। এই ধরনের সংগঠন করে, তারপর খবর নিয়ে ডাকাতি করাটা বহুদিন সাপেক্ষ। তাই এর পরিবর্তে তারা কলকাতা শহরে সোনার দোকান বেছে নিল।' এতসব ঘটনা বলার পরে পুলিশ বলল, 'তারা ঠিক করেছিল বিবেকানন্দ রোডের দক্ষিণে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপরে সবচেয়ে বড় সোনার গয়নার দোকানে ডাকাতি করবে। সারা দিনই দোকান খোলা থাকে। সব সময় বাইরে থেকে দোকানের ভেতরটা দেখা যায়। কিন্তু তবু তাদের জানা দরকার কত অলঙ্কারাদি আছে—সেগুলো কোথায় কিভাবে রাখা হয়—কতগুলো আলমারি আছে—কিভাবে সেগুলো খোলা যায়—আলমারির চাবি কোথায়—কার হেপাজতে থাকে—এইসব জানবার জন্য তাদের দলের লোক খদ্দের সেজে জিনিস দেখতে গেছে। কিনতে হলে বেশ টাকা লাগে, তাই ছোটখাট আংটি বা কানের দুল কিনে আনতে যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার মধ্যেই সেগুলো তারা লক্ষ্য করেছিল। এইভাবে তাদের সংবাদ নেওয়ার কাজটা সম্পন্ন করে। এরপর তারা যতগুলো গয়নার বাক্স (হার, চুরি, ব্রেসলেট প্রভৃতি রাখার জন্য) ছিল, তার একটা হিসাব নিল। দুশো তিনশো গয়নার বাক্স তারা কিনেও ফেললো। তাদের দলের কোন একটা বাড়ি ঠিক করলো। সেই বাড়িতে তারা শো-কেস্, আলমারী আর গয়নার ছোট ছোট বাক্স দিয়ে দোকানের মত করে সাজালো। ডাকাতি করার আগে কত তাড়াতাড়ি গয়নার বাক্সগুলো আলমারি আর শো-কেস্ থেকে বার করে তিনটে বড় থলিতে করে বাইরে দাঁড়ানো মোটর গাড়িতে তোলা যায়, সেই প্র্যাক্‌টিস্‌টা তারা করেছিল।

এইটা পড়ে মনে হবে আগেই কিসের জন্য এত খরচ? আলমারী দিয়ে, গয়নার কেস দিয়ে দোকান সাজানো? তারা মনে রেখেছিল হিটলারের পেনজার ডিভিশন দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন বিধ্বস্ত করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ম্যাজিনো লাইন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচ স্থানে ভেঙ্গে হিটলারের মেকানাইজড ও মোটরাজইড ডিভিশন সব ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল।

তা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র তারা পূর্বে নিজেদের দেশে নকল ম্যাজিনো লাইন তৈরী করে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার রিহার্সাল দিয়েছিল বলে। অতবড় ম্যাজিনো লাইন ও জার্মানীর পেনজার ডিভিশন যা করেছে, তা সামান্য ডাকাতির সময়ে কি একই ধরনের রিহার্সালের প্রয়োজন? মহড়ার প্রয়োজন আছে। সীমিত বাস্তব অবস্থার মধ্যেও তারা তড়িৎগতিতে সোনার দোকান লুঠ করে নেওয়ার জন্য রিহার্সাল দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিল।

রিহার্সাল দিয়েছে মাত্র পাঁচজন। গাড়িতে অস্ত্র নিয়ে বাইরে থাকবে একজন, একজন থাকবে দোকানের গেটে আর তিনজন গয়নার বাক্স সব আলমারী ও শো-কেস্ থেকে নিয়ে থলি ভর্তি করে চলে আসবে। ডাকাতির সময় স্থির করেছিল ঠিক সন্ধ্যা আটটায়। তারা প্রথমেই চারজন স্টেন্‌গান ও রিভলবার হাতে দোকানে ঢুকবে। দোকানের মালিক কর্মচারী ও খদ্দেরদের হুকুম দেবে, ‘ভয় নেই। হুকুম মানো। দু-হাত মাথার উপরে তোল। সবাই তোমরা দক্ষিণের কোণের দিকে যাও।…চুপ করে ওখানে বসো। ভয় নেই, পালাতে চেষ্টা করবে না।’

সবাই বিনা প্রতিবাদে তাদের হুকুম মানলো। চারজনে প্রথম মিনিট খানেকের অর্থাৎ ৬০ সেকেণ্ডের মধ্যে ওদের সবাইকে আয়ত্তে আনলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন যেভাবে নির্দেশ দেওয়া ছিল, ঠিক সেইভাবে শো-কেস্ ও আলমারী থেকে গয়না ভর্তি বাকস্‌গুলো বড় থলিতে তুলে নিতে লাগলো। স্টপ ওয়াচ ধরে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। সময়মত কাজ সমাপ্ত করলো। এই তিন মিনিট ডাকাতদের কাছে মনে হচ্ছিল তিন ঘণ্টা। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ভিড়। ঘন ঘন গাড়ি যাচ্ছে। স্নায়বিক শক্তি ঠিক রাখা দুষ্কর। এই ট্রেনিং তারা মানসিক চিন্তায় অনুভব করে শিখেছিল মাত্র। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা একেবারে আলাদা। সেই ট্রেনিং বাস্তব অবস্থাতে হয়নি। প্রচুর সাহস থাকতে পারে, তবু নার্ভ ফেল করা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

তিনটে থলি ভর্তি করে জিনিসপত্র নিয়ে যখন তারা গাড়িতে উঠতে যাবে, তখন দোকানের একজন লোক আর না পেরে শেষের থলিটা ধরে টান দেয়। থলিটা শেষের জনের হাত থেকে খসে পড়ে গেল। সে তখন খুবই নার্ভাস। থলিটা যে ফিরে গিয়ে আনবে, সে সাহস তার হোল না। ওটা ফেলেই সে চলে এলো। এই সময়ের মধ্যে বাইরে লোক জমে গেছিল। ভিড় বাড়ছিল, কিন্তু তখনও সাহস করে প্রতি আক্রমণ করার মত লোক এসে জমা হয়নি। গাড়িতে

উঠে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে যাবে, এমন সময় বিবেকানন্দ রোডের পূর্ব প্রান্ত থেকে একটা বোমা সশব্দে ফাটানো হয়েছিল। ব্যবস্থা ছিল যদি সেই রাস্তা দিয়ে কোন পুলিশ ভ্যান আসতো বা কোন আক্রমণাত্মক পার্টি বাধা দিতে এগোতো, তবে এই রকম বোমা ফাটিয়ে তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা হোত। কোন বিশেষ লক্ষণ দেখে এই বোমাটা ফাটানো হয় নি, তবে সবাইকে ভয় দেখাবার জন্য এইটা ফাটানো হয়েছিল। তাতে কাজ হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিমে বিবেকানন্দ রোডের উপরে তাদের প্রহরী ছিল। সেও প্রয়োজন বোধে পুলিশের ভ্যান আটকাবার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা ফাটাতো। কিন্তু এই আওয়াজ শোনার পরে আর অন্য কোন গণ্ডগোলের কারণ দেখতে পাওয়া গেল না বলে যে সেদিকে পাহারা দিচ্ছিল, তার নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে যাওয়ার কথা এবং এক ঘণ্টা পরে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হওয়ার জন্য নির্দেশ ছিল। কিন্তু দলের এই একজন বিশেষ অভিজ্ঞ নেতা, এই নির্দেশ আর পালন করেন নি। এক ঘণ্টা পরে কেন সেইদিন তার পরদিন, এমন কি পঁচিশ দিন তার পাত্তাই ছিল না।

শুনেছি আপনারা তখন 'আওয়ার স্ট্যাণ্ড' নামে কম্যুনিস্ট বিপ্লবী দল তৈরি করেছিলেন। এই ছোট কম্যুনিস্ট দলটা কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে থেকে এই ধরনের সক্রিয় প্ল্যান নিয়ে কাজ করত। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টিতে এই ধরনের পার্টির মধ্যে পার্টি তৈরি করার কোন লেনিনবাদী নীতি ছিল না। আপনারা পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গোপনে ঐ ধরনের সংগঠন যে করেছিলেন সেটা আবার 'আওয়ার স্ট্যাণ্ড' গ্রুপের মধ্যে সবাই পছন্দ করে নি। আপনাদের ভিতর আপনারা ডাকাতি না করে, নোট জাল করে টাকার সমস্যা মেটাতে চেয়েছিলেন। আপনারা এক টাকার নোট জাল করেছিলেন। ৮০ শতাংশ সেগুলো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তবু চললো না। কেন? তা আপনাদের মুখ থেকে শোনা।

তিনজন করে টীম করেছেন। একজনে টাকা চালাবে অর্থাৎ কিছু জিনিস কিনবে। তার কাছে থাকবে মাত্র একটা টাকা। অচল এক টাকা যে কোন লোকের কাছে থাকতে পারে। তাতে অপরাধ কিছু হয় না। কাজেই জিনিস কেনার সময় যদি সেই নোট জাল বলে কেউ ফিরিয়ে দেয়, তাতে ভয়ের কিছু থাকে না। সেই জন্য একজন লোক ঠিক হোল সে জিনিস কিনবে, আর একটা একটা করে নোট চালাবে। সামান্য জিনিস কিনে নিয়ে বাকী সব পয়সা আর

জিনিসটা তার পেছনে আর একজনকে সে দিয়ে দেবে। তারপর সে তার কাছ থেকে চালাবার জন্য আরেকটা জাল টাকা নেবে। পেছনের লোকটা জিনিস ও টাকা পেছনের তৃতীয় লোককে দিয়ে দেবে। তার কাছ থেকে আবার নতুন জাল এক টাকার নোট হাতে নিয়ে রাখবে সামনের লোককে দেওয়ার জন্য।

আপনাদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও আপনাদের নকল নোট চালিয়ে টাকার সমস্যা মেটানো সম্ভব হয় নি। আমরা সব খবরই রাখি। আপনাদের এক টাকার নোটে একশটা করে তাড়া বাঁধা থাকত। যেমন নাকি ভারত সরকারের নোটে থাকে। সেই রকম তাড়া তাড়া নোট কোন দোকানে চালাতে আপনারা সাহস করেন নি। কারণ ঐ ধরনের তাড়া বাঁধা নোট নিয়ে ধরা পড়লে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু থাকত না। জাল নোটের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা হোতই।

আমাদের সংবাদ আছে সাউথ ক্যালকাটার কোন কাপড়ের দোকানে এক তাড়া জাল নোট নিয়ে গিয়ে একজন ধরা পড়েছিল। যে ধরা পড়েছিল, সে অবশ্য জাল নোট সম্বন্ধে জানতো না। সে এক বাড়ির চাকর। একশটা এক টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল সে রাস্তার উপরে কুড়িয়ে পায়। সেই পাড়ায় কারো বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। যার কাছে জাল নোট রাখা ছিল, সে ভয়ে জাল নোটের বাণ্ডিলগুলো রাস্তার উপর ফেলে দেয়। তারপর সেই পাড়ার একটা বাড়ির চাকর সেগুলো দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসে। সে একটা নোট দিয়ে কী একটা কিনেছিল। কোন রকম বাধা পায় নি। নোটের বাণ্ডিল দেখে জাল নোট বলে তার মনে হয় নি। সে এক টাকার একশটা নোটের একটা তাড়া নিয়ে কাপড়ের দোকানে গেল কাপড় কিনতে। কাপড় কিনে যখন টাকা দিল তখন দোকানদারদের এইসব এক টাকার নোটগুলো জাল বলে মনে হোল। তারা তাকে সেখানে ধরে পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আরও কিছু এক টাকার নোটের বাণ্ডিল পেয়ে গেল। তার স্বীকারোক্তি শুনে পুলিশ বুঝেছিল যে সত্যিই সে সেই টাকা কুড়িয়ে পেয়ে না জেনে বোকার মত বাজার করতে যায়। পুলিশ তাকে নিয়ে আর মামলায় খুব এগোল না। কিন্তু ঐ পাড়ায় জাল নোটের নিশ্চয় কোন আড্ডা ছিল, এটা ভেবে নিয়ে পুলিশ ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবে বলে মনস্থির করেছিল। এই রকম জাল নোটের বাণ্ডিল নিয়ে আরো দু' একটা জায়গায় আপনাদের লোক ধরা পড়েছিল। সব খবরই আপনারা যথাসময়ে পেয়েছেন আর প্রত্যেক বারই

আপনারা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আপনাদের 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডের' সেন্ট্রাল কমিটিতে রোল উঠলো এ আর চলবে না। সোচ্চার হয়ে সেন্ট্রাল কমিটির কয়েকজন তাঁদের দৃঢ় মত ব্যক্ত করলেন নোট জাল করা আর চলবে না। শ্রীআনন্দপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করে বললেন আমি তো জালিয়াতির চার্জে ডকে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না। একজন জালিয়াৎ বলে আমি পাবলিককে ফেস্ করতে পারবো না। আমাদের সংবাদ আপনি নাকি তখন খুব রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তাহলে তোমরা চলে যাও। অনেক শান্তিতে ভালোভাবে কাজ এগোবে। একদিকে একের পর এক জাল নোট নিয়ে আমাদের লোক এদিকে-ওদিকে ধরা পড়ছে, আর সেগুলোকে সামাল দিচ্ছি। তারপর যদিও সামাল দিচ্ছি, তবু পরিচালকবর্গ তাদের 'মরেল' হারাচ্ছেন এবং এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ না দিয়ে বাধার সৃষ্টি করছেন। তা থেকে তাদের চলে যাওয়াই ভাল। আমি হাজার বার জালিয়াত বা ডাকাত বলে ডকে দাঁড়াতে প্রস্তুত আছি। প্রয়োজন বোধে আমাদের তা করতেই হবে।'

পুলিশ তারপর আমাকে আরও মনে করিয়ে দিল আনন্দবাবু আপনাদের সেন্ট্রাল কমিটির সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় আপনাকে উদ্দেশ্য করে এবং আপনার নাম ধরে বলেছিলেন অনন্তদা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কৃষকদের মধ্যে বিনয় রায়ের মত কাজ করতে পারবেন? বিনয় রায় তার থাকা-খাওয়ার কথা না ভেবে যেখানে সেখানে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। আপনি আপনার বুকে হাত রেখে বলুন, আপনি সেভাবে বিপ্লবের কাজ করে যেতে পারবেন? যে উচ্চকণ্ঠে আনন্দ গুপ্ত আপনাকে বলেছিল, আপনি ততোধিক সজোরে নিজের বুকে হাত দিয়ে আনন্দকে বলেছিলেন, সত্যি, আমি তা পারব না। দিনের পর দিন না খেয়ে কৃষকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে নিশ্চয় আমি পারব না। বিড়ি-মজদুরদের সঙ্গে মিশে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের ইউনিয়ন আমি গড়ে তুলতে পারব না। যে কোন কাজ করি না কেন, তা আমার বুঝতে হবে বিপ্লবের পথে তা এগিয়ে দিচ্ছে কি-না। আপনি আরও বলেছিলেন, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন হলে সব কাজই আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারি। কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে না খেয়ে না দেয়ে শুধু ঘুরে ঘুরে কাজ করলেই যে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাচ্ছি তার সঠিক উত্তর বিচার বুদ্ধি দিয়ে যদি বুঝতে না পারি, তবে তা আমি কখনই করতে পারবো না। কৃষকদের মধ্যে কিরকম কাজ বা কি পদ্ধতিতে কাজ বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন তা আগে জানা উচিত।

'আওয়ার স্ট্যাণ্ডের' কমিউনিস্ট গ্রুপ, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের জন্য ভেঙ্গে গেল। তারপর যারা রইল, তারা জাল নোট তৈরী করার কর্মসূচী ছাড়লো না। তারা পাকিস্তানের পাঁচ টাকা নোট জাল করার জন্য চেষ্টা করলো। যাদের জ্ঞান নেই তারা পাকিস্তানের পাঁচ টাকার নোট দেখে মনে করবে তা জাল করা খুব সহজ, কারণ তাতে জল-ছাপ নেই। কিন্তু সেটা সাধারণ প্রেসে ছাপা নয়, ডাই-প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো। ডাই-প্রিন্ট করতে স্টীলের ছাঁচ তৈরী করতে হয়। সে এক দুরূহ ব্যাপার। তবু তারা মনস্থির করলো একবার চেষ্টা করে দেখবে। তারা বহুকষ্টে একজন পাঞ্জাবী এক্সপার্ট জোগাড় করে পাকিস্তানের পাঁচ টাকা নোটের ডাই প্রস্তুত করার জন্য চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত ডাই তৈরী করেছিল। পুরোপুরি ঠিক না হলেও ছাঁচটা প্রায় ৮০।৯০ ভাগ ঠিক হয়। ছাপার প্রেসে যেমন খুব তাড়াতাড়ি ছাপা হয়, ডাই প্রিন্টে তা হয় না। একেকটা নোট আলাদা প্রেসার মেসিনে চাপ দিয়ে তৈরী করতে হয়। ঘণ্টায় খুব বেশী হলেও ৪০।৫০টা নোট হয়।

খুব বিশ্বস্ত স্থানে তারা এই হ্যাণ্ড প্রেস মেসিন বসিয়ে খুব বিশ্বাসী দু'জন ছেলেকে দিয়ে পাঁচ টাকার নোট তৈরী করিয়েছিল। এই নোট পাকিস্তান ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে পাকিস্তানের নোট ভারত সরকারের মূল্যের বিনিময়ে কেনাবেচা হোত। সেই সূত্রে চোরাচালানীদের যোগাড় করা গিয়েছিল যেন এক হাজার টাকার নোট পাঁচশ টাকা নগদ দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু নোট একেবারে ঠিক এক রকম হয়নি, তাই পাকিস্তানের ব্যাঙ্ক সেই সব নোট বাতিল করে দিল। কাজেই যারা সেই সব নোট কিনেছিল, তারা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। তাদের দলে পূর্ব পাকিস্তানে বাড়ি যাদের তেমন কয়েকটা ছেলেকে বাছাই করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল এই পাঁচ টাকার নোট চালাবার জন্য। কিন্তু তারাও চালাতে গিয়ে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর তাদের সব চেষ্টা যখন নিষ্ফল হোল, তখনই বিপ্লবের কাজে টাকার প্রয়োজন মেটাতে তারা ডাকাতির পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হোল।'

বিপ্লবের কাজে টাকার অভাব মেটাতে আপনাকে যখন আবার ডাকাতির পথ নিতে হোল, তখন আপনি নাকি বলেছিলেন, "আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি হয় আমাদের ডাকাতির পথ নিতে হবে, নইলে বিপ্লবের সাংগঠনিক প্রোগ্রাম যা আমাদের কাছে অপরিহার্য, তা বর্জন করতে হবে। আপনাদের কার কি মত, তা আমি জানি না; তবে টাকার অভাব যখন পূরণ করতেই হবে,

তখন ডাকাতির পথ নিতে আমি অন্তত পিছুপাও নই। আমরা লেনিনের বলশেভিক পার্টির ইতিহাস পড়েছি। আমরা কে না জানি লেনিন এবং স্ট্যালিন পার্টিতে টাকার সমস্যা মেটাবার জন্য ককেশীয় রাজ্যে টিফ্‌লিস শহরে একটা বড় রকমের ডাকাতি করার প্ল্যান করেছিলেন, আর তাঁদের অত্যন্ত বিশ্বাসী কমরেডদের দিয়ে তা সংগঠিত করিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে দু'লক্ষ রুবলসের নোট পান। তা জার্মান ও প্যারি শহরে চালাবার ব্যবস্থাও করেন। কমরেড লিটভিনভ প্যারিসের ব্যাঙ্কে ডাকাতির নোট চালাবার সময় ধরা পড়েছিলেন। মস্কো পার্টি এগারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার রুবল্ ডাকাতি করে সংগ্রহ করে। এই সব লেনিনের লেখা কালেকটেড ওয়ার্কসে ১১নং খণ্ডে ২১৫-১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। লেনিনের জীবনীতে গ্রন্থকার ডেভিড এই ডাকাতির বিবরণ দিয়েছেন। গভর্নমেণ্ট ট্রেজারি থেকে এই টাকা একটা গাড়িতে তোলা হয়। পুলিশ হেপাজতে সেই টাকা টিফ্‌লিস শহরে এক পোষ্ট অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর সামনে একটা গাড়িতে মিলিটারী, পেছনে আর একটা গাড়িতে ককেশীয় সৈন্য ছিল। এই কনভয় যখন টাকা নিয়ে টিফ্‌লিস শহরের মাঝামাঝি এলো, তখন বিপ্লবীরা একটা খুব শক্তিশালী বোমা ফাটালো। এত জোর শব্দ হয় যে, সেই শব্দের চোটে এক মাইলের ভিতরে যতসব কাঁচ লাগানো জানলা-দরজা ছিল, সব কাঁচ চুরমার হয়ে গেল। সেই সময় রাস্তার উপরে 'নিরীহ ভদ্রলোকবেশী' যুবকদের রিভলবার গর্জন করে উঠলো। সব মিলিয়ে অবস্থা এত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে, পুলিশ ও মিলিটারী যারা টাকা গার্ড দিয়ে যাচ্ছিল, তারা যে যেখানে পারে পালিয়ে গেল। আর টাকার ব্যাগগুলো ম্যাজিকের মত উধাও হয়ে গেল। ঘটনাস্থলে ডাকাতদের একজনও ধরা পড়েনি। তারা বেমালুম টাকা নিয়ে সরে পড়েছিল। সেই টাকা দু'তিন মাস পরে জার্মানিতে চালাবার সময় কেউ কেউ ধরা পড়ে এবং কমরেড লিটভিনভ স্বয়ং ডাকাতি হওয়া ক'টা রুবলের নোট চালাবার সময় ধরা পড়ে গেল।"

আমার মনে হয়, আমাদের এখানে কমিউনিস্ট পার্টির বেশীর ভাগ সভ্যরা এই তথ্য জানেন না। আর জানলেও তা জানেন বিশেষ কয়েকজন নেতা। যদি পার্টির সভ্যরা এইসব তথ্য ও লেনিনের নিজের লেখা পড়তো, তবে কি ডাকাতির জন্য অনন্ত সিংহকে অরাজনীতিক লোক বলে আখ্যা দিতে সাহস করত? কমিউনিস্টরা এখানে গর্জন করে উঠবেন লেনিন যে সময় ও যে পরিপ্রেক্ষিতে ডাকাতি করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন, সেই পরিস্থিতি কি পশ্চিম বাংলায় ছিল যে, সেই

নজির দেখিয়ে অনন্ত সিং ডাকাতি করেছে? দুটো জিনিস বুঝতে হবে। সময়োপযোগী হলে ডাকাতি করাটা কি সমাজবাদ-লেনিনবাদ সমর্থন করে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিশেষ ক্ষেত্রে যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ডাকাতি করাটা সমর্থন করে তবুও কি—বিশেষ ক্ষেত্রে যখন অনন্ত সিং ডাকাতি করেছে সেটা সমর্থনযোগ্য?

এইভাবে যদি পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্লেষণী চোখ দিয়ে জিনিসটা দেখতো তবে আমার বলার কিছু ছিল না। কিন্তু যখন দেখি, তারা বলে থাকেন বিপ্লব করবেন, অথচ লেনিনের আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী বৈপ্লবিক সংগঠন করতে প্রস্তুত নন, তখন তাদের সেই ধরনের মানসিকতাকে উন্মোচন না করে পারা যায় না।

আমি তবে কি চাই? বিপ্লবের নামে লেনিনের শিক্ষার অজুহাতে ডাকাতি ও ভায়োলেন্স প্রচার করতে চাইছি? আমি অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি বাস্তব অবস্থা ডাকাতির অনুকূলে ছিল কি না, সে বিচার করতে চাইনি। বিপ্লবের কাজের প্রয়োজনে টাকার প্রয়োজন ছিল, আর সেই টাকা আমাদের শক্তিতে জোগাড় করার অন্য কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য গত্যন্তর না দেখে আমরা আওয়ার স্ট্যাণ্ড গ্রুপে ঠিক করেছিলাম ডাকাতি হবে। ডাকাতি ছাড়া টাকার সমাধান হবে না। তবু আমরা ডাকাতি করব না, এ কোন লেনিনবাদী যুক্তি নয়। তাই শত বাধা সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলাম। যে কোন উপায়ে হোক টাকার প্রয়োজন আমরা মেটাবো।

এই আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যারা ছিল, তারা আগের সবাইকে বিশ্লেষণী চোখে বিচার করে দেখেছিল। এই শেষের সিদ্ধান্তটা 'আওয়ার স্ট্যাণ্ডের' কর্মসূচীকে রূপ দিতে গেল। আমরা আমাদের কর্মসূচীকে খুব গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। যারা চলে গেছে, তারা যেন কোন মতেই বুঝতে না পারে যে, আমরা অর্থ সংগ্রহের নতুন পথ গ্রহণ করছি। আমরাও টিফ্‌লিস করবো, আর সেই টিফলিস সফল করবো। টিফ্‌লিস বলতে সেই টিফ্‌লিসের মত ডাকাতিকে বোঝাতাম। দলের নিরাপত্তার জন্য আমরা 'টিফ্‌লিস' শব্দটাকে ঘুরিয়ে বলতাম 'ফ্লিটস'। এই বিষয়ে যেভাবে সতর্কতা নিই, আমাদের সর্বশেষ স্তরের অনেকগুলো বিষয়ে সেইভাবে সতর্কতা নিয়েছি। যেমন আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্মনাম দেওয়া ছিল—যেমন নাকি এক টাকার জাল নোট চালিয়ে অর্থ

সংগ্রহ করার সময় তার পরের পর্যায়ে পাকিস্তানের পাঁচ টাকায় জাল নোট প্রস্তুত ও চালাবার সময়। সেই সময়ও আগের লোক সবাই ছিল না। আর যখন ডাকাতি করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা নতুন ভাবে কর্মক্ষেত্রে নামি, তখন আমাদের লোক আরও কমে গেল। যখন মুষ্টিমেয় ক'জন লোক ডাকাতির প্ল্যান করার জন্য ব্রতী হোল, তখন তাদের গোপনীয়তা আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল; তবু যদি জানা লোক তাদের মুভমেণ্ট দেখে, তবে তারা অন্তত তাদের সন্দেহ করতে পারতো। যেমন নাকি যদি একটা মোটর গাড়ি তাদের মধ্যে কেউ চালাত, তবে তাকে তারা সন্দেহ করে নিত যে ওরা বসে নেই, ওরা কিছু একটা করছে। তবু সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যাকে আমরা খুব সন্দেহ করতাম, সে আমাদের ফোর্টিন ফোর্ট হিন্দুস্থান গাড়িটা একজনের হেপাজতে দেখতে পায়। তখনি বুঝেছিলাম ডাকাতির ক্লু, পুলিশের কাছে রয়ে গেল। এই বুঝে আমরা আর যা সতর্কতা নেবার তা নিয়েছিলাম। যেমন ডাকাতির সময় এই গাড়ি প্রথম সারিতে নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করে ব্যবহার করা হয়েছে।

'পুলিশ যে এই গাড়ির ক্লু দিয়েই অনুসন্ধান শুরু করেছিল, তাতে সন্দেহ ছিল না। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ডাকাতি করে ফিরে আসার সময় দোকানেই তারা একটা বড় থালা ভর্তি সোনার গয়না ফেলে আসে। সোনার গয়না বিক্রি করলে ওরা হয়ত অনেক বেশী টাকা পেত, কিন্তু গয়না বিক্রি করতে যে প্রচুর সময় লাগে, সেই সময় তারা ব্যয় করতে পারত না, তাই তারা নিজেরাই গয়না গালিয়ে সোনা করে বিক্রি করেছিল। যে দু'টো থলি ভর্তি গয়না তারা নিয়ে আসে, তা তারপরের দিনই গলিয়ে ফেলে সোনা বিক্রি করে ৬০ হাজার টাকার মত পেয়েছিল। ফেলে আসা থলির গয়না গালিয়ে সোনা বিক্রি করলে ৩০।৪০ হাজার টাকার বেশী পাওয়া যেত না। এই ৩০।৪০ হাজার টাকা যদি তাদের থাকত, তবে হয়ত আশু কাজের বাজেটটা তারা সামাল দিতে পারত। কিন্তু এই ৩০ ৪০ হাজার টাকা কম হওয়াতে তারা আর একটা ডাকাতি খুব অল্প দিনের মধ্যে করতে বাধ্য হয়েছিল।' তাই আমাদের সংবাদ আছে, 'তারা আর একটা সোনার দোকান লুঠ করার জন্য প্রস্তুত হলো। সেই দোকানটা সুরেন ব্যানার্জি রোডের উপরে ছিল। বেশ বড় দোকান। সন্ধ্যে থেকে আলোয় দোকানটা ঝলমল করে, খদ্দেরদেরও বেশ ভিড় থাকে। আর সুরেন ব্যানার্জি রোডের উপর পথিকের সবসময় দারুণ ভিড় থাকে। সব সময় গাড়ি চলাচল করে। প্রথম

দৃষ্টিতে কেউ ভাবতেও পারবে না তেমন জায়গায় ডাকাতি হতে পারে। কিন্তু তারা সেই দোকানটা লুঠ করবে বলে মনস্থ করলো।

মনে হবে এরকম ভিড়ের মধ্যে দোকান ঠিক করেছিল কেন? তার অনেক কারণ। সংবাদ অনুসারে তারা হয়ত বুঝেছিল এই দোকানে অনেক বেশী টাকার গয়না পাবে। তাছাড়া লোকের ভিড় যেমন অসুবিধা সৃষ্টি করে, তেমনি সেই ভিড়ের সুযোগও নেওয়া যায়। পশ্চিম বাংলায় স্বদেশী যুগে অনেক ডাকাতির ইতিহাস সেই ডাকাতদের জানা আছে; জমিদার বাড়িতে নামকরা যাত্রাগান হবে তা খুব প্রচার হয়েছে। যাত্রাগান দেখার জন্য বিকেল থেকে লোক জমতে শুরু করেছে। যাত্রাগান শুরু হবে রাত ন'টা দশটা'র সময়। সে সময় মেয়ে-বৌ-গৃহিণী অনেক গয়না পরে যাত্রা দেখতে আসতো। বিপ্লবী স্বদেশী ডাকাতরা কোনদিনই মেয়েদের অপমান করেনি। তাদের প্রত্যেকের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল, যেন মেয়েদের প্রতি কোন সম্মানের ত্রুটি না হয়। শ্রদ্ধের ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাসে লিখেছেন, ঢাকা ডিষ্ট্রিক্টে আবদুল্লাপুর গ্রামে ডাকাতি হয় যখন যাত্রাগান চলছিল। স্বদেশী ডাকাত দলের চারজন রিভলবার হাতে আসরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে সবাইকে বলে, 'যে যেখানে আছেন, চুপ করে বসে থাকুন। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না।' শত শত লোক মুখ বন্ধ করে ভয়ে সেখানে বসে রইল। স্বদেশী ডাকাত পার্টির কয়েকজন বাড়ির মেয়েদের ও প্রতিবেশী যারা এসেছিলেন তাদের কাছে রিভলবার উঁচিয়ে বললেন, 'আপনারা আপনাদের গয়নাগুলো আমাদের খুলে দিন। স্বদেশী কাজের জন্য এগুলো চাইছি।' একটা প্রতিবাদও হোল না। মহিলারা গয়না খুলে দিলেন। বাড়ির ভেতর থেকে যা নগদ টাকা ছিল, তাও এনে দিলেন।

১০

লোকের ভিড় কোন একটা সমস্যা নয়। পিস্তল ও স্টেনগান হাতে ঠিকমত আদেশ করতে পারলে, তারা আদেশ অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু প্রথমেই যদি বোঝে তাদের রক্ষা নেই, গুলি করে মেরে ফেলা হবে, তবে কখনই নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় না। সবাই প্রাণ বাঁচাতে অস্থির হয়ে ওঠে। যতীন মুখার্জির সময়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিস ডাকাতি হয়। তাঁরা পোস্ট-অফিসে ঢুকেই গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেননি। তাঁরা ভিতরে ঢুকে গেলেন। হাতে রিভলবার। একজন লাফিয়ে টেবিলের উপরে উঠলেন এবং রিভলবার দেখিয়ে সবাইকে হুকুম দিলেন, 'চুপ করে বসে থাক কোন ভয় নেই।' তাঁরা তাই করলেন। বিপ্লবী ডাকাতরা পোস্ট অফিস লুঠ করে টাকা নিয়ে গেল।

কলকাতাতে ওদেব যে ক'টি ডাকাতি সেই সময়ে হয়েছিল, তাতে প্রকৃত সমস্যা এটার মত আগে দেখা দেয়নি। যে সময়ে ডাকাতি হওয়ার কথা, সেই সময়টাতে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পুলিশ ভ্যান যে কোন দিক থেকে, বিশেষতঃ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রায় চলে যায়। এই পুলিশ ভ্যানের আওতা থেকে এইস্থান ডাকাতিব সময় মুক্ত রাখার জন্য তাদের ল্যাণ্ড-মাইন ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হয়, আর ডাকাতি হওয়ার পর সুগম পথে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকটা গাড়ির ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল।

রাস্তায় যে কোন সময় একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাবে, সেই রকম ভরসা করে ডাকাতি করতে যায়নি। ট্যাক্সি পেতে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করেন। যে ধরনের গাড়ি তারা চালাতে অভ্যস্ত, সেই ধরনের ট্যাক্সি তারা আগে থেকে ভাড়া করে। রাত আটটায় 'ডাকাতির সময়' স্থির হয়েছিল, তাই তাদের একজন ট্যাক্সিটা বিকেল চারটে-পাঁচটার সময় ভাড়া করেছিল। তারপর এই ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা বড় স্যুটকেশ, ছাতা, বালতি প্রভৃতি কিনেছিল। এইসব জিনিস নিয়ে ট্যাক্সিটাকে একটা গলিতে দাঁড় করিয়ে সে কোন কাজের অজুহাতে সেখান থেকে চলে গেল এবং কতক্ষণ

বাদে ফিরে আসলো। এইভাবে দু'জায়গায় মহড়া দিল। তৃতীয় জায়গাটা হচ্ছে সুরেন ব্যানার্জি রোডে সোনার দোকানের কাছে দক্ষিণ দিকে কোন এক গলিতে যদি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, আর ডাকাতরা যদি নিজেদের মোটরযোগে পালাতে না পারে, তারই জন্য এই ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা রাখে যেন ডাকতরা ছুটে এসে এই ট্যাক্সিটা করে পালিয়ে যেতে পারে।

এই ডাকাতি ঘটে যাওয়ার পরে যখন পুলিশ অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছিল, তখন দেখল ঐ ট্যাক্সিতে জিনিস রয়েছে, কিন্তু বাবু আর ফিরে আসেনি। অত জিনিস রেখে বাবু কেন চলে গেলেন—কেন ফিরে এলেন না? ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু ডাকাতদের কাছে এই স্থানে এইরকম একটা ট্যাক্সি মোতায়েন রাখা খুবই আবশ্যক ছিল। বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করে তারা আগে থেকে বুঝেছিল যে, যদি পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে পুলিশ আসে, আর পাবলিক উত্তেজিত হয়ে তাদের গাড়ি ঘেরে বা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তাদের সেই ব্যূহ থেকে পালাবার জন্য এই রকম একটা ট্যাক্সি ওই জায়গায় থাকা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।'

এইসব ব্যবস্থা ঠিক করে তারা গাড়ি নিয়ে সন্ধ্যা আটটায় সময় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। আলোকসজ্জায় দোকান ঝলমল। খদ্দেরের ভিড়, কর্মচারীরা ব্যস্ত। ড্রাইভার গাড়িতেই রইল। বাকী পাঁচজন গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকেই রিভলবার তুলে ধরলো। তাদের মধ্যে একজন বজ্র কণ্ঠে হুকুম দিল, 'ভয় করবেন না। আমরা বিপ্লবী, দোকান লুঠ করবো। আপনারা হাত তুলুন। ঐ কোণার দিকে গিয়ে চুপ করে বসুন। পাঁচজনের মধ্যে একজন দরজার সামনে গার্ড দিচ্ছিল। আর চারজন ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কাছে পজিশন নিল। সেদিক থেকে তারা দোকানের সবাইকে হুকুম দিয়ে পূর্ব দিকের কোণে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন তৎপরতার সঙ্গে তাদের বড় বড় থলিতে গয়নার বাক্সগুলো তুলে নিল। দোকানের কর্মচারীদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে পেছনের দিকে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি নির্ধারিত পথে বিনা বাধায় বেরিয়ে গেল। তবু যে ল্যাণ্ডমাইনটা দোকানের পশ্চিম দিকের রাস্তায় পুলিশ ভ্যানকে রোখার উদ্দেশ্যে ফাটাবার জন্য ছিল, সেইটা যদিও নিয়ে আসার কথা ছিল, তবু তা না করে সেখানে ফাটিয়ে দিল। এই ল্যাণ্ডমাইনটা বিশেষ ধরনে তারা নিজেরা প্রস্তুত করেছিল। দূর থেকে ইলেকট্রিক সুইচ টিপলে সেটা ফুটপাতের সংলগ্ন স্থান থেকে একটু এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে যাবে আর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে

সেটা ফেটে পড়বে। রাথার সুবিধার জন্য ফুটপাত ঘেঁসে ল্যাণ্ডমাইনটা রাস্তার উপরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, পুলিশের গাড়ি রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাবে। কাজেই সেটা তৈরী হয়েছিল এইভাবে—প্রথম একটা ছোট বিস্ফোরণের পরে রাস্তার মাঝখানে যাবে, আর তারপরে বিরাট বিস্ফোরণ হবে। এইদিকে পুলিশ ভ্যানের গতি রোধ করার জন্য এই ধরনের ল্যাণ্ডমাইন রাখে। আরেকটা এই ধরনেরই ল্যাণ্ডমাইন তালতলার রাস্তার উপরে ফুটপাত ঘেঁসে রাখা হয়।

দু'জনের উপরে নির্দেশ ছিল, ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পরে বিশেষ সিগন্যাল মোটর হর্নে শুনে তারা ল্যাণ্ডমাইন নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু, এমনই দুর্ভাগ্য, তারা কেউই ল্যাণ্ডমাইন ব্যবহার না করার গুরুত্বটা উপলব্ধি করেনি। তালতলায় যে ছিল, সে ল্যাণ্ডমাইনটা না ফাটিয়ে আস্ত রেখে চলে আসে, আর পশ্চিমে যে ছিল, সে বিনা প্রয়োজনে ফাটিয়ে দিয়ে চলে আসে। তারা পুলিশকে বুঝতে দিয়েছিল এই ডাকাতরা ল্যাণ্ডমাইন ব্যবহার করেছে।

১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা এই ধরনের ল্যাণ্ডমাইন প্রথম আবিষ্কার করেছিল। সেই ল্যাণ্ডমাইন দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান, জেল ও উচ্চ মহলের সরকারী কর্মচারীদের ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন প্ল্যান করেছিল। সুরেন ব্যানার্জি রোডে সোনার দোকানের ডাকাতিতে সেই ধরনের ল্যাণ্ডমাইন ব্যবহৃত হয়েছে, আর একটি ধরাও পড়েছে। তা দেখে পুলিশের আর সন্দেহ রইল না যে, তখনকার কোন সক্রিয় ব্রেন এই ডাকাতির পেছনে কাজ করছে। কাজেই পুলিশ সহজে ধরে নিল, এই কাজ অনন্ত সিং ছাড়া আর কেউ করে নি।

অনন্ত সিং-রা যখন ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম স্বদেশী ডাকাতি করতে যাচ্ছিল তখন তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা রিভলবার ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু, পিস্তল ব্যবহার করবে না। কারণ পিস্তলের কার্তুজের খোল ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ছিটকে পড়ে। আর সেই খোল যদি তল্লাসী করে পুলিশ হস্তগত করে, তবে তারা বুঝে ফেলবে স্বদেশীরা আবার বহুকাল পরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ডাকাতি শুরু করেছে। স্ট্র্যাটেজি হিসাবে সরকারকে এই ধারণা পোষণ করতে দেওয়া উচিত নয় বলেই তারা ঐ ধরনের সতর্কতা নিয়েছিল।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত আর কোন প্রমাণাদি না পেয়ে তাদের চরের কাছে যাদের সম্বন্ধে জেনেছিল, তাদের সোজাসুজি অ্যারেস্ট করলো, আর তাদের প্রাইভেট মোটর গাড়িও পুলিশ পাকড়াও করলো। শহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল।

কিন্তু পুলিশ একটা পিস্তল, রিভলবার বা স্টেনগান হাজির করতে পারলো না। তারা লুঠের গয়নাও কোর্টে দাখিল করতে পারে নি। যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের লালবাজারে বহু রকম কষ্ট দিয়ে আর রাতের পর রাত জাগিয়ে রেখে মুখ থেকে স্বীকারোক্তি পেতে বিফল হয়। তবু পুলিশকে আদালতে হাকিমের কাছে তাদের উপস্থিত করতে হয়েছিল। কিন্তু, জামিনের দরখাস্তের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্যও পুলিশের হাতে তেমন কোন তথ্য ছিল না। কাজেই তারা সবাই জামিন পেলেন। সরকারী পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা আর রুজু করা গেল না। পুলিশের এই দারুণ অক্ষমতার জন্য ওপরওয়ালা তাদের অনেককে বদলী ও নিম্নপদে বহাল করেছিল। এইসব অফিসারদের মধ্যে স্বনামধন্য দেবী রায় ভুক্তভোগী। তিনি হয়ত তখন থেকেই বদলা নেবেন বলে মনস্থির করেছিলেন।

ঊষা কোম্পানী ও তিনটে সোনার দোকান লুঠ হওয়ার পরে আমি অভিযুক্ত হই। চার মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও এই চারটে ডাকাতির বাস্তব তথ্য পুলিশ যোগাড় করতে পারলো না। কোন স্বীকারোক্তি বা রাজসাক্ষী তাদের হাতে ছিল না। কোন লুঠ হওয়া মাল বা ডাকাতদের রিভলভার, পিস্তল কিছুই পুলিশ আদালতে উপস্থিত করতে পারেনি। কাজেই মামলা খারিজ হয়ে গেল। চারমাস হাজতবাসের পর মুক্তি পেয়ে বাড়ি এলাম।

বাইরে এসে মনে হোল অবস্থার ভয়ানক পরিবর্তন হয়েছে। আগের অবস্থাতে আর কেউ নেই। নতুন অবস্থাতে নতুন উদ্যমে কাজ করতে হবে। আমি বুঝেছিলাম তাদের মধ্যে সেই উদ্যমের অভাব নেই। চারটে ডাকাতিতে আমাদের অতজনকে ধরে ফেলার পর পুলিশ ভেবেছিল তাদের সবাইকে একেবারে অচল করে দেবে। কিন্তু, তা হওয়ার নয়। এই রকম নিদারুণ অবস্থা কল্পনা করে নিয়ে তার বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য ধরা পড়ার আগে থেকেই আয়োজন করছিল। আমার আরও সংবাদ ছিল, আমি জেলে থাকতেই তারা সেই ধরনের পরিকল্পনা করে কাজও শুরু করেছিল। তাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী এও জানা যায় যে, তারা জেলখানা ও বাইরের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রেখেছিল। এই যোগসূত্র ক্রমেই সবল হয়ে উঠেছিল। তাদের বাইরের ও ভিতরের অংশ সাংকেতিক চিঠির বিনিময়ে মানসিক জোর অব্যাহত রেখেছিল এবং তাদের সুচিন্তিত কর্মসূচীকে রূপ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা বহু পরিশ্রম করে অনেক খোঁজাখুজির পরে একটা ডজ্ গাড়ির পিক্আপ্ ভ্যান কিনেছিল। এই কেনাটা

খুব সহজ হয়নি, কারণ কে কিনবে তার আর্থিক অবস্থা কি এবং কি ব্যবসার জন্য কিনবে, সেইসব আগে ঠিক করেছে। তারপর টাকার সংস্থান যা ছিল, তারই মধ্যে এই ভ্যানটা কেনা ছাড়া উপায় ছিল না।

আর্মাড কার অর্থাৎ লোহার বর্ম দিয়ে তৈরী গাড়ির মত একটা গাড়ি তারা নিজেরা তৈরী করতে চাইছিল। গাড়ি কেনা হোল। তারপর সেটা নিজেদের কোন প্রাইভেট গ্যারেজে রেখে এক ইঞ্চি, সওয়া ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি লোহার চাদর দিয়ে ফিট্ করা হোল। যে সব স্থানে শত্রুর গুলি এসে লাগার সম্ভাবন বেশী, গাড়ির সে সব স্থানে সবচেয়ে পুরু লোহার চাদর দিয়ে ঢাকা হোল। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন যেন রাইফেলের গুলিতে নষ্ট হয়ে না যায় সেই জন্য সেইসব অংশকে পুরু লোহার পাত দিয়ে ঢাকতে হয়েছিল। ড্রাইভার যেন গুলিবিদ্ধ না হয়, তার জন্যও প্রয়োজন অনুযায়ী পুরু লোহার চাদর ব্যবহার করা হয়। সেইভাবে হিসেব করে গাড়ির বডিও লোহার চাদর দিয়ে ঠিকমত ফিট্ করতে হয়েছিল। চাকা কত খানি পযন্ত ঢাকা যাবে এবং তা ঢাকলে কলকাতার রাস্তার উপর দিয়ে চলার কোন অসুবিধা হবে না, সেরকম বুঝে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। অনেক মাপঝোক করা হয়েছিল আর সেই হিসাবে লোহার পাতকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। সেগুলোকে ফিট্ করার জন্য নাট্‌বোল্টও সংগ্রহ করতে হয়। এই সমস্ত লোহার পাতগুলো খুলে রেখে দেওয়া যেত। আবার শেষ মুহূর্তে এগুলোকে লাগিয়ে নিয়ে কাজে যাওয়া যেত। লোহার চাদরে মোড়া গাড়ি অনেক ওজন হয়ে গেল, তাছাড়া ভেতরে ছয়জন লোক আর ড্রাইভার। কাজেই ইচ্ছে করলেই অনেক পুরু পাত দেওয়া যেত না। এই আর্মাড কারের ভেতর চারটে বড় ধরনের ল্যাণ্ডমাইন ছিল। এই ল্যাণ্ডমাইন টাইম বোমার সাহায্যে ফাটাবার ব্যবস্থা ছিল। ল্যাণ্ডমাইনের প্রত্যেকটার ওজন আধ মণের কম নয়। যে ল্যাণ্ডমাইনটা সবচেয়ে জটিলভাবে তৈরী ছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—ল্যাণ্ডমাইনের উপর ঘড়ি বসনো ছিল; সেকেণ্ডের কাঁটা যেন ঘুরতে না পারে, তার জন্য পিন দিয়ে আটকে রাখার ও উপর থেকে সেই পিন খুলে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। পিন খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেকেণ্ডের কাঁটা চলতে শুরু করত, ল্যাণ্ড-মাইনটা যেখানে ফাটানো দরকার সেখানে রেখে এই সেকেণ্ডের কাঁটার পিনটা সরিয়ে ফেলে ছুটে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসা যেত; আধ মিনিট পর সেটা বার্স্ট করার কথা। প্রথম বার্স্টে চারটে ছোট ছোট বম ছিট্‌কে পড়বে, আর তা ফাটবে, এই ফাটার দশ সেকেণ্ড পরে প্রধান বিস্ফোরণ হবে যখন ল্যাণ্ডমাইনটা সজোরে

ফেটে পড়বে। এই ভাবে সেই ল্যাণ্ডমাইনটা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যাতে প্রথম বিস্ফোরণের শব্দে মানুষ দূরে সরে যায়, তারপর রাস্তা খালি হওয়ার পর প্রধান বিস্ফোরণ হবে। আর একটা তৈরী হয় ঘড়ির কাঁটা চালু করার দশ সেকেণ্ড পরে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য; তৃতীয়টার বেলায় সেই বম্‌টাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ি তার ফেলে ফেলে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে যাওয়ার পর ইলেক্‌ট্রিক সুইচ টিপলে বিস্ফোরণ ঘটত। চতুর্থ ল্যাণ্ডমাইনটাও একই রকম ছিল। কিন্তু তার মধ্যে কয়েক পাউণ্ড পেট্রোল জাতীয় দাহ্য পদার্থ ছিল। এই দাহ্য পদার্থের ভেতরে তুলোর বল ছিল (বিস্ফোরণের পর তুলোর বল আগুন ছড়ায়)। এই আর্মাড কারের ভেতরে কাঠ কাটার জন্য একটা বিদ্যুৎচালিত চক্রাকার করাত ছিল। বড় কাঠের খুঁটি দিয়ে যদি রাস্তা বন্ধ থাকে, তবে তা কেটে ফেলে গাড়ি যাওয়ার পথ করা যায়। পুলিশের ভ্যান প্রভৃতিকে ল্যাণ্ডমাইন দিয়ে বাধা দিয়ে, তারপর স্বল্প সময়ের মধ্যে এইভাবে খুঁটি কেটে ইডেন গার্ডেনের পথে আমাদের গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যই এই করাতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মাপজোক নিয়ে খুঁটি পুঁতে ঘড়ি ধরে অন্য জায়গায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করেছি। স্টপ-ওয়াচ ধরে দেখেছি বিদ্যুৎ-চালিত চক্রাকার করাতে এক একটা খুঁটি কাটতে দশ-বারো সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। গাড়িতে বোঝাই ছিল স্টেনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, পিস্তল, রিভলবার আর ছিল চার গ্যালনের পেট্রোলের টিন। এই সুসজ্জিত বর্মা ঢাকা গাড়িটা আসল কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, তা বলে না দিলে পুলিশ ধাঁধায় থাকত। যেদিন ঘটনা ঘটবে সেদিন সকাল থেকেই প্রস্তুতির কাজ চলেছিল। এই সব জিনিস সময় ধরে এই গাড়িতে তোলা হয় এবং আক্রমণকারীরা প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে উঠে বসে সকাল নটা থেকে। গাড়ির ভেতরটা খুবই গরম ছিল। ঘটনাস্থলে গাড়িটা যাবে বেলা বারোটার সময়। তার আগে গাড়িটা ঘটনা স্থল থেকে অনেক দূরে থাকবে। ঠিক হয়েছিল সকাল নটা থেকে গাড়িটা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের রাস্তায় সারকুলার রোডের দিকে থাকবে। ঐ রাস্তাটা অপেক্ষা-কৃত নির্জন।

আমাদের সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা ছিল হেড-কোয়ার্টারের নিরাপত্তা কিভাবে বজায় রাখতে পারি। পুলিশ সেইসব ডাকাতির কোন কিনারা করতে না পেরে আনুসঙ্গিক অনেক কারণবশতঃ আমাকে এবং অন্যান্য অনেককে অ্যারেস্ট করেছিল। জামিনে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এলেও পুলিশ আমাদের প্রাইভেট গাড়ি

সব সময় অনুসরণ করতো। কোথায় যাই তারা তার সংবাদ রাখতে যে চেষ্টা করতো, তা বুঝতাম। তাই দলের সবাই ভেবেছিল, আমরা একসঙ্গে থাকি আর নাই থাকি, এই আর্মাড কার নিয়ে কোন অ্যাকশন হোলে আমাকে পুলিশ রেহাই দেবে না, অ্যারেস্ট করবেই। সেইজন্য আক্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর আমি অ্যাকশনের সময় কলকাতায় থাকবই না, সেটা স্থির হয়েছিল। আমি দিল্লী চলে গেলাম। যাওয়ার আগে টেলিফোনে ও টেলিগ্রাফে সাংকেতিক বার্তা ঠিক হয়েছিল। সে সাংকেতিক বার্তা অর্থ করে আমি বুঝতে পারতাম যে অ্যাকশন ঠিকভাবে হয়েছে কিনা 'বিয়ের তারিখ পিছিয়ে গেছে', 'বিলেত থেকে মাসিমা এখনো এসে পৌছাননি', 'মোকদ্দমায় আমাদের জিৎ হয়েছে'—এই জাতীয় টেলিগ্রাম থেকে বুঝতে পারতাম 'অ্যাকশন হয়েছে'। অ্যাকশন ফেল হয়েছে। 'আমাদের খুব বিপদ হয়েছে' ইত্যাদি। যেদিন অ্যাকশন হবে, সেদিন ট্রাংক টেলিফোনে সংবাদ পাওয়ার জন্য আমি সময়মত নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবো, তার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত দিনের আগে বম্বে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে আমি বম্বে চলে যাই। এই বম্বে যাওয়ার সংবাদটা আমি তাদের সময় মত কলকাতায় জানিয়ে দিই। কাজেই অ্যাকশনের সংবাদ বম্বেতেই ট্রাংক ফোনে আসার কথা। বম্বের ফোন-নাম্বার ও সময় তারা জানতো।

ঘটনার দিন বম্বেতে আমি খুব দুশ্চিন্তায় অস্থির মন নিয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। ট্রাংক টেলিফোনে সংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় বসেছিলাম। এতবড় একটা অ্যাকশন কি হবে, কি হবে—প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তা কি ধরনের দুর্ঘটনা আগে থেকে তা হিসাব করা যাচ্ছিল না। যখন ট্রাংককল আসার কথা, সে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তবু ফোন আসছিল না। দুশ্চিন্তা অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু খবর নেওয়ার তখন কোন উপায়ও ছিল না। উপায়হীন ভাবে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে উঠেছিলাম, তবু যে বাড়ির টেলি-ফোন নাম্বার দেওয়া ছিল, সে বাড়ি ছেড়ে আসতে পারছিলাম না। তখনও আশায় আশায় ছিলাম যদি একটা টেলিফোন পাই। বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা ট্রাংক-টেলিফোন পেলাম। তখন প্রায় বেলা সাড়ে তিনটে। এইটুকুই মাত্র খবর পেলাম—'নির্ধারিত বিয়ে হোল না'। এইটুকু সংবাদে কিছু বোঝা গেল না। অনিশ্চয়তায় রইলাম। এই আর্মাড কার—একটা বিরাট পরিকল্পনা—এই সবের হোল কি? কাজ হোল না বুঝলাম, কিন্তু তার কারণ কিছু বোঝা গেল না। তারাই বা কোথায়? কাজেই উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে

রেখেছিল। তখন বিকেল সাড়ে চারটে। বম্বে-ক্যালকাটা মেল দু'ঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে। হাতে সময়ও নেই। আমি মনস্থির করলাম আমি একাই সেই ট্রেনে কলকাতা ফিরবো কিন্তু আগে বুকিং বা রিজারভেশান না থাকলে ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট পাওয়া যাবে কেন? আমায় সবাই নিরস্ত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু আমি সেটা মানলাম না। তারা আমাকে যুক্তি দেখিয়ে বলতে লাগলো, 'যা হবার তা হয়েছেই। আপনি সেখানে গিয়ে অবস্থার কি বেশী উন্নতি করতে পারবেন? বরং পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে। কাজেই সব খবরা-খবর নিয়ে যতটুকু সম্ভব প্রস্তুত হয়ে যাওয়া ভালো। তাদের কথায় হয়ত খুবই যুক্তি ছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এত দূরে থেকে চিন্তা না করে কলকাতা ফিরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সরেজমিনে থেকে যেটুকু সম্ভব উপস্থিত বুদ্ধি ও সামর্থ্য দিয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই কারো কথা শুনলাম না। আমি ঠিক করে ফেললাম, সেই ট্রেনেই কলকাতা ফিরবো।

বম্বে মেন স্টেশন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে আমার বেডিং ও স্যুটকেশ নিয়ে এসে উপস্থিত হলাম। টিকিট কাউণ্টার থেকে জানতে পারলাম তখন আর টিকিট বিক্রি হবে না, কারণ রিজারভেশন না থাকলে তারা টিকিট দেবেন না। খুব অনুনয় করে বললাম, আমার ভীষণ প্রয়োজন টিকিট আমার একটা চাই-ই। যদি সিট না পাই তাতে আমার কোন কমপ্লেন থাকবে না, আমি থার্ড ক্লাশেই যাব। দয়া করে আমাকে একটা টিকিট দিন। পথে গার্ড কণ্ডাকটারকে বলে দেখবো কোনমতে তারা আমাকে একটা সিট যে কোন স্টেশন থেকে ম্যানেজ করে দিতে পারেন কিনা। আমার অনুরোধের এই বহর দেখে তারা আমার প্রতি সদয় হয়ে ফার্স্ট ক্লাশের একটা টিকিট দিলেন। সেই টিকিটের সঙ্গে কোন রিজারভেশন টিকিট ছিল না। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট দেখিয়ে আমি ফার্স্ট ক্লাশ কমপার্টমেণ্টে উঠে পড়লাম। রাত দশটা পর্যন্ত আমি বসে যেতে তো পারবোই। এইভাবে প্রথম পর্ব শেষ হোল। এখন চেষ্টা কি করে রিজারভেশন পাই। গার্ড, কণ্ডাকটার, টিকিট চেকার প্রভৃতি কয়েক জনকে বলে চেষ্টা করলাম কেমন করে কলকাতা পর্যন্ত রিজারভেশন পাওয়া যায়। আমার এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টা সফল হল। গার্ড, কণ্ডাকটার আমাকে বললেন, আপনি কিছুক্ষণ এখানে বসুন, সামনের স্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে একটা সিটের রিজারভেশন দেব। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন।

· রাত দশটার পর নীচের বেঞ্চে আমি শুয়ে পড়ি। তখন মাথায় রাশি রাশি

চিন্তা। আর্মাড কারের কি হোল? তাদের কি হোল? এই ধরনের অনেক প্রশ্নই মনে এলো। কিন্তু, সঠিক জবাব কোনটারই পাচ্ছিলাম না। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গলো। তখন থেকেই চেষ্টা করছিলাম। খবরের কাগজ কিনবো। কিন্তু, কলকাতায় যে দুর্ঘটনা বেলা বারোটা-একটায় ঘটেছে তা যদি ছাপা হয়, তা পেতে পারি তার পরের দিনের কাগজে। সেই কাগজ পেতে পারি নাগপুরে। নাগপুরে ট্রেন পৌছবে প্রায় তিনটের সময়। অধীর হয়ে বসে রইলাম কতক্ষণে নাগপুরে একটা লোকাল খবরের কাগজ কিনবো। নাগপুর স্টেশনে আমি দু-তিনখানা খবরের কাগজ কিনলাম। তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলাম কলকাতার কোন দুর্ঘটনার খবর সেখানে বেরিয়েছে কিনা। শিরোনামায় সেই রকম চাঞ্চল্যকর কোন খবর দেখতে পেলাম না। কেবলমাত্র একটা কাগজে খুব ছোট করে সংবাদ ছিল দারুণ বিস্ফোরণে একটা মোটর গাড়ি বিধ্বস্ত হয়। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে দু'জন প্রায় মৃত অবস্থায় পড়েছিল। পুলিশের জোর তদন্ত চলেছে।' এইটুকু সংবাদে মাত্র বোঝা গেল আর্মাড কারটা হয়ত বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং তাতে দু'জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলের কোন উল্লেখ নেই বলে বোঝা যাচ্ছিল না। বিস্ফোরণ কোথায় ঘটেছে এবং কিভাবে তা ঘটলো? সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত এলো। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে আমি কলকাতায় পৌছাব। পরের দিন সকালে বর্ধমান স্টেশনে দুটো খবরের কাগজ কিনে দেখলাম কলকাতার খবরে আছে যে এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে। কিন্তু, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের কাছে তারা নিজেদের তৈরি আর্মাড ভ্যানটা নিয়ে বেলা বারোটার কিছু আগে অপেক্ষা করছিল অ্যাসেম্বলির পশ্চিম গেটে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তারা যাওয়ার আগে ল্যাণ্ডমাইনগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল, আর ব্যবস্থা ছিল স্টোরেজ ব্যাটারির সঙ্গে তার সংযোগ করার জন্য ছোট প্ল্যাগ লাগাবে। কিন্তু কিভাবে তা লাগাবে তা বিশেদভাবে বলা ছিল। ঠিক ছিল ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে নিরাপদ জায়গায় তারা প্লাগটা বিশেষ স্থানে রাখবে আর অ্যাকশনেব দু' মিনিট আগে সেখান থেকে তুলে নিয়ে কেবারে রেডি পোজিশনে রাখবে। কিন্তু অ্যাকশনের দু' ঘণ্টা আগে তারা সাংঘাতিক ভুল করলো। প্লাগটা নিরাপদ জায়গায় না রেখে অ্যাকশনের দু' মিনিট আগে যে জায়গায় সংযোগ করা দরকার সেই জায়গাতে তখনই সংযোগ করে দিল। তারা জানেও না কি ভুল তারা করলো। দু' মিনিট যেতে না যেতেই ভয়ঙ্কর শব্দে

প্রথম ল্যাণ্ডমাইনটা বার্স্ট করলো। আরও তিনটে ল্যাণ্ডমাইন পাশাপাশি ছিল। ঐ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আর্মাড কারটা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেল, আর তিনটে ল্যাণ্ডমাইনও পর পর একসঙ্গে ফাটতে লাগলো। ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ি থেমে গেল, যাত্রীরা ও পথচারীরা সবাই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগলো। প্রত্যক্ষদর্শীর ও প্রেস রিপোর্টারদের বিবরণ তার পরদিন ফলাও করে বেরিয়েছিল। স্টেটসম্যান দু' পৃষ্ঠা জুড়ে ফটো দেয় কোথায় কোন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আর্মাড কারটা পুড়ে ছাই হয়েছিল, আর তার লোহার ফ্রেমটাও বেঁকে যায়। তার ভেতরের রিভলবার পিস্তল স্টেনগান কাঠ কাটার ইলেকট্রিকের করাত প্রভৃতি যা ফায়ারব্রিগেডের লোক উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল তারও বিভিন্ন ফটো ছাপানো হয়। পুলিশ পাবলিক সবার মনে একই প্রশ্ন— এরা কারা ? কেন এই প্রস্তুতি ? কোথায় তারা যাচ্ছিল ? কি তাদের উদ্দেশ্য ? এই সব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ? তাদের ভেতরে কেউ ধরা পড়েনি। ফায়ার-ব্রিগেড দুটো খুবই দগ্ধ ছেলেকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে। জানা যায় তাদের জ্ঞান ছিল। পুলিশ তাদের অনেক প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি। এমনকি তাদের নাম পর্যন্ত জানতে পারেনি। সেই গাড়িতে তারা ক'জন ছিল— এই প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্বে তাও তারা জানতে পারেনি। রাস্তার লোকের থেকে জানতে চেয়েছে, কিন্তু কেউই এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেনি।

আমি ঘটনাক্রমে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি তাদের মধ্যে আরেকজন এই দু'জনের মতই প্রায় দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিল বলে অত সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হয়নি, তবুও তার বাঁচার আশা খুব কমই ছিল। তার উপস্থিত বুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে, সে বুদ্ধির জোরে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেল। সে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে তার বাড়িতে গেল। বাড়িতে কেউ ছিল না। তখনি বাড়ির চাকর এলো। তাকে বলল স্টোভ বার্স্ট করাতে আমি এভাবে পুড়ে গেছি। আমায় শীঘ্রই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চল। সে হাসপাতালে এমারজেন্সিতে গেল। তার এই রকম দগ্ধ অবস্থা দেখে ডাক্তার তখুনি তাকে পুড়ে যাওয়া কেস বলে ওয়ার্ডে ভর্তি করে নিল। এমারজেন্সি ওয়ার্ডে যারা ভর্তি হয় সব কেসই অ্যাক্সিডেন্টের কেস। নিয়ম অনুযায়ী সেই রকম কেস হলেই তারা পুলিশকে জানায়। পুলিশ খবর পেয়ে আসে এবং স্টোভে পুড়ে যাওয়ার কেস বলে লিখে নেয়। পুলিশ

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার বাড়িতে অনুসন্ধান করার পর স্টোভে পুড়ে যাওয়ার কেস বলে সাব্যস্ত করেছিল। কিন্তু তারা অত সহজে মেনে নেয়নি যে পুলিশ এই কেসকে অত সাধারণভাবে নিয়েছে। তারা স্বভাবতঃই মনে করেছিল পুলিশের এটা চাল, ফাঁদ পেতেছে তাদের ধরবে বলে। তাদের লোক নিয়মিত ভাবে লক্ষ্য করেছে কেন পুলিশ তাকে বন্দী করছে না বা পুলিশ কেন তাকে কড়া পাহারায় রাখছে না? তবে কি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তারা মেনে নিতে পারছিল না যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

হাসপাতাল থেকে দেড় দু' মাস পরে তাকে ছেড়েছিল। দিনটা তারা আগে থেকে খোঁজ রেখেছিল। সমস্যা ছিল তাকে তার বাড়িতেই নিয়ে যাবে নাকি পলাতকদের কোন আশ্রয়ে তোলা হবে? আরও তিনজন পলাতক ছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল তাকে পলাতকদের আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না, সে তার বাড়িতেই থাকবে। কিন্তু যেদিন সে ছাড়া পেল, সেইদিন হাসপাতালে তার ওপর দৃষ্টি রেখেছিল পুলিশের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ আছে কিনা। যোগাযোগের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কাজেই দূর থেকে তারা নজর রাখছিল এবং দেখলো ছাড়া পাওয়ার পর সে রিক্সা করে বাড়িতেই গেল। ওরা ঐ বাড়ির ওপরে আরও ক'দিন লক্ষ্য রাখলো পুলিশের যোগাযোগ কেমন আছে দেখার জন্য। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা গেল না। সেইজন্য তার সঙ্গে একজন গিয়ে দেখা করে তার মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত জানতে পারলো। তার বাবা বাড়িতে ছিলেন না। তার বোন ও ভাই সেই বাড়িতে থাকত। সেই তাদের অভিভাবক। একটা মাত্র চাকর ছিল। বহুকালের পুরনো চাকর। ভাই, বোন স্কুল কলেজে চলে গেলে বাড়ি খালি পড়ে থাকত। ঘটনাস্থল থেকে সে বাড়ি এসে কাউকে দেখতে পায়নি। তারপর শত যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে স্টোভটা খুলে ফেলে রেখেছিল। একটা চায়ের কেটলি উল্টে দেয়। ঐভাবে সাজিয়ে রেখে চাকরটাকে ডাকছিল কিন্তু চাকরটা যে কোথায় গেছে কে জানে। ঘণ্টা দুই পরে চাকরটা এসে তাকে দেখে খুবই বিচলিত হোল। তখন সে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে। চাকরটাকে দেখা মাত্রই সে বলল, এক্ষুনি তুমি একটা রিকসা নিয়ে এসো। রিকসায় চড়ে চাকরকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে এমারজেন্সি আউটডোরে গেল। যথারীতি সে হাসপাতালে ভর্তিও হয়ে গেল। তারপরে পুলিশের জমাদার তার কাছ থেকে খোঁজখবর নেয়। তার মনে হয়নি যে পুলিশ ময়দান দুর্ঘটনার সঙ্গে তার আগুনে পুড়ে যাওয়ার কোন যোগ আছে বলে মনে

করেছে। কারণ ময়দানের ঘটনা ঘটেছে বেলা দশটার সময়, আর সে মেডিক্যাল কলেজে এসেছে প্রায় বেলা দুটোর সময়। ফায়ার ব্রিগেড সেখান থেকে দু'জনকে দারুণ দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেছে। পুলিশের ধারণার বাইরে যে, ঐ রকম ভীষণ দগ্ধ অবস্থায় সে সেখান থেকে পালিয়ে এতক্ষণ পরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসতে পারে। আর এরকম দগ্ধ অবস্থায় সবার চোখের অন্তরালে বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশ, টহলদারী পুলিশ প্রভৃতির চোখ এড়িয়ে আসা কি সম্ভব? এই দুর্দমনীয় বিপ্লবীর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল।

মুমূর্ষু অবস্থায় যে দু'জনকে ফায়ার ব্রিগেড উদ্ধার করেছিল তাদের নিয়ে গিয়ে ভর্তি করলো পুলিশ হাসপাতালে। পুলিশ তখনো জানে না তাদের সঙ্গে কতজন ছিল? অনন্ত সিংহের সঙ্গে তাদের কি কোন যোগ আছে? তাদের সঙ্গে পুলিশের সব বড় বড় কর্তারা দেখা করেছেন। তাদের মুখ থেকে একটা কথাও জানতে পারেননি। তবু তাদের জানতেই হবে। জানতে হলে অনন্ত সিংহের কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়। তাই তারা অনন্ত সিংহের কাছে ডিটেলস গল্প বলে তার চমক ধরাচ্ছিল যেন অনন্ত সিংহ মনে করেন পুলিশ তো সবই জানে, তবে বলে দিলে আর ক্ষতি কি? বলে দিলে হয়ত কিছুই হোত না, তবে তারা যে পুলিশ!

পুলিশ তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে যেভাবে অনুসন্ধান করা উচিত তার ত্রুটি রাখেনি। ঘটনা ঘটলো দশটার সময়। পুলিশ ঘটনাস্থলের বিবরণ জানলো এগারোটার মধ্যে। তারা আর্মাড কার দেখে ও ল্যাণ্ডমাইনের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে ধরে নিয়েছিল এ অনন্ত সিংহের দলের কাজ। পুলিশ অনন্ত সিংহের দল বলতে আওয়ার স্ট্যাণ্ড গ্রুপের অনেককে সেই সময় ধরে মোকদ্দমার জন্য চালান দিয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণাদি না থাকায় তারা জামিনে মুক্তি পায়। তারপর তাদের বিরুদ্ধে কেসগুলোও খারিজ হয়ে যায়। এই কেস খারিজ হওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যে নিজেদের সাঁজোয়া গাড়ি তৈরী করে অভিযান শুরু করার মুখে এই ধ্বংসকাণ্ড হোল। ধ্বংসকাণ্ডের বৃত্তান্ত থেকে তাঁরা ল্যাণ্ডমাইনের অস্তিত্ব বুঝতে পারলো যে, এইটাও অনন্ত সিংহের দলের কাণ্ড তখন তারা একটুও দেরী না করে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কলকাতার তাদের দলের বিশ-পঁচিশটা বাড়ি অনুসন্ধান করলো, তার মধ্যে আমার বাড়িও বাদ যায়নি। কিন্তু আমি সেখানে ছিলাম না। তখন আমি ছিলাম দিল্লীতে আর আমার বাস ছিল কলকাতায় ওয়েলেসলী কোর্টে। আমি দিল্লীতে যাওয়ার পনের দিন পরে এই

ঘটনা ঘটে। কাজেই আমার সঙ্গে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কোথায়? আমার দিল্লী থাকার কথা পুলিশ জানতে পারে যখন তারা আমার ভাড়া বাড়িটা সার্চ করতে যায়।

ওয়েলেসলী কোর্টে একজন সাহেব আমাকে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়িটা ভাড়া দেয়। পুলিশ এই সাহেবের কাছে জানলো যে, আমি দিল্লী গেছি আর চাবি তাঁর কাছে দিয়ে গেছি। যেন ঝাড়ুদারকে দিয়ে তিনি আমার ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখেন। পুলিশ তল্লাসী বলে এমন কিছু করেনি কেবল আমাকেই খোঁজ করেছিল। তারপর সেই সাহেবকে বিশেষ করে বলে গিয়েছিল আমি কলকাতায় ফিরলে সঙ্গে সঙ্গে যেন লালবাজারে এ. সি. ডি. ডি মিঃ চন্দরের সঙ্গে দেখা করি। এইতো আমার সম্বন্ধে বললো। তাছাড়া সাহেবের সঙ্গে অনেক কথাই বলেছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কি করে নিশ্চিত বলতে পারেন যে আমি দিল্লী গেছি। আমি তো মিথ্যাও বলতে পারি। সাহেব একটুও ইতস্তত না করে বলেছিলেন কিনা তা তিনিই জানেন। আমাকে বলেছিলেন দিল্লী যাচ্ছেন। আবার পুলিশ প্রশ্ন করলেন ধরুন আপনাকে বললো যে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন কিন্তু সত্যি সেখানে না গিয়ে যদি কোলকাতাতেই কোন স্থানে লুকিয়ে থাকেন তবে কি তা আপনার পক্ষে জানা সম্ভব?

সেটা আপনারাই ভালো বুঝবেন, আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি যেটুকু আমাকে বলেছিলেন সেটুকু শুধু আপনাকে বললাম।

১১

পুলিশ সাহেবের সঙ্গে তারপর খুব আপনার জন সেজে কথা বললেন, দেখুন আপনার অনেক বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছি, সময়ও নষ্ট করেছি। তবে তা স্বেচ্ছায় নয়। কর্তব্যের খাতিরে তা করতে বাধ্য হয়েছি। তা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন। আপনি আমাদের অবস্থাটা বুঝে ক্ষমা করবেন।

না, না, আপনাদের বিরুদ্ধে সেইরকম মত আমি পোষণ করি না। আমি বুঝি কর্তব্যের খাতিরে অনেক সময় আপনাদের অপ্রিয় কাজ করতে হয়। কাজেই আপনাকে আমি ভুল বুঝিনি। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, তা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবো। মিঃ সিংহকে আমি বলবো যে, আপনি বলে গেছেন, তিনি এলেই যেন লালবাজারে এ. সি. ডি. ডি-র সঙ্গে দেখা করেন। তারপর পুলিশ যাওয়ার আগে আরও দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করল, এই বাড়িতে তিনি কতদিন আছেন ?

তিনি প্রায় তিন মাস আছেন।

এই তিন মাসের মধ্যে উনি কি এরকম আর বাইরে গেছেন ?

না।

তিনি প্রতিদিন রাত্রে কটার সময় বাড়ি ফিরতেন ? তিনি কি প্রতিদিন একা আসতেন না তার সঙ্গে আর কেউ আসতো ?

তিনি একাই ফিরতেন, একাই বাড়িতে থাকতেন।

পুলিশ ঘুরে ঘুরে ঘরে কটা দরজা আছে দেখলো। রান্নাঘর, বাথরুম খুব ভালো করে দেখলো, সেখানে বাইরের বেরোনোর কোন পথ আছে কিনা। এইসব পরীক্ষা করে ও সাহেবের সঙ্গে কথা শেষ করে পুলিশ চলে গেল।

পুলিশ এবার মোবিলিটি প্রাঃ লিমিটেড মোটর কারখানায় গেল। সেখানে গিয়ে আমার গাড়ির খোঁজ করলো। আমার স্টুডিবেকার গাড়িটা তাদের খুব চেনা। জিজ্ঞেস করে জানলো প্রায় সাত-আট দিন আমার গাড়ি সেখানেই আছে। তাদের ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখার কথা। পুলিশের পরিচিত

আরেকটা গাড় যেটা আমাদের দলের গাড়ি বলে সন্দেহ করতো সেটার খোঁজ-করলো। জানতে পারলো বম্বের কোন ক্রেতা সেই গাড়িটা কিনে নিয়ে বম্বে চলে গেছে। মোবিলিটি প্রাঃ লিমিটেডের মালিক মিঃ কমল দেকে তারা অনুরোধ জানিয়ে গেল যে অনন্ত সিং যদি তাদের কারখানা থেকে গাড়ি নিয়ে যায় তবে তাদের যেন জানানো হয়। তিনি তাদের এই অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখান করেন এবং বলেন ক্ষমা করবেন মশাই, এ আমার কাজ নয়। অতএব পুলিশকে ফিরে যেতে হয়।

আমি হাওড়া স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি করে বাসায় এসে পৌছালাম। পেছনে কোন মোটর গাড়ি আমাকে অনুসরণ করেছিল কি না, বলতে পারবো না। তবে মনে হয় পুলিশ আমায় অনুসরণ করেছে একেবারে বম্বে থেকে। আমি বাড়িওয়ালা সাহেবের সঙ্গে কথা বলার পরে ট্যাক্সি করে 'মোবিলিটিতে' যাই। শ্রীকমল দে আমাকে বললেন, মনে হচ্ছে শালারা আপনাকে ছাড়বে না। ময়দানে গাড়ি পুড়ে গেল বিস্ফোরণে। আপনি রইলেন কলকাতার বাইরে অনেক দূরে, তবু শালাদের বিশ্বাস আপনি সব পারেন। আপনার ম্যাজিকের কথা ওদের খুব ভালো করে জানা আছে। তারা জানে, তারা দেখেছে এবং সব সময় বলে বেড়ায় আপনার হাতে হাত কড়া দিয়ে লম্বা চটের বস্তায় পুরে ভাল করে বন্ধ করে গালা দিয়ে শীল মোহর করে একটা খুব মজবুত সিন্ধুকে পাঁচটা তালা বন্ধ করে যদি রাখা হয়, তবুও আপনি নাকি এক নিমেষে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। এইসব নিয়েই সব সময় আমার এখানে কথা হয়। আর্গাড কারটা দেখে তাদের মাথা বিগড়ে গেছে। সেই দিনকার স্টেট্সম্যান ও অন্যান্য দৈনিক কাগজে দুই পৃষ্ঠা জুড়ে আর্গাড কার ও তার ভেতরের মারাত্মক জিনিস-পত্রের ছবি দিয়ে ছাপিয়েছে।

আমি এই প্রথম কাগজে প্রত্যক্ষ বিবরণ দেখতে পেলাম। সবই যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। আমার গোপন মনে প্রশ্ন--আসলে দুর্ঘটনাটা ঘটলো কি করে?

'মোবিলিটি প্রাঃ লিমিটেড' থেকে আমার গাড়িটা নিয়ে বেরোলাম লালবাজারে এ. সি. ডি. ডি-র সঙ্গে দেখা করতে। যাওয়ার আগে আমার ইচ্ছা হোল কাউকে জানিয়ে যাই যদি লালবাজার আমাকে আটক করে তবে উকীল নিয়ে যেন মোকদ্দমায় তদ্বির করে। যাঁর কাছে গেলাম তিনি একজন প্রাক্তন বিপ্লবী, পুরোনো দিনের দাদা। তিনি জানতেন ময়দানে দুর্ঘটনার পরে আমাদের দলের সবার বাড়ি কিছু সময়ের মধ্যে সার্চ হয়। আমার মুখে তিনি প্রথম শুনলেন

আমার বাড়িওয়ালা সাহেবের কাছে পুলিশ বলে গেছে, আমি এলেই যেন লাল-বাজারে এ. সি. ডি. ডি-র সঙ্গে দেখা করি। আমার এই প্রাক্তন বিপ্লবী দাদা একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'হয়ত তোমায় ধরে ফেলবে।' আরও বললেন, 'দেখো, ওখানে না গিয়ে পারা যায় কিনা।'

'না, আমায় যেতেই হবে।' এই কথা বলে আমি আমার গাড়ি নিয়ে সোজা লালবাজারে গিয়ে ঢুকলাম। লালবাজারের প্রায় অনেক পুলিশ, সাব-ইন্সপেক্টার, ইন্সপেক্টার আমাকে চিনতেন। সেখানে আমার আকস্মিক আবির্ভাব দেখে তাঁরা একটু চমকে উঠলেন। আমি গিয়ে ইন্সপেক্টারের ঘরে উঠলাম। ইন্সপেক্টর আমাকে দেখেই মৌখিক অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। তারপর বললেন, আমিই আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। আপনি এলে যে দেখা করবেন, তা আমি ঠিক জানতাম। অনেকে আমাদের মধ্যে তা বিশ্বাস করে নি।

তাঁকে নিরুৎসাহ করে আমি বললাম, 'আপনি দয়া করে এ. সি. ডি. ডি-কে খবর দিন 'যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

তক্ষুনি তিনি চেয়ার থেকে উঠলেন এবং উঠতে উঠতে বলছিলেন, 'আমি নিজেই এক্ষুনি তাকে খবর দিচ্ছি।'

তিনি গেলেন, ফিরে এসে বললেন, 'আপনি আসুন।'

এ. সি. ডি. ডি-ঘরে একা ছিলেন। আমাকে চেয়ার থেকে উঠে সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

আমি আমার হাসিভরা মুখ নিয়ে তাঁকে নমস্কার জানালাম। তিনি ইন্সপেক্টারকে বললেন, 'আচ্ছা তুমি এখন এসো। তারপর আমার দিকে ঘুরে বসে বললেন, অনন্তবাবু বুঝতেই পারছেন আপনাকে কষ্ট দিতে ডেকে আনলাম। আপনি আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝেছেন, আপানাকে আরেস্ট করে হ্যারাস করার উদ্দেশ্য মোটেই নেই। আপনার একটু সহযোগিতা চাই।'

'কি রকম সহযোগিতা চান বলুন।'

আমাদের কাছে আর্মাড কারটা একটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের কাছে এই ধরনের মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র থাকা আরও বেশী চিন্তার কারণ। এই সম্বন্ধে আপনি আমাদের একটু আলোকপাত করুন।'

'আপনার এই প্রত্যক্ষ প্রশ্নের উত্তরে 'কিছু জানি না' বলা ছাড়া আর কোন উত্তর আছে বলে আমি মনে করি না।'

তিনি এই রকম উত্তর পাওয়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কাজেই

এই উত্তরে তাঁর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। দগ্ধ শরীর বিকৃত আকার—এই রকম দুটো ফটো দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন তো চিনতে পারেন কি না?

'চেনা লোক হলেও চিনতে পারার মত কিছু তো রাখেন নি।

তিনি একটু চুপ করে থেকে তারপরে বললেন, 'এ দু'জন বেঁচে নেই, তারা মারা গেছে। ময়দানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যে আর্মাড কারটা ধ্বংস হয়েছে তারই মধ্যে থেকে ফায়ার ব্রিগেড এদের উদ্ধার করেছে। পুলিশ হাসপাতালে রেখে আমরা সব রকম চেষ্টা করেও তাদের বাঁচাতে পারি নি। একদিনের মধ্যে তারা মারা যায়। এই দু'জন যুবক খুব সাহসী ও একনিষ্ঠ বিপ্লবী। তারা একটা কথাও বলে নি, এমন কি তাদের নামও নয়। তারা জগতে এসেছিল, নিঃশব্দে জগৎ থেকে বিদায় নিল! কেউ জানলো না, কেউ এক ফোঁটা জলও তাদের জন্য ফেললো না। তাদের নাম প্রকাশ পেলে অন্তত স্বদেশ প্রেমিক যুবকরা তাদের উচ্চ কণ্ঠে অভিনন্দন জানাতো। সেই জন্য আপনাকে বলছি, সবার জানার জন্য তাদের নাম দুটো অন্তত প্রকাশ করে দিন।'

আমি বললাম, 'যারা দেশপ্রেমিক তাদের নাম আমি না বললেও যথাসময়ে বেরিয়ে পড়বে। সেইজন্য আপনার ও আমার ভাবার কোন কারণ নেই।'

তিনি আমার কথা শুনে একটু বিষণ্ণ হলেন। এ. সি. ডি. ডি তখন উঠে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে আমাকে বলতে লাগলেন, আর্মাড কার, আর এত সাজ-সজ্জা—স্টেনগান, ল্যাণ্ডমাইন ইত্যাদি নিয়ে তারা কোথায় যাচ্ছিলেন?"—'পাকিস্তানে?···কোন ব্যাঙ্কে?'

কিছু উত্তর দেওয়ার ছিল না বলে আমি চুপ করেছিলাম।

তিনি বললেন, 'তাদের বাড়ি আমরা সার্চ করেছি। তাদের একজোড়া জুতো ছাড়া দু' জোড়া জুতো দেখি নি। জামা একটার বেশী ও ঘরে কোন দামী জিনিসই ছিল না। তারা তাদের নিজের জন্য ডাকাতি করতে যাচ্ছিল, তা বিশ্বাস হয় না। দেশপ্রেমের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা কি পাকিস্তান যাচ্ছিল? মশাই, আমরা তো কোন হিসাব লাগাতে পারছি না—কে তারা? কি বা তাদের উদ্দেশ্য? আমাদের চাকরিকালে অনেকই দেখলাম। কিন্তু এ-রকম কেস একটাও পাইনি। তাদের কলেজ কেরিয়ারও খোঁজ নিয়ে দেখলাম, খুবই প্রসংশনীয়। প্রত্যেক প্রফেসার ও ছাত্রদের কাছে তারা খুবই প্রিয় ছিল। তারা এই সংবাদ জেনে ভাবতেও পারলো না, তাদের দ্বারা এই ভয়ানক কাজ কি করে

সম্ভব হতে পারে। আমরা ক্রমেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি। তারা দু'জনই দেখতে ফরসা। শরীর সবল ও সুস্থ। বৃন্দাবনের দেহ কালিপালের থেকে বেশী সুস্থ ও সবল বলে মনে হয়। যে কটি ঘণ্টা তারা বেঁচে ছিল, তার মধ্যে তারা কথা বলেছে খুবই কম। আর যা বলেছে তা সবই ইংলিশে।

এইসব কথা শুনে আমি তাঁকে বললাম, 'তাদের মরবার সময়ও এত বিরক্ত করলেন কেন? তখন কি আপনাদের এত প্রশ্ন তাদের ভাল লেগেছিল? মরার সময়ও আপনাদের যন্ত্রণায় শান্তিতে মরতে পারলো না।'

বিশ্বাস করুন অনন্তবাবু আমরা তাদের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে একটুও চাই নি। তাদের সেবা-শুশ্রূষার একটুও ত্রুটি করিনি। কেবলমাত্র নাম জানতে চেয়েছিলাম। যদি ইতিমধ্যে তাদের নাম অন্য কোন সূত্র থেকে জেনে ফেলতাম, তবে তাদের কাছ থেকে নামও জানতে চাইতাম না! বাংলার এতবড় তরুণ বীররা চলে যাবে আর কেউ তাদের পরিচয় জানবে না, আর দু ফোঁটা চোখের জলও তাদের জন্য ফেলবে না, সেটা ভাবতেও আমার অসহ্য মনে হচ্ছিল। অনন্তবাবু আপনি হয়ত ভাববেন আমরা পুলিশ, আমাদের অন্তঃকরণে কোন দয়া-মায়া থাকতে পারে না। পুলিশ হলেও আমরা মানুষ। সেই তরুণদের সঙ্গে আমার হয়ত মতের মিল নেই। তাই বলে কি সেই দুটি মহৎ প্রাণের যে পরিচয় আমি পেলাম, তা কি আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি? আরেকটা কথা বলি অনন্ত বাবু তাদের আমি বিশেষ করে বলেছি, এই শেষ মুহূর্তে তারা কি চান বললে, আমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করবো। তারা মাথা নাড়তে পারছিল না, তবু কষ্ট করেও মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল তাদের সেই রকম কোন বাসনাই নেই; তারপর ইতস্তত করেও স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করলাম, অনন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান? তারা আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। আপনার নাম শুনে তাদের চোখ উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কোন জবাব দিল না।'

এ. সি. ডি. ডি. এই কথা আমাকে বলে তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। আমার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখে নেবেন। কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বা আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা, আমি জানি না। আমি বিদায় নেবার সময় এ.সি. ডি. ডি-কে বললাম, 'আপনি তো তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কোন উত্তর দিয়ে খুশী করতে পারলাম না। তাহলে আমি এখন আসি। নমস্কার।'

তিনিও প্রতি নমস্কার দিলেন। আমিও লালবাজারে এ. সি. ডি. ডি র অফিস ছেড়ে নিজের গাড়িতে উঠলাম। তখনও ভাবছিলাম—কই এখনও তো ধরলো না? তবে কি ধরবে না?

গাড়ি চালিয়ে চলেছি। আমার মনে তখন আর অন্য কোন কথা নেই, কেবল বার বার বৃন্দাবন ব্যানার্জী ও তপন কাঞ্জিলালের জীবন্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে দেখছিলাম। তারা দু'জন আমার কত প্রিয় ও আপনার জন ছিল। তারা কখনও ভয় করতো না। বিপদকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলতে সব সময় প্রস্তুত ছিল। তাদের হারিয়ে সংগঠন আজ কত দুর্বল। আর্মারি রেডের প্রস্তুতির সময় ভীষণ দগ্ধ হয়ে মৃতপ্রায় অর্ধেন্দু ও তারকেশ্বরকে নিয়ে গাড়ি করে আমি ঘুরেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল জোগাড় হয় নি। আমি ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে হিমাংশুকেও সাংঘাতিক পুড়ে যাওয়া অবস্থায় গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম।
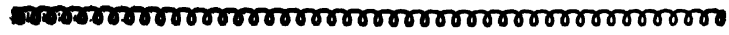
রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকেও তার ভগ্নীপতির বাড়ি থেকে দারুণ পোড়া অবস্থায় আমি গাড়ি করে নিয়ে গেছি। তাদের প্রত্যেকের জ্বলন্ত দেহের বীভৎস চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে কল্পনার চোখে আমার তরুণ দুই সাথী তপন ও বৃন্দাবনকে বিস্ফোরণে দারুণ দগ্ধ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলাম। পুড়ে যাওয়ার যে কি যন্ত্রণা সেটা আমার নিজের চোখে দেখা। কাজেই তাদের পোড়া যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক ছিল, তা কেবল অনুভব করা যায় নিজের অন্তর দিয়ে। বৃন্দাবন এক ষ্ট্রাইকের দিন গাড়ি নিয়ে বিশেষ কাজে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার গাড়ি রাস্তায় দেখে স্বেচ্ছাসেবকরা মনে করলো গাড়িটা ষ্ট্রাইকের বিপক্ষ পার্টির। আর যায় কোথায়! রাস্তা থেকে ইঁট তুলে বৃন্দাবনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লো। ইঁট গিয়ে পড়লো বৃন্দাবনের মাথার ডান দিকে, চোয়ালে, চিবুকে। একটুখানি মাথা ঘুরে পড়েছিল। তবু সামলে নেয়। অসহ্য যন্ত্রণা। কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সে কোন মতে হেড-কোয়ার্টারে ফিরে আসে। বৃন্দাবন ব্যথায় কাতর হওয়ার ছেলে নয়। এই বৃন্দাবনকে লালবাজারে বরফের উপরে শুইয়ে রেখেছিল। তাও সে সহ্য করেছে। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ফোরণই তাকে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করলো।

তপনকে আমি দেখেছি দিনের পর দিন রাতের পর রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করছে। সে জানতোও না যে সে নিজেই বিস্ফোরণে একদিন প্রাণ দেবে।

ভাই তপন, ভাই বৃন্দাবন, তোমরা আর যেখানেই থাক না কেন তোমাদের কথা আর কেউ বলুক, আর না বলুক, আমি বলছি তোমরা মৃত্যুকে জয় করেছ। তোমরা তরুণ বিপ্লবীদের মনে চিরজীবী হয়ে থাকবে। তোমাদের মৃত্যু নেই। তোমাদের ধ্বংস নেই। তপন, বৃন্দাবন—আমাদের স্মৃতিতে তোমরা হারিয়ে যাও নি, হারাবে না—

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

ডিনামাইট ভীষণ বিস্ফোরক দ্রব্য। এই বিস্ফোরকের রাসায়নিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অবগতি না থাকলেও সাধারণ ভাবে বোধ হয় সবাই জানে যে ডিনামাইট যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ সেতু, রেল লাইন, এয়ারোড্রোম প্রভৃতি বিধ্বংস করার কাজে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে দূর থেকে ডিনামাইট বিস্ফোরণ করা যায়। বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ প্রয়োজনে বিস্ফোরণের প্ল্যান করতে হয়। গেরিলা যুদ্ধে বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন কৌশলের সঙ্গে বিপক্ষের অজ্ঞাতে ডিনামাইট ব্যবহার করার রীতি আছে। সকলের বিরুদ্ধে দুর্বল শক্তির গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার নৈতিক অধিকার তো আছেই। চট্টগ্রাম শহর প্রান্তে জালালাবাদ পর্বত যুদ্ধে ইংরেজের সাময়িক পরাজয় হওয়ার পর মাস্টারদা তাঁর রণনীতি পরিবর্তন করেছিলেন।

'শত্রু পুনরায় প্রবলতর শক্তি নিয়ে এই জানা শিবিরের উপর আক্রমণ চালাবে।' গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি—দ্রুত স্থান পরিবর্তন করাটা অতি অবশ্য যুদ্ধ কৌশল বলে মনে করে। তাই মাষ্টারদা সবাইকে গেরিলা কৌশল গ্রহণের আদেশ দিলেন। লোকনাথ বল মাষ্টারদার নির্দেশানুসারে বিপ্লবীদের ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন গ্রামে চলে যেতে বললেন। সেই ভাবে তারা জালালাবাদ পাহাড়টি ছেড়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। প্রধান কেন্দ্র মাষ্টারদার হাতে ছিল এবং প্রত্যেকটি গেরিলা দল মাষ্টারদার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলত।

আমি ও আমার সঙ্গের গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল ফেণী স্টেশনের খণ্ড যুদ্ধ সমাপ্ত করে উধাও হই। তারপর বিভিন্ন ভাবে আমরা চারজন কলকাতায় মিলিত হই। আমি পরে ইচ্ছাকৃত ভাবে পুলিশের কাছে ধরা দিই। আমার ধরা দেওয়ার ফলে পুলিশ বিশেষ ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই জন্যই আন্দামান নির্বাসনে যখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে যাচ্ছিলাম তখন পায়ে ডাণ্ডা বেড়ী, দু'জন করে হাত-কড়ি ও জোড়ায় জোড়ায় হাত কড়ির ভিতর দিয়ে লোহার শিকল গলিয়ে এক মাথায়

একটি সেপাই ধরেছে যেন কেউ কোন ফাঁকে সটকে পড়তে না পারি। এতসব সাবধানতা নিয়ে যখন পুলিশ আমাদের প্রথম দলটিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও পুলিশের সেই জিজ্ঞাসা—কেন ধরা দিলেন? যখন আমাদের নিয়ে পুলিশের এই সশস্ত্র বাহিনী যাওয়ার জন্য উদ্যোগ করছে তখন সেই শেষ মুহূর্তেও একজন খুব ধৈর্যশীল পুলিশ অফিসার (যিনি দু'বছর থেকে ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছেন আমার ধরা দেওয়ার সঠিক কারণটি কী জানার জন্য) তাঁর বিনীত নিবেদন জানাচ্ছিলেন যেন আমি যাওয়ার আগে তাঁকে আমার ধরা দেওয়াব সঠিক কারণটা জানাই। যদিও আমার চিঠিতে মিঃ লোম্যানকে লিখে সুস্পষ্ট ভাবে জানাই—ধরা দেওয়াটা নেহাৎই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও তিনি ও পুলিশেরা আমার এই কথাটি বিশ্বাস করেন নি কোন কালে। তাই আন্দামান জেলে চালান যাবার আগেও শেষ চেষ্টা করলেন। পুলিশ অফিসারটি খুব বিনীত ভাবে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন—'আপনি হয়ত আপনার বাকি জীবনের শেষ দিনগুলি আন্দামানেই কাটিয়ে যাবেন। আমাদের মধ্যে বোধ হয় আর দেখাও হবে না। আমার প্রথম সাক্ষাতের প্রথম প্রশ্নটির উত্তর আজও পেলাম না—কেন আপনি ধরা দিয়েছিলেন? আজ আপনি অন্ততঃ সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে আমাদের মনের সংশয় দূর করুন।'

উত্তরে আমি বলেছিলাম—'বিভিন্ন সময় আমার বিভিন্ন উত্তর হয় না। বাস্তব কথাটি কখনও বিভিন্ন রূপঃপরিগ্রহ করে না। তখন যে জবাব পেয়েছিলেন আজও সেই একই জবাব পাবেন—নেহাৎ ব্যক্তিগত কারণে আমি ধরা দিয়েছিলাম।'

'আমি বার বাব বলা সত্ত্বেও তাঁরা কেন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। প্রথমতঃ অনন্ত সিং? কি ব্যক্তিগত কারণে ধরা দিতে পাবে? অতি বুদ্ধিমান যাঁরা, তাঁরা ধরে নিলেন এই ধরা দেওয়ার পেছনে অনন্ত সিংহের কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল। একটি প্রচলিত কথা—বৈপ্লবিক কারণ ব্যতিরেকে অনন্ত সিং একটি পদক্ষেপও দেয় না।' তাই ত পুলিশের মাথাব্যথা অনন্ত সিংহের ধরা দেওয়ার কারণ যে কোন উপায়ে খুঁজে বার করা। কত পুলিশ অফিসাব কত স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে রিপোর্ট দিয়েছেন—'এ মেয়েছেলে ঘটিত ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই।' কোন বিশ্বস্ত সূত্রেব রিপোর্ট—'দলের ছেলে যারা স্বীকারোক্তি করেছে তাদের জীবিত থাকার অধিকার নেই। অতএব তাদের মৃত্যুদণ্ড অনন্ত সিং দেবে।' কোন রিপোর্টে আছে—আন্দামান থেকে অনন্ত সিং সদলবলে উধাও হয়ে দেশে ফিরে আসবেই।' ইত্যাদি ইত্যাদি রিপোর্ট

পুলিশ সংগ্রহ করে। তাই অনন্ত সিংহের ধরা দেওয়ার সঠিক কারণ পুলিশের জানা প্রয়োজন। অনুরূপ সার্কুলার প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীকে দেওয়া হয়েছিল।

এইরূপ সার্কুলারের অনুবর্তী হয়ে তাঁরা আমার ধরা দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করছিলেন কিনা তা জানি না, তবে আন্দামানে গিয়ে আমাদের খুব বিশ্বাসী ছেলে শান্তির মুখে শুনেছিলাম মাষ্টারদা চট্টগ্রামের যুব অভ্যুত্থানের ঘটনা নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন। ধলঘাটের বাড়িতে যেখানে নির্মলদা ও অপূর্ব গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং মেজর ক্যামারণ সাহেব যিনি অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান পার্টিকে নিয়ে সর্বাগ্রে বাড়ির ভেতর ঢুকে নির্মলদার গুলিতে প্রাণ হারান, সেই বাড়ি থেকেই পুলিশ এই তিনটে খাতা উদ্ধার করে। সাহেবের বিরাট বপু, তিনি ভাবতেন তাঁর অতুলনীয় শক্তি—তিনি একাই সব কটি ফেরার আসামীকে ধরে ফেলবেন। নির্মলদা ও মাষ্টারদাকে অক্ষত দেহে ধরতে পারলে পনের হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। বলশালী মেজর ক্যামারণ সাহেব লোভ সামলাতে পারলেন না, তিনি তথ্য নিয়ে এসেছিলেন যে ঐ বাড়িতে স্বয়ং সূর্য সেন ও নির্মলদা ফেরার হয়ে আছেন। আর গুটিকতক তাঁদের বিপ্লবী সাথীও সঙ্গে আছেন। এই নির্ভুল সংবাদটি পেয়ে মেজর ক্যামারণ পুরস্কারের আশা ছাড়তে পারলেন না। তিনি পিস্তলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে বীরদর্পে ঘরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলেন। নির্মলদার রিভলবার ক্যামারণ সাহেবের বুক লক্ষ্য করে গর্জন করে ওঠে। আর্মি রিভলভারের ৪৫০ সাইজের গুলি ক্যামারণের বুক ভেঙ্গে দিয়ে গেল। সাহেবের প্রাণহীন দেহ তক্ষুনি দোতলার সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গেল। পুলিশ ও মিলিটারীর বেষ্টনী থেকে মেসিনগানের অজস্র গুলি তাদের বাড়িতে এসে সর্বত্র আঘাত করতে লাগলো। সেই বৃষ্টির ধারার মত গুলি মাস্টারদা প্রীতিলতা প্রমুখ আর কাউকে স্পর্শ করল না। তাঁরা পুলিশ ও মিলিটারীর বেষ্টনী ভেদ করে অন্য আশ্রয়স্থলে চলে যেতে সক্ষম হন।

মাস্টারদা নাকি আমার ধরা দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, আমি যেন সব বন্দী যারা রাজসাক্ষী হওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশের কাছে খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছে তাদের খতম করি। যখনই পারি তা যেন নিশ্চয়ই করি। মাস্টারদার এই লেখার সমর্থনে আর কোন বাস্তব সাক্ষ্য পান কিনা সেইজন্য আমার কাছ থেকে বা আমার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছেলেদের মুখ থেকে তাঁদের শোনবার অভিপ্রায় ছিল—আমি কেন ধরা দিয়েছি।

যারা স্বীকার-উক্তি করে, তাদেরকেও একসঙ্গে আন্দামানে পাঠাচ্ছে— কাজেই পুলিশের যত মাথাব্যথা স্বীকারোক্তিকারীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে। তাই তাঁদের পক্ষে জানা প্রয়োজন ছিল তখনও তেমন কোন গুপ্ত পরিকল্পনা আমার মনে ছিল কিনা। তাঁদের আরো একটি বিষয় জানবার ছিল আমার আন্দামান থেকে পালাবার কোন গোপন পরিকল্পনা ছিল কিনা? সত্যি বলতে কি সেরূপ চিন্তা আমার মাথায় যে আসেনি তা নয়। কিন্তু সমুদ্র ঘেরা দ্বীপ থেকে উধাও হওয়া সহজ নয়। আমি পালাতে পারতাম বললেও আজ কারো বিশ্বাস হবে না। মনে হবে বানিয়ে বানিয়ে এখন বলা হচ্ছে—যদি সহজসাধ্য ছিল তবে তুমি পালালে না কেন? যে যা ইচ্ছে মনে করতে পারেন তবে আমি কেন আন্দামান থেকে পালাই নি বা পালাতে চেষ্টা করিনি, তা হচ্ছে পালাবার পরে কোথায় যেতাম? আমার মানস চোখে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, যেখানেই যাই না কেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কোন প্ল্যান নেই এবং আমাকে ফেরারের মত রাখতে তারা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। প্রত্যেক দল উপদলের মধ্যে পুলিশের চর ছিল। আমি যে কোন আস্তানায় যাই না কেন দলের মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম। আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনুশীলন করে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করি। আন্দামানের কম্যুনিষ্ট কনসলিডেশন কমরেডদেব ঐরূপ চিন্তা করাও পাপ ছিল। তাঁরা ভাবতেই পারতেন না কম্যুনিষ্টদের মধ্যেও পুলিশের চর থাকতে পারে। আমার তো প্রথম কাজ হল সততানিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট কর্মীরা অন্ততঃ এইরূপ ধারণা থেকে মুক্ত হউক যে তাঁদের পার্টির মধ্যেও পুলিশ এজেণ্ট আছে ও থাকবেই। যদি কম্যুনিষ্ট পার্টি তার পুঁজিবাদী-বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়, তবে বুর্জোয়া সরকার তার বিরুদ্ধাচারণ করার মনোভাব পোষণ করবেই। সেই পার্টির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে। কাজেই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে পুলিশ নেই, সেই রকম মনোভাব আমার অন্তত কখনও হয়নি। সরকার পার্টিতে যাঁদের আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী বলে মনে করতেন, সর্বদিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তাদের পঙ্গু করার চেষ্টা করতেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ভিতর কম্যুনিষ্ট নেতারা তাঁদের কম্যুনিষ্ট-সততা বজায় রাখার জন্য, সেইরকম সংগ্রামশীল কম্যুনিষ্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য—সে একজন অতিবাম বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট না হয় ট্রটস্কী মতবালম্বী আর না হয় একজন জ্যাকবিন বলে আখ্যা দিয়ে তাকে বহিষ্কার করার নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। ভারতের কেন্দ্রীভূত কম্যুনিষ্ট পার্টি এইভাবে কঠোর ডেমোক্রেটিক

সেণ্ট্রালাইজড পার্টির দোহাই দিয়ে তাদের পার্টির সুদৃঢ় কাঠামো বজায় রেখেছে। আমার কিন্তু ডেমোক্রেটিক সেণ্ট্রালাইজড পার্টির নীতি নিয়ে কোন দ্বিমত নেই আমার প্রশ্ন, মানুষকে নিয়ে কম্যুনিষ্ট নেতাদের নিয়ে। আমার ঝগড়া কম্যু-নিজমের' সঙ্গে নয়—'কম্যুনিজম' একটি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদকে গান্ধীজির নামে বা আধ্যাত্মবাদ দিয়ে ধ্বংস করার মিথ্যা স্বপ্ন আমি দেখি না। যাঁরা জোর করে তাঁদের মতবাদ চালাতে চান —যেখানে যুক্তি থাকে না স্রেফ ঈশ্বরের নামে বক্তব্য রাখা হয় ও অন্ধ বিশ্বাসে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় তার সঙ্গে আমার মতের লড়াই থাকবেই। সে লড়াই কোন মানুষের ব্যক্তিগত মতের বিরুদ্ধেও বটে তাছাড়া সেইসব ব্যক্তি বিশেষকেও কঠোর সমালোচনা না করে পারা যায় না। সেই সমালোচনা প্রসঙ্গ বর্তমানে আমি স্থগিত রাখলাম। আমার বলার কথা আন্দামান সমুদ্রবক্ষে দ্বীপ, এখন সেখান থেকে পালানোটা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবু আমার কাছে তা অসম্ভব ছিল না।

আন্দামান থেকে বাংলার উপকূল প্রায় আটশো-নশো মাইল হবে। মাদ্রাজ সমুদ্রতীরও প্রায় হাজার বারো-শ মাইল দূরে, কিন্তু বার্মার উপকূল তিন-শো, সাড়ে তিন-শো মাইলের মধ্যে। এইটুকু জলপথ পেরিয়ে যাওয়া যাবে না, তা একজন বিপ্লবী ভাবতে পারে না যদি কেউ মনে করেন আমি ভাবছি সাঁতরে পেরিয়ে যাওয়ার কথা, তবে সেটি অধুনা কালে যুক্তিপূর্ণ ভাবনা হয় না। তখন-কার দিনেও উনিশ শো বত্রিশ-সাঁইত্রিশ সালেও মোটরচালিত স্পীড বোটের প্রচলন ছিল। স্পীড বোটের দাম তখন মোটর গাড়ির চাইতে বেশী নয়। ঘণ্টায় প্রায় আশি-নব্বই মাইল বা আরো বেশী যেতে পারত। বিপ্লবীর পক্ষে এই রকম স্পীড বোট পাওয়া অসম্ভব ছিল না। বাকিটুকু সহজে বুঝে নিতে পারা যায় যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে তা লুকিয়ে রাখা দু-এক-দিনের জন্য খুবই সম্ভব। নির্ধারিত সময়ে সেই স্পীড বোট আমাদের নির্ধারিত স্থানে এসে অপেক্ষায় থাকবে, আর আমরা সেই সংবাদ পাবো জেলে একটি বন্ধু সিপাইয়ের মারফৎ। তবুও আন্দামান থেকে পালিয়ে আসার জন্য সেদিন কোন প্ল্যানে হাত দিই নি তার একমাত্র কারণ 'পালিয়ে যাবো কোথায়'?

পুলিশ যখন ভাবছিল আমাদের আন্দামান জেল থেকে পালাবার প্ল্যান ছিল কিনা তখন তা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমি বলছি আমাদের স্বদেশে থাকার সময়কার কথা, তখনো আমাদের জেল হয়নি, নির্বাসন যাওয়ার

আদেশও ঘোষিত হয়নি। আমাদের মামলা তখন চলছে। মাস্টারদা আমায় লিখে ও বলে পাঠালেন যেন আমি গণেশের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি বর্তমান অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে কী ধরনের রাস্তায় পরিকল্পনা নিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারি। এই রকম একটি প্ল্যান করি যে, ডিনামাইট দিয়ে সরকারী ঘাঁটি ও ব্রীজ, সৈন্যবোঝাই লরি প্রভৃতি কিভাবে বিধ্বংস করবো। শহরে ডিনামাইট পুঁতে রাখা ও তার ফেলে ফেলে অনেকদূর গোপনে নিরাপদ জায়গায় সুইচটি কি করে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই ছিল প্রধান সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ, সত্যি বলতে কি আমরা ডিনামাইট তখনো সংগ্রহ করতে পারি নি। পূর্বে আমরা ডিনামাইট সংগ্রহ করতাম কোলিয়ারীর কোন গুদাম বা কোলিয়ারীর কোন কারখানা থেকে। ছোট চট্টগ্রাম শহর তখন পুলিশ ও মিলিটারীতে ছেয়ে ফেলেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘাঁটি। রাস্তায় রাস্তায় তারা টহল দিচ্ছে মোটর গাড়ি আর সাইকেলে। এই সবকিছুকে এড়িয়ে তাদের নজরের বাইরে ডিনামাইট পুঁতে রেখে একশো দুশো গজ দূরে ইলেক্‌ট্রিক তার নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। সেইজন্য নিখুঁত ও বিস্তারিত পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমাদের অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে। যুদ্ধের নীতি অনুসারে আমরা নিম্নলিখিত এই কটি জায়গা স্থির করি।

[এক] জেলখানার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিনামাইট পুঁতে ও সবার দৃষ্টির অগোচরে তার ফেলে একশো দুশো গজ দূরে নিয়ে গিয়ে সুইচ রাখা হয়েছিল।

[দুই] কোর্ট বিল্ডিং-এ যেখানে আমাদের ট্রায়াল হচ্ছিল সেই ট্রায়ালের বিচারপতিরা যেন এসে বসতে না পারেন, তাই আগে থেকেই তাদের মোটর গাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য কয়েকটি গোপন স্থান কোর্টের পাহাড়ের উপরেই নির্দিষ্ট করা ছিল।

[তিন] যে পথে ট্রাইবুনাইলের গাড়ি তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে তাঁদের কোয়ার্টারে ফিরে যেত সেই পথেও অর্থাৎ 'লাভ লেনের' বিশেষ স্থানে ডিনামাইট পুঁতে রাখা হয় এবং সেখান থেকেই ইলেকৃটিক তার লোকের চোখের অন্তরালে নিয়ে গিয়ে ব্যাটারি ও সুইচের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। সুইচ বোর্ডটিও খুব গোপনে রাখার ব্যবস্থা ছিল।

[চার] আমরা যে বাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করে ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করতাম সেইরকম একটি গোপন বাড়ির অস্তিত্ব পুলিশকে খুব চতুরতার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। পুলিশ খবর পেয়ে সেই বাড়িটি অনুসন্ধান

করতে আসবেই সেটি ধরে নেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে এই বাড়ির খবরটি দিয়ে তাদের প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলার জন্য নিজেরাই এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা করি।

[পাঁচ] বড়-পল্টন যেখানে ইওরোপীয়ানদের খেলার টেনিস ক্লাব ছিল, সেই ক্লাবের তত্ত্বাবধানে টেনিস গ্রাউণ্ডের মধ্যে দর্শকদের জন্য বিশেষ স্থান রক্ষিত ছিল। সব আসনই বড় বড় সোফা। এই আসনের তলায় কয়েকটি ডিনামাইট পুঁতে রাখার বিশেষ প্ল্যান ছিল।

[ছয়] রেল স্টেশন থেকে মিলিটারী ব্যারাকে যাওয়ার পথে মিলিটারী লরি উড়িয়ে দেবার জন্য বিশেষ কটি স্থানে বিস্ফোরক পুঁতে রাখার ব্যবস্থা ছিল।

ডিনামাইট ডিনামাইট বলে আমরা অনেক বলাবলি করেছি কিন্তু আমাদের কাছে তখন পর্যন্ত একটি ডিনামাইটও ছিল না। পুলিশও তা জানত। এর অভাব পূরণ করেছিলাম অর্ডিনারি বন্দুকের বারুদ দিয়ে। তাও সেই বারুদ বিলাতী বারুদ নয়। বিলাতী বারুদের ক্রিয়াশক্তি অনেক বেশী। আমরা নিজেদের তৈরী বারুদ দিয়ে ল্যাণ্ডমাইন তৈরী করি। ল্যাণ্ডমাইন যা মিলিটারীতে ব্যবহার করা হয়, সেই সব ল্যাণ্ডমাইনের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের ল্যাণ্ডমাইনগুলোকে ল্যাণ্ডমাইন বলে মনেও হবে না। তবুও সেই সব ল্যাণ্ডমাইন আমরা তৈরী করেছিলাম। তা পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট ডাঃ শেলডন আদালতে পেশ করেছিলেন তা থেকে আমরা বুঝেছিলাম পাঁচ সের ওজনের কানেস্তারা অতি সহজেই একটা লরি উড়িয়ে দিতে পারে। আমরা দু' সাইজের ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করি। একটা পাঁচ সের ও অন্যটা দশ সের ওজনের। এই আমাদের তৈরী ল্যাণ্ডমাইনের রিপোর্ট মোকদ্দমার সময়। সরকারী বিস্ফোরক দ্রব্যে এক্সপার্ট মিঃ শেলডন কোর্টে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটি হল এই—তিনি একটি পাঁচ সের ক্যানেস্তারায় তৈরী ল্যাণ্ডমাইন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তাঁর রিপোর্টে ছিল এক গজ মাটির নীচে ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে তারপর সেই তার একশো গজ দূরে নিয়ে গিয়ে আড়ালে বসে সুইচ টিপলে যে বিস্ফোরণ হল, তাতে প্রায় দশ ফিট ব্যাসের একটি গর্ত হয়ে গেল এবং যেসব ইট পাথর দিয়ে গর্ত চাপা দিয়েছিলেন সেগুলিকে প্রায় বিশ পঁচিশ ফিট উর্ধে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

ল্যাণ্ডমাইনটির ডিজাইন সম্পূর্ণ আমাদেরই ছিল। ক্যানেস্তারা দুই সাইজের তৈরী হল। প্রত্যেক ক্যানেস্তারার ভেতরে একটি করে চার আউন্সের কৌটো

রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই কৌটায় বিলিতী গান পাউডার দিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল। এই গান পাউডারকে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা ছিল। ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাও নতুন ধরনের। ইলেকট্রিক বাল্বের এক সিকি পরিমাণ জায়গা ফাইল দিয়ে চৌকো করে কেটে ফেলে ভেতরে বাল্বের ফিলামেন্টের সঙ্গে সামান্য কিছু গান পাউডার জড়িয়ে দেওয়া হত। ইলেকট্রিক সুইচটি টিপে দিলে গানকটন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে ছোট চার আউন্সের টিনের কৌটো যাতে বিলিতী গান পাউডার ভর্তি ছিল সেটিকে ফাটিয়ে দিত। এই বিস্ফোরণ ক্যানেস্তারার পাঁচ সের ও দশ সের হাতে তৈরি গান পাউডারকে মুহূর্তে প্রজ্জলিত করে এক ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটাতো। চার আউন্সের কৌটো তলায় থাকত, আর উপরে পাঁচ সের বা দশ সের আমাদের নিজেদের তৈরী বন্দুকের পাউডার দিয়ে সেটাকে খুব চেপে চেপে ঢেকে রাখা হত। আমাদের 'ল্যাণ্ডমাইন'কে তৈরী করার জন্য যে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত সেগুলি বহুদিন ধরে মাটির তলায় থাকলেও বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যেত না। সেইজন্য ক্যানেস্তারার ভেতরে আগে ব্ল্যাক পেণ্ট লাগিয়ে শুকিয়ে নিতাম। তারপর ব্লটিং পেপার দিয়ে ভেতরটায় লাইনিংয়ের মত ব্যবহার করতাম। যে তার চার আউন্সের কৌটা থেকে আমরা বাইরে আনতাম, সেটি আনা হত নীচে থেকে কানেস্তারার উপরে, তারপর ঢাকনি দিয়ে বাঁধা হোত কিন্তু ঢাকনি লাগবে কেন? সেইজন্য ঢাকনির ধারটা কেবলমাত্র তার পাস করবে সেরূপ খাঁজ করে ঝালাই দেওয়া হত। তারগুলো এলো ক্যানেস্তারার একেবারে উপর থেকে, তার উপরে ঢাকনি দেওয়া হল। সেইজন্য যেটুকু মাত্র জায়গা রেখে ঝালাই দিয়ে রাখা প্রয়োজন, সেইভাবে করা হয়েছিল। এই তারটি যতদূরে ইচ্ছে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক ব্যাটারির সঙ্গে সুইচ দিয়ে সংযোগ করে রাখা হয়েছিল যেন সুইচ টিপলেই বিস্ফোরণ হয়। তারটি ক্যানেস্তারার ওপর দিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে, সেইজন্য সবক'টি ক্যানেস্তারা ভাল করে অয়েল-ক্লথের থলি দিয়ে বাঁধা হল। থলির মুখটা জল ঢুকাতে না পারার মত বাঁধা হল। তার উপরে আর একটি অয়েল ক্লথের থলি ওপর দিয়ে পেরিয়ে নীচের দিকে মুখটা আগেরটার মত করে বাঁধা হোল। তারটি প্রথম থলি থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল এবং দ্বিতীয় থলির তলা থেকে তার বার করে রাখা হোল। এই তারের সঙ্গে তার জুড়ে নিতে হবে সেখানে ব্যাটারী ও সুইচ রাখা হবে। এই দুরত্বটা প্রয়োজনবোধে টার্গেট অনুযায়ী রাখা হোত যেন এটা

অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এবং এই বিরাট বিস্ফোরণে যেন নিজের বিপদ না ঘটে।

খুব চতুরতার সঙ্গে যদি ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখা না যায় এবং সংগোপনে তার টেনে এনে গুপ্ত স্থানে সুইচটি ব্যবহার করার জন্য ব্যবস্থা না থাকে, তবে এই ভয়ানক বিস্ফোরক দ্রব্য খুব কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কাজেই প্রস্তুত করা যতখানি ঝামেলা, প্রয়োগ করাটা তার চেয়ে বেশী ঝামেলা। তাছাড়া বিস্ফোরক সামগ্রী যোগাড় করা এবং তা মজুত ও প্রস্তুত করার যে বিরাট আয়োজন তা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। আমরা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম, ডিনামাইট যখন পাইনি, তখন নিজেদের তৈরী বারুদ দিয়েই ডিনামাইটের অভাব মেটাবো। ছোট্ট একটি চার বা আট আউন্সের ডিনামাইটে যে কার্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব, আমাদের তৈরী করা ল্যাণ্ডমাইন দিয়ে তা করতে হলে বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োজন অনেক বেশি। চার আউন্স ডিনামাইটের সমান কাজ পেতে হলে অন্ততপক্ষে এক মণ দু' মণ গান-পাউডারের প্রয়োজন হয়। তবু আমরা আমাদের নিজের সামর্থ্যে নিজের প্রয়োজনে ল্যাণ্ডমাইন তৈরী করে নিতে পারি, কিন্তু ডিনামাইটের ভরসায় বসে থাকলে কখন যে তা পাবো তার কোন ঠিক ছিল না। চট্টগ্রামে তখন 'ডিনামাইট কনস্পিরেসি কেস' হয়ে গেল কিন্তু সেই কেসে একটি ডিনামাইট বা একটি ডিটোনেটারও ছিল না। তবুও পুলিশ প্রচার করল, 'ডিনামাইট কনস্পিরেসি কেস' বলে। পুলিশ কিংবা সরকার কেন ভীত হল? কেন সত্যি কথা 'ল্যাণ্ডমাইন কনস্পিরেসি কেস' বলে মামলা চালালো না? তার একমাত্র কারণ এই ভয়ানক জিনিসের প্রচার হোক তা তারা কোনদিনও চায়নি। আমিও বলিনি বা বলতে চেষ্টা করিনি। এটুকু আগে কখনও বলিনি। যদি কেউ মনে করেন এটুকু থেকেই তাঁরা ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করার সঠিক ব্যবস্থা করতে পারবেন, তবে সেটি ভুল হবে। এর সঙ্গে আরো হাজারটি জিনিস জানার আছে। আর সেইসব না জেনে এই সাংঘাতিক কাজে হাত দেওয়ার অর্থ হল অনভিজ্ঞতার জন্য ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত করার সময় হয় লোক মারা যাবে আর নয়ত বিস্ফোরণে পুড়ে যাবে অথবা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যাবে। এই সবই আমাদের দলে ঘটেছে। তাছাড়া বিপ্লবী পরিস্থিতি না থাকলে ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত করার কোন প্রয়োজনই নেই। সেজন্য আমার স্থির সিদ্ধান্ত সব না জেনেশুনে, না বুঝে, এইরূপ মারাত্মক কাজে কেউ যেন হাত না দেয়।

এখন আর একটি জিনিস বলার আছে। এই সেদিন আমার ঘরে বসে

আমরা পুরোনো দিনের বিপ্লবী সাথীরা কথা বলছি। তার মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের ডিনামাইট কেসের প্রধান নায়ক অর্ধেন্দু গুহ। তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্যতম সাথী ছিলেন কালিকিংকর দে। কালিকিংকর দে আমার পূর্বস্মৃতির অনেক কথা সবাইকে বলছিলেন। আমারও শুনে খুব ভাল লাগছিল। শ্রীকালি দে বিবাহিত, তাঁর দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। তারা তিনজনেই বড় হয়েছে।

তার স্মৃতি উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও পূর্বদিনের কথা অনেক কিছুই মনে পড়তে লাগলো। মাস্টারদা আমার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক কথা কী কী বলতেন তা সে বলছিল। যখন মাস্টারদা ফেরার ছিলেন, তখন কালিকিংকর দেও তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল থাকার সুযোগ পেয়েছিল। এই কালিকিংকর দে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলির ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। এই ইওরোপীয়ান ক্লাবটি আক্রান্ত হয় চট্টগ্রাম আর্মারী আক্রমণের প্রায় তিন বছর পরে। সেই আক্রমণ কালে প্রীতিলতা সেখানে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। সেই প্রসঙ্গে এখন আমি আর কিছু বলছি না। কালিকিংকর দে যদি তাঁর বাড়ির সব লোকের সমর্থন আমাদের দলের জন্য জোগাড় করতে না পারত, তবে হয়ত ডিনামাইটের এই ব্যাপক পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা সম্ভব হোত না। ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল যেহেতু বাস্তবে তারা ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়।

অর্ধেন্দু গুহের যেমন বিশেষ অবদান আছে ডিনামাইট পরিকল্পনা নিয়ে আক্রমণ চালাবার, তেমনি কালিকিংকর দে-র অবদানও কোন অংশে কম নয়। সে বলছিল, আমি নাকি চট্টগ্রামে শ্লোগান তুলেছিলাম—'প্রত্যেকটি বিপ্লবী সদস্যের বাড়ি হবে এক-একটি দুর্গ।' সেখান থেকে আক্রমণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকবে।

শ্রীগণেশ ঘোষের বাড়ি ও দোকান আমাদের একটি দুর্গবিশেষ ছিল। চট্টগ্রাম শহরের উত্তর প্রান্তে ছোট টিলার উপরে আনন্দের বাড়ি একটি সুন্দর দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। শহরের দক্ষিণে কর্ণফুলি নদীতীরে রজতের বাড়িকে আমরা দুর্গ হিসাবেই ব্যবহার করেছিলাম। 'ডবলমুরিংস' এলাকাতে কালিকিংকর দে-র বাড়িটি আমাদের কালে দুর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল বললে কোন অন্যায় হবে না।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে তরুণ বিপ্লবীরা ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে ইংরেজ

সরকারের পোর্ট টাউন বন্দরসহ টাউনটিও দখল করে নেয়। তারপর তিন বছর আরো অনেক ছোট ছোট গেরিলা সংঘর্ষ ঘটেছিল। এবং সমস্ত শহরটি মিলিটারির অধীনে ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কে কতখানি সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা চিহ্নিত করার জন্য পুলিশ লাল, নীল. সাদা কার্ড প্রত্যেক শহরবাসীকে দিয়েছিল। প্রত্যেক বড় বড় রাস্তার মোড়ে ও বিশেষ স্থানে চেকপোস্ট বসালো যেখানে পুলিশ ও মিলিটারী একযোগে কাজ করত। যে-কোন লোককে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে সার্চ করত। সৈন্য নিয়ে টহলদারী ট্রাক সারা শহরে ও শহরের উপকণ্ঠে চব্বিশ ঘণ্টাই টহল দিত। কোন একটি স্থানকে যদি পুলিশ সন্দেহ করত, তাহলে যখন তখন সেখানে গিয়ে হানা দিত। এরূপ কড়া পাহারার মধ্যে তারা ল্যাণ্ডমাইন তৈরী করে এবং তা বিশেষ বিশেষ স্থান খুঁড়ে রাখে ও গোপনে মাটির নীচ দিয়ে তার নিয়ে গিয়ে সুইচ বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত করে। তারা জেলখানার দেওয়াল উড়িয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম আর্মারী রেডের বিপ্লবী যুবকদের মুক্ত করার জন্য প্ল্যান করেছিল। জেলখানাটি সতর্ক মিলিটারী পাহারার অধীনে ছিল। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের এক কোম্পানি সিপাই সব সময় পাহারা দিত। তারা জেলখানা অফিসের ছাদের উপরে মেসিনগান ফিট করে সারা দিনরাত সেখান থেকে চারদিকে লক্ষ্য রাখত। জেলখানার প্রাচীরের চারটি কোণায় ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে সেপাইদের চৌকি দেওয়ার স্থান ঠিক করেছিল, দেওয়ালের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিল। কাঁটাতারের বেড়া সম্বন্ধে একটু না বললে ধারণাটা স্পষ্ট হবে না।

১৩

মিলিটারীরা একটা তার দিয়ে বেড়া দেয় না। অন্ততঃ দশ-বারো ফিট জায়গা জুড়ে চারদিকে এক গজ লোহার খুঁটি অনেকগুলো পোতা হয় এবং সেই সব খুঁটির সঙ্গে কাঁটাতার জড়িয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। কাজেই কাঁটাতারের বেড়া এড়িয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। জেলের সামনে এক কোম্পানি মিলিটারীর ছাউনি পড়েছিল। ঘন ঘন অফিসারদের আগমন ও ইন্সপেক্‌সান সিপাইদের সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে বাধ্য করেছিল। এই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে জেলখানার প্ল্যান তারা প্রায় শেষ করে।

পাহাড়ের উপরে কমিশনার সাহেবের বাংলো। পাহাড়ের নীচে একটি বড় রাস্তার সঙ্গে লাভলেনের সংযোগ ছিল যা দিয়ে ইওরোপীয়ান ক্লাবের পাশ দিয়ে পুলিশ লাইনে যায়। লাভলেনের উপরে তারা তিনটি ল্যাণ্ডমাইন পোতার কাজ প্রায় সমাপ্ত করে। এইটি খুব দুরূহ কাজ ছিল—কারণ, রাত্রিবেলাতেও পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ি প্রতি পাঁচ-দশ-পনের মিনিট অন্তর প্রায় প্রত্যেকটি রাস্তার উপর দিয়ে টহল দিত, বিশেষ করে এই লাভলেনটির উপর দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ি হরদম যাতায়াত করত। আগেই বলেছি পাঁচ সের ও দশ সের ক্যানেস্তারায় বারুদ ভর্তি করে ল্যাণ্ডমাইন তৈরি হয়েছিল। এইসব ল্যাণ্ডমাইন ইটের রাস্তার নীচে চোখের অন্তরালে পুঁতে রাখা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তবু তারা সেই দুঃসাধ্য কাজও কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রথম পদক্ষেপে তারা অনুরূপ রাস্তা খুঁড়ে ডামি ক্যানেস্তারা পুঁতে রাখার মহড়া দেয়। ইটের রাস্তা খোঁড়ার পরে যদি রাস্তাটা খুব সুন্দর করে মিশিয়ে দেওয়া না যায়, তবে কোন জিনিস পোঁতা আছে, তা বোঝা সম্ভব। সেইজন্য খোঁড়ার সময় হুঁশিয়ার হয় যেন খুব তাড়াতাড়ি খোঁড়া শেষ করতে এবং খোঁড়ার জন্য ছোট যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। যেখানে গর্ত খুঁড়বে, তার পাশেই চট রাখত আর মাটি, ইট প্রভৃতি তাড়াতাড়ি খুঁড়ে চটের উপর রাখত। খোঁড়া শেষ হলে সেগুলো দিয়ে চাপা দিয়ে খুব ভাল করে

রাস্তার অন্য অংশের সঙ্গে মিশিয়ে দিত যেন বোঝা না যায়। তবে সবচেয়ে বড় মুশকিল ছিল, পুলিশের গাড়ি যখন তখন রাস্তা দিয়ে যেত, তার জন্যই সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। যে গর্ত করত, তার একশো গজ, দুশো গজ দূরে রাস্তার দু'দিকে পাহারা থাকত। তারা সেখান থেকে যতদূর সম্ভব দূরে দেখতে পেত কোন মোটর ট্রাক বা গাড়ি আসছে কিনা। সেই রকম গাড়ির আগমনবার্তা জানতে পারলে তারা তক্ষুনি মাটি-ইটগুলো পোঁটলা বেঁধে নিত আর লোহার পাতটি টেনে এনে গর্ত ঢেকে দিত। তারা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে, বিশেষ কোন আড়ালের পাশে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত। গাড়ি চলে যাওয়ার পর আবার এসে অসমাপ্ত কাজ শেষ করত। এইভাবে বহু ধৈর্য ও কৌশলের সঙ্গে ল্যাণ্ড-মাইন বড় রাস্তার উপরে পুঁতে রাখতে হয়। কেবল লাভলেন নয়, অন্যান্য রাস্তাতেও তারা ল্যাণ্ডমাইন এইভাবে পুঁতে রাখে। যদি তাদের কাছে ডিনামাইট থাকত, তবে এত পরিশ্রম হতই না। কারণ ডিনামাইট অনেক ছোট।

লাভলেন রাস্তার পর দিয়ে ট্রাইব্যুনালের দু'জন কমিশনার ও একজন প্রেসিডেণ্ট একই গাড়িতে যাওয়া-আসা করত। ট্রাইব্যুনালকে খতম করার উদ্দেশ্যে তারা কাছারি পাহাড়ের উপরে ট্রাইব্যুনালের আসা-যাওয়ার পথে ল্যাণ্ড-মাইন বিশেষভাবে বসাবার ব্যবস্থা করে। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যদের নিয়ে মোটরগাড়ি সামনে দিয়ে ঘুরে কোর্টের পেছনে যেত। আর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা উপরে উঠতেন। কোর্ট ঠিক পাহাড়ের উপরে, কোর্টের চারপাশে যে রাস্তা গেছে, তার প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্তরের রাস্তাটি প্রায় দশ-বারো হাত নীচু দিয়ে গেছে। ল্যাণ্ডমাইনগুলো বসানো হয়েছিল উপরের পথটিতে রাস্তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে। তার কারণ যদি একটি ল্যাণ্ডমাইন গাড়ির ঠিক নীচে না পড়ে, তবে কোন না কোন একটি পড়বেই। এই তিনটি মিলিয়ে একটি তার গিয়েছিল মাটির নীচে দিয়ে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে। সেটি আবার আরেক ধাপ নীচে আরেকটি পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে খুব আড়ালে বসে সুইচ টেপা যায়, এমন স্থানে রাখা হয়েছিল। এই প্রস্তুতিটির উদ্দেশ্য ছিল ট্রাইব্যুনালের গাড়ি যখনই মোড় ঘুরবে তখনই বিস্ফোরণ করা হবে। তাছাড়া আরো বন্দোবস্ত ছিল। এই রকম একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটে যাবার পর পুলিশ ও মিলিটারীর বড় বড় সাহেব, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশানাল কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেনই, তাই তাদের ধ্বংস করার

উদ্দেশ্যও সম্ভাব্য দু'টি স্থানে আর দুটি ক্যানেস্তারা পুঁতে রাখা হোল এবং তার ও সুইচ ভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এছাড়া সম্ভাব্য বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে আরও দুটি ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রেখে সুইচ ও তার অন্যত্র গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়া হল।

যেদিন কোর্টে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল সেই দিন একটি ল্যাণ্ডমাইন পোঁতা হয়নি বলে কাজ শেষ হল না। তারা কাজ শুরু করত রাত সাড়ে বারোটা একটার সময়। কাছারি ট্রেজারী বিল্ডিং ট্রাইব্যুনাল কোর্টের অংশটুকুতে এক কোম্পানি সৈন্য প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকত। তাদের অনেকেই রাত্রিবেলা পায়খানা. প্রস্রাব করতে উঠত, কাজেই তাদের এড়িয়ে এই পোঁতার কাজ সম্পন্ন করতে হয়। পাহারা মোতায়েন রেখে কাজ শুরু করত অর্থাৎ যদি কাউকে সেদিকে আসতে দেখতো, একটি ঢিল মেরে পাখীর শব্দের মত কোন শব্দ করে তারা সংকেত জানাত। ঠিক এই রকম ভাবে তারা আরেকটি বাড়ি, যে বাড়ির খোঁজ তারা নিজেরাই পুলিশকে দিয়ে ডেকে আনবে ঠিক করেছিল সেই বাড়ির কামরাতেও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সুইচে ল্যাণ্ডমাইন সংযুক্ত করা ছিল। একটি বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই সংবাদ পেয়ে বড় অফিসাররা আসতই। তখন তাদের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হোত।

শেষের দিন কোর্টে ল্যাণ্ডমাইন সব কটি পোঁতা হল না, একটি মাত্র বাকি ছিল। ভোরে খালি গায়ে একটু কাদা-টাদা মাখা গায়ে সেই ল্যাণ্ডমাইনটি নিয়ে তাদের একজন খুব বিশ্বাসী কমরেড নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। জেলের সামনের রাস্তার উপর জেল ওয়ার্ডার তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ থানায় তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই গ্রেপ্তার করে।

সবার মনে হবে এক্সিডেন্টালি জেল ওয়ার্ডার তাকে সন্দেহ করে ফেলল। তাই এইরূপ ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, এইটি পুলিশের একটি তৈরী ফাঁদ। প্রশ্ন আসবে পুলিশ কি করে জানবে সেইদিন ল্যাণ্ডমাইন সবকটি পোঁতা হয়নি? আর কি করেই বা জানবে এই রাস্তা দিয়ে সেই ছেলেটি ল্যাণ্ডমাইন নিয়ে যাবে? এই প্রশ্ন শুনে লোকের মনে হবে যে এইটি তৈরী ফাঁদ হতে পারে না কিন্তু আমি বলছি এইটি তৈরী ফাঁদ হতে পারে কারণ যে গ্রুপটি সেই রাত্রিবেলা ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে যে পুলিশ এজেন্ট ছিল, সে যদি ইচ্ছে করে অনুপস্থিত

থাকে, তবে তার অনুপস্থিতিতে সবকটি ল্যাণ্ডমাইন পোঁতা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, যদি ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে কে কে সাধারণতঃ ফিরিয়ে নিয়ে যায়? আমার মতে পুলিশের পক্ষে পুরোটা জানা সম্ভব ছিল না কিন্তু এগুলো জানা সম্ভব হয়েছে কারণ তাদের এজেণ্ট নিশ্চয় ছিল। কাজেই নিবারণকে জেল ওয়ার্ডার ধরবে তাতে আশ্চর্য কি! যদি আই. বি. পুলিশ গ্রেপ্তার করত তবে দলের লোক ধরে নিত যে, দলের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আমি যেভাবে বললাম সেভাবে যদি গ্রেপ্তার ঘটানো যায় তবে ভাল ভাবেই বিভ্রান্ত করা সম্ভব এবং পুলিশের যে কোন কারসাজি আছে, তা বিপ্লবীদের বোঝা সাধ্যের বাইরে। কিন্তু আমি আমার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু বলতে পারি, এটি পুলিশের কারসাজি এবং এই ভাবে জেল ওয়ার্ডারকে দিয়ে ধরানোটা পুলিশের ইচ্ছায় ঘটেছে।

নিবারণ ধরা পড়ার পরে পুলিশ কয়েকটি বাড়ি সার্চ করল এবং কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারও করল। মনে হবে যেন নিবারণই ঐসব বাড়ির খোঁজ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, নিবারণ সেই সব কোন খবরই দেয় নি। পুলিশের এটাও কর্তব্য তাদের গুপ্তচরদের অস্তিত্ব গোপন রাখা। তাই তাদের প্রচেষ্টা থাকে গুপ্তচরদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যের প্রতি সন্দেহ উদ্রেক করাবার।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি যা বুঝেছি বৃটিশ আমলে ট্রেণ্ড পুলিশ অনেক বেশি তাদের কাজে ফলবান হয়েছে, আর এই যুগে আমাদের স্বদেশী আমলের পুলিশরা ততোধিক যেন অসহায় হয়ে পড়েছে। মূল দোষ হচ্ছে যে, বর্তমানে পুলিশ স্টাফদের কাজ করতে হয় প্রচুর। তাদের সময় হাতে থাকে না। সেই কারণে বর্তমানের পুলিশের কাজের সফলতা কম দেখা যায়। নিবারণকে ধরার পর কোর্ট অফিসের পাহাড়ের উপরে যে স্থানে তারা ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রেখেছিল সেগুলি তারা খুঁড়ে বার করল, ইলেকট্রিক তারও খুঁড়ে খুঁড়ে বার করেছিল। কাজেই সুইচ বোর্ডগুলি কোথায় ছিল তাও তারা পেল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নিবারণই এগুলি ধরিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি বলতে পারি সে ধরিয়ে দেয়নি। দুশো-আড়াইশো গজ দূর থেকে ইলেকট্রিক বাম্ব জ্বালাতে হলে সামান্য টর্চলাইটের ব্যাটারিতে খুব সহজ হয় না, তার জন্য মোটরের স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবেই। স্টোরেজ ব্যাটারিগুলোও তারা প্রত্যেকটি সুইচের সঙ্গে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। ইলেকট্রিক বাম্ব যা বাড়িতে জ্বালাই, সেই বাম্ব ব্যবহার করা হয়নি, তার

কারণ, সেই বাল্বের তার রাস্তার উপরের গাড়ির যাওয়ার ধাক্কা সহ্য করতে পারবে না। সেইজন্য আমরা মোটরের হেডলাইটের বাল্ব ব্যবহার করি।

এই বিরাট ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা আবিষ্কার করার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও এত আয়োজন তারা কি করে করতে পারল। যেদিন নিবারণকে ধরল, সেদিন তারা তাদের একটি প্রধান ঘাঁটিতেও অনুসন্ধান চালায় এবং কাউকে কাউকে সেখানে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। আমাদের মামলার আসামী অর্ধেন্দু গুহ ও অনিল রক্ষিতকেও বন্দী করে। পুলিশ হানা দেয় দিনদুপুরে তাদের 'ছোট কারখানায়' অর্থাৎ যেখানে ল্যাণ্ডমাইন-গুলো প্রস্তুত হত।

যে বিবরণ এতক্ষণ পর্যন্ত দিলাম, তা হচ্ছে অপারেটিভ পার্ট। কিন্তু এর পেছনের প্রস্তুতি-পর্ব কত যে ভীষণ ও কঠিন, তা না জানলে বোঝাই যাবে না। পুলিশ হানা দিয়ে প্রায় দশ মণ গান-পাউডার ও ক্যানেস্তরা আটক করল ও নানাজনকে বন্দী করল। একে সংগঠনের প্রথম সারির অনেক লোকের বিচার হচ্ছিল, তাছাড়া আরও অনেককে এই ব্যাপারে ধরে নিয়ে গেল। কাজেই এই ডিনামাইট পর্বের প্ল্যানটি কার্যে পরিণত করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ও দুষ্কর হয়ে পড়বে। পুলিশ মিলিটারীর তৎপরতা বেড়ে গেল। তাদের যেখানে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত হত, সেই জায়গাগুলো পুলিশ জেনে ফেলেছিল। তাই নতুন লোক নিযুক্ত করতে না পারলে অল্প সময়ের মধ্যে আবার অনেকগুলো ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করা সম্ভব হত না। 'বিপ্লবী সদস্যদের প্রত্যেকের বাড়ি এক-একটি দুর্গ হবে'—এই স্লোগানটি বারেবারে তাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছিল। এই স্লোগানই প্রাণে শক্তি ও সাহস জোগায় আর ল্যাণ্ডমাইন আবার প্রস্তুত করার জন্য তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। সেই সময় কালি দে-র স্ত্রী বারুদ তৈরি করার জন্য জাঁতাকলে কয়লা পিষতে লাগল। তার বাবা কুল গাছ কেটে আনলেন এবং তা পুড়িয়ে কয়লা করলেন। তার মা ও স্ত্রী পোড়া পেষা কয়লা থেকে কাপড় দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে মিহি পাউডার বার করে নিল। সোরা এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, তা জাঁতাকলে পিষে নেওয়া হয়েছিল। গন্ধক আরেকটি রাসায়নিক পদার্থ তাও পিষে নেওয়া হয়েছিল। এইসব জাঁতাকলে পেষার কাজ কালি দে-র বাড়িতে পুরো উদ্যমে চলেছিল। এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন কালি দে-র কাকা, বাবা, মা এবং পাড়ার দুটি ছেলে। তাঁরা দিন রাত পেষা, ছাঁকা ও মেশানোর কাজে নিযুক্ত হলেন ও বাড়ির বাইরে উপযুক্ত স্থানে পাহারা রেখে

বাড়িতেই দিনরাত্র কাজ চলল। পুলিশের অতর্কিত আক্রমণে যে দশ মণ তৈরি পাউডার তাদের ফেলে দিতে হয়েছিল, সেটাকে পূরণ করতে চেষ্টা করেও মাত্র পাঁচ মণ তৈরী হয়। সেই অবস্থায় এ পাঁচ মণ গান পাউডার তৈরি করাও একটি দুরূহ ব্যাপার বলে মনে করতে হবে। তাদের অনেকগুলো গুপ্ত জায়গা পুলিশ আবিষ্কার করেছে। অনেক দায়িত্বশীল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের তৎপরতা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। শহরে স্বাভাবিক ঘোরাফেরা একেবারে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল, কাজেই প্রচুর সোরা, প্রচুর গন্ধক, প্রচুর কয়লা ও এর সঙ্গে প্রচুর পটাসিয়াম ক্লোরাইড কোথা থেকে কিভাবে জোগাড় হবে এবং কিভাবেই বা একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাচার করা যাবে? পথে যে-কোন জায়গায় আটক হতে পারে, পুলিশ সেইরকম ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। এই রকম বিপদের মধ্যে আর না গিয়ে এই পরিকল্পনা বাদ দেওয়া যেত। কিন্তু কেউই তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কাজেই সীমিত শক্তি, সীমিত সুযোগ ও সুবিধার মধ্যে তারা আবার আগের উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেছিল। বিপ্লবীদের গুপ্ত বাড়ি যেগুলি দুর্গের মত তাদের আয়ত্তে ছিল, সেইসব বাড়ির সবাইকে পূর্ণ উদ্যমে কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হল। তারা একবাক্যে সেই সিদ্ধান্ত অন্তর থেকে অনুমোদন করল। আদেশের অপেক্ষায় আর কেউ ছিল না। তারা নিজেরাই উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। কাজের প্রোগ্রাম দশদিনে সমাপ্ত করতে হবে এমন এক সাধারণ নির্দেশ তাদের উপরে ছিল। কালি দের নিজের বাড়ি ও তার কাকার বাড়ি পুরোদস্তুর গুপ্ত কারখানায় পরিণত হল। এই সব বাড়ি ইতিমধ্যে সার্চ হয়ে গেছে। অনেককে ধরে নিয়ে গেছে। তবু শংকা নেই, আছে বিচক্ষণতা ও দুর্জয় সাহস। পুলিশ ও পাড়ার লোকের চোখ এড়িয়ে বাইরের বেশি কমরেডের তার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়ির লোককেই এই প্রস্তুতি-কার্য সমাধান করতে হবে। তাই একদিকে কাজ চলল কয়লা নির্মাণের, অন্য দিকে চলল সোরা, গন্ধক আর পটাসিয়াম ক্লোরাইড কেনা ও জোগাড় করার। তারপর এই তিন রকম রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণের জন্য তাঁদের এইগুলিকে খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে নিতে হয়। এক বাড়িতে দু'জনে কুলগাছ কেটে পুড়িয়ে রাখল আর দু'জন এই কয়লা জাঁতিতে গুঁড়িয়ে একেবারে মিহি করে পাউডার তৈরি করল। তিন রকম রাসায়নিক পদার্থও গুঁড়িয়ে পিষে মিহি করে নেওয়ার জন্য তিনটি জাঁতি সর্বক্ষণ ঘুরেছে। অন্যদিকে পাঁচ সের ও দশ সেরের টিনের

ক্যানেস্তারা তৈরি করা হচ্ছিল। তারপর ইলেকট্রিক তার, স্টোরেজ ব্যাটারি প্রভৃতি যোগাড় করার কাজে তারা লেগে গেলেন ও এই কাজ সমাপ্ত করেন।

এত বাধা সত্ত্বেও যখন বিপ্লবীরা 'ডিনামাইট পরিকল্পনা' শেষ করতে চলেছে, আর জেলখানার মধ্যে তাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ, তখন এক ভীষণ বিভ্রাট দেখা দিল। জেলখানার অত প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় আধ-মণ গান পাউডার ভিতরে নিয়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখা, দুটো আর্মি রিভলবার পুলিশ—মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে জেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, আর জেলখানার দেওয়াল বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়ে তাদের বেরিয়ে যাওয়া প্রায় ঠিক। তখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জেল অফিসারদের মনে শান্তি ছিল না। রোজই তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার পরে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিলিটারী কম্যাণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য অফিসাররা জেলের অভ্যন্তরে ঢুকে খোঁজ করত কোন অস্ত্রশস্ত্র, বোমা প্রভৃতি জেলের ভেতরে আনা হয়েছে কিনা। একজন সাধারণ কয়েদী একটি রিপোর্ট দিয়েছিল যে, সে দেখেছে বাবুরা বোমা জাতীয় জিনিস স্তূপীকৃত নারকেলের ছোবড়ার নীচে ঢুকিয়ে রেখেছে। এইরকম রিপোর্টটি জেলারবাবু খুব বিশ্বস্ত সূত্রের খবর বলে মনে করলেন এবং এই কায়েদীটিকে নিয়ে গিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। এই রিপোর্টের পরে জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে একমত হয়ে ঠিক করলেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ও আমাকে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার সেলে এনে ঢোকাবেন। সত্যিই একদিন সকালে এসে বললেন, আপনারা আপনাদের সেলে এখুনি চলুন। আমরা জেলারের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আবার সেলে এলাম। তারপরে দেখলাম সেলের সামনে ইঁট এসে জমতে লাগল। মিস্ত্রী এলো এবং মিস্ত্রীকে বলল যে আমাদের সেলের সামনে যে অ্যান্টিসেল (দেওয়াল ঘেরা ছোট উঠোন) আছে, সেই উঠোনের মেঝেকে কংক্রীট দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবে। এই আদেশ দেওয়ার পর কাজ চলতে লাগল। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে দেখলাম, ওয়ার্ডার ও সার্জেণ্ট যারা পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তারা খুব ব্যস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটল জেলারের অফিসের দিকে। খুব অল্পক্ষণের মধ্যে জেলার ছুটে এল। আমাদের মনে হতে লাগল মাটি খুঁড়তে গিয়ে তারা মাটির নীচে কিছু পেয়েছে। সেইজন্য তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চার-পাঁচ মিনিটের ভেতরে জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে হাজির। অর্ডার দিল আমাদের তিনজনকে আবার যে যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফিরিয়ে নিতে। জেলারবাবু এসে খুব মিষ্টি কথায় জানালেন, বিকেলবেলা কিংবা আগামীকাল আবার তারা আমাদের এখানে

নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে তারা সেলের সামনে অ্যাণ্টিসেলগুলো ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেবেন যাতে আমাদেরও স্নান করার সুবিধে হয়। এই বলে আমাদের আবার ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। মিস্ত্রীর কাজ চলছিল। আধঘণ্টা পরে জেলে এলার্ম বেল বাজল, জেলে এসেছে মিলিটারী অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরে জেলা হাকিম। তাদের হুকুম হল, সব কয়েদী ঘরে আটক থাকবে। আর হুকুম দিল জেলের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গভীর গর্ত খুঁড়ে তল্লাসী করতে হবে। ইতিমধ্যে তারা নাকি দুটি আর্মি রিভলবার সিরাপের দু-তিনটে বোতলে ভর্তি বন্দুকের বারুদ ইত্যাদি পেয়েছে। পরে জেনেছিলাম সারা জেল খুঁড়ে প্রায় দু'ফিট মাটির নীচে নানা স্থান থেকে উদ্ধার করেছিল বোতলে ভর্তি করা আধমণ গান পাউডার, দুটি আর্মি রিভলবার, কতগুলো রিভলবারের কার্তুজ, টর্চলাইটের চব্বিশটি ব্যাটারি, ইলেকৃট্রিক তার প্রায় দুশো গজ, মোটরে ব্যবহারযোগ্য ইনডাকটিভ কয়েল, মোটর গাড়ির প্রায় চব্বিশটি বারো ভোল্টের বাল্ব একটি আতসী কাঁচ বারোটি ধারালো ছোরা। এই আবিষ্কারের পর পুলিশ নিশ্চিত হয়েছিল, আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি এবং জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারি। এই পুরো প্রস্তুতিটি প্রায় চ্যালেঞ্জ করে।

পুলিশ আর মিলিটারী এইরকম প্রস্তুতি যে চলছে তা তারা জানত বলে আমাদের প্রায় বলেছে জেল কর্তৃপক্ষ তাই বলত। আমরা তাদের উত্তরে বলতাম নির্ঘাৎ আমরা পালাবই, আমাদের কেউ রোধ করতে পারবে না। আমাদের এই প্রস্তুতির কাজ আপনাদের পুলিশ, মিলিটারী এতদিন আটকে রাখতে পারেনি। অসুবিধায় পড়ব সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অসুবিধা জয় করে আমরা পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে পারব, এইরকম দৃঢ় ধারণা আমাদের আছে।

এইগুলি যে আমাদের মিথ্যা বড়াই নয়, তা পুলিশ এটা জানত। পুলিশ কখন বোঝেনি যে বৃটিশ সরকার পরাজিত হবে, কিন্তু বুঝেছিল সরকার প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখীন হবে। যেরকম আঘাত তারা চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সময় পেয়েছিল।

এই সময় থেকে পুলিশ দেখল, সত্যি সত্যিই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চললে তারা খুব লাভবান হবে না। কারণ, অতগুলো রাইফেল নিয়ে মাস্টারদার বাহিনী প্রায় অটুট অবস্থায় শহরে আছে। আমরাও আমাদের প্রায় পূর্ণশক্তি নিয়ে জেলের মধ্যে ও বাইরে শহরের বুকের ওপরে জেল ভাঙার প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এবার যে সংঘর্ষ তাদের সঙ্গে হবে. তা হবে নতুন ধরনের। ল্যাণ্ডমাইনের প্রচণ্ডতা তাদের বিধ্বস্ত করবে। কর্মঠ উদ্যোগী তরুণ বিপ্লবীদের কাছে এই

মারাত্মক ল্যাণ্ডমাইন এক নতুন আবিষ্কার। এর ভয়াবহ প্রয়োগ একবার যদি সফল হয় তবে বিপ্লবীদের কর্ম-কৌশলের প্রয়োগক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যাবে। কাজেই সেই অবস্থায় যেন তাদের পড়তে না হয় সেইজন্য তারা ঠিক করলেন, ল্যাণ্ডমাইন এই প্রচারটি বন্ধ করে দিয়ে 'ডিনামাইট' নামে প্রচার করা হোক।

ডিনামাইট কোলিয়ারী বা মিলিটারীর গুদোম থেকে জোগাড় করতে হবে। তা সবার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ইমপ্রোভাইজড্ (ঘরের তৈরী) ল্যাণ্ডমাইন বানানো ও জোগাড় করা বিপ্লবী যুবকদের পক্ষে অনেক সহজ। সেই হেতু এটা তাদের প্রচারে উহ্য থাকবে। সেইজন্য ল্যাণ্ডমাইন কন্সপিরেসি কেস না বলে ডিনামাইট কন্সপিরেসি কেস নাম দিয়ে মামলা করা ভাল, আর বিপ্লবীদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য কথা চালানো প্রয়োজন। পরবর্তী পর্বে ডিনামাইট কেস মিটে যেতে পারে যদি তারা বিপ্লবীদের সহযোগিতায় নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারেন। এই পর্বে তাদের তৎপরতা ছিল কি করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা লাইন নেবে যাতে মামলা নিষ্পত্তি হয়। আমরাও সেইজন্য প্রস্তুত ছিলাম।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চট্টগ্রামে আর একটি ট্রাইব্যুনাল মামলা শুরু হোল এইটি ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা বলে রটে গেল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা প্রমাদ গুণেছিল—মামলা বহু বছর চলবে, বেশির ভাগ ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। অভিভাবকরা দু' বছর ধরে আমাদের স্বপক্ষে অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আসছিলেন। তাতে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তারপর আবার ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা। মায়েদের চোখের জল আর থামে না। তাঁরা মা-কালীর চরণে তাঁদের প্রার্থনা জানালেন। বিপ্লবীরা কেবল মায়ের পূজা করে তাঁদের কাজ শেষ করেননি। তাঁরা পুলিশ ও সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালালেন। সরকার বুঝেছিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় কাউকে ফাঁসি না দেওয়াই শ্রেয় ও ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় খুব সামান্য সাজা দিয়ে মিটমাট করে ফেলা তাদের পক্ষে সমীচীন হবে।

চট্টগ্রামবাসীকে খুব চমকে দিয়ে প্রথম দিনই ডিনামাইট মামলা কয়েক ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি একজনেরই সাজা হোল—তিন বছরের জন্য। আর বাকিদের এক বছর, দেড় বছর, ছ'মাস করে সাজা দিয়ে ট্রাইব্যুনাল কোর্ট তাদের কাজ সম্পন্ন করে। যে জাদুকাঠী মামলা দুটির সমাপ্তি ঘটায় সেটি হল মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবীদের একতা।

১৪
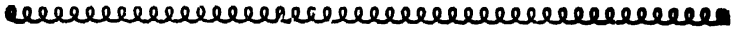
আমি ! (অবাক হয়ে) কেন ? কি হয়েছে ?

রাইফেলের বুলেট তার পিঠের স্ক্যাপুলা বোন ভেঙ্গে দিয়ে সামনের ডানদিকের পেক্টোরাল মাস্‌ল ভেদ করে যে বেরিয়ে যায়, তার চিহ্ন সে দেখায় এবং বলে সেই জন্য সে একেবারে ডানহাতে জোর পায় না। যখন ধরলা গ্রামের একটি বাড়ি থেকে সে ও কল্পনা প্রমুখ পালিয়ে যাচ্ছিল তখন মিলিটারীর রাইফেলের ৩০৩ বুলেট তার পিঠে লেগে বুকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। অজস্র রক্ত ঝরেছে, তবু সে অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সেই বাড়িতে মাস্টারদা ধরা পড়েছিলেন। শান্তি গুরুতর আহত অবস্থায় বহু মাইল অতিক্রম করে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে গিয়ে ওঠে। সেখানে তাকে প্রায় দু'মাস থাকতে হয়েছিল। এই গুরুতর আহত অবস্থা থেকে সে বেঁচে যায়, কিন্তু তার হাতটি প্রায় অচল হয়ে যায়। সে দুঃখ করে এইসব কথা বলছিল—আন্দামানে সে আমাদের সঙ্গে ব্যায়াম করতে পারবে না ; জিমন্যাসটিক করতে পারবে না। মিলিটারী ড্রিলও করতে পারবে না। তার করুণ কণ্ঠে দুঃখের কাহিনী শুনে আমি মেনে নিইনি যে তার হাত একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি ভুল করছো। তোমার হাত বিকল হতে পারে না। ব্যায়াম করলে 'তুমি ঐ হাতে জোর ফিরে পাবেই। তাকে আমি নিদর্শন হিসাবে আমার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুল যে ভাঙ্গা তা দেখিয়ে বলি, 'এগুলো ভালভাবে সেট করেনি। আমার ডান হাতের ভাঙ্গা রেডিয়াসও ভাল সেট হয়নি, তাই হাতটি বাঁকা। বন্ধুবান্ধব সবাই বলেছিল আমি নাকি ·হাতে আর জোর পাব না। সত্যি প্রথম প্রথম আমার তাই মনে হতো। কিন্তু তাতে আমি নিরুৎসাহ হইনি। আমি আবার ব্যায়াম ও জিমন্যাসটিক করতে শুরু করি। বকসিংও ছাড়িনি। এখন আমি প্রায় নরম্যাল। কাজেই তুমি আশা ছেড় না, ব্যায়াম করে যাও। প্যারালাল বারে জিমন্যাসটিক করতেও কসুর করো না।

আমার মনে হয় শান্তি আন্দামানে আমাকেই বেশী মানত। আমার কথা-

গুলো হয়ত তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে আমাদের মত ইউনিফর্ম জোগাড় করে ফেললো—সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট, সাদা মোজা, টানা গার্টার, সাদা রবার সোলের জুতো, বেল্ট, সাদা টুপী। তারপর থেকে শান্তিকে রোজই ব্যায়াম ও ড্রীল করতে দেখা যেত।

জেলখানায় ড্রীল ও ব্যায়াম করাটাই খুব বড় বিপ্লবী কাজ নয়। সবচেয়ে বড় কাজ হল কী করে ও কী উপায়ে ধীরে ধীরে আন্দামান জেলে সি. পি এফ. (সেলুলার পলিটিক্যাল ফোর্স) রেজিমেণ্ট গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। আন্দামান আমাদের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ছিল ডন, কুস্তি ও মিলিটারী শিক্ষায় শিক্ষিত হব। এবং এই সঙ্গে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ক্ষমতা অনুযায়ী হৃদয়ঙ্গম করব। কখন ভাবতে পারিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শুধুই পৃথিবীর শিক্ষা তার সঙ্গে মিলিটারী শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমরা ধাপে ধাপে আন্দামানে আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মিলিটারী শিক্ষা একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবরকম সুব্যবস্থা করি। এই কর্মসূচীতে শান্তি চক্রবর্তীর অবদান বড় কম নয়। যেমন নাকি রাইফেলের সাইজে কাঠের একটি ব্যাটনে নিজেদের মত করে ডামি রাইফেল তৈরী করার কাজে শান্তির বিশেষ অবদান ছিল।

আমি আবার চলে যাচ্ছি তাদের কাট্টলী গ্রামের সংগঠন প্রসঙ্গে। সেখান থেকে শ্রীশচীন সেন ও শ্রীবিনোদ দত্ত তাদের সংগঠন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য কুমিল্লা ও নোয়াখালি চলে যাওয়ার পর, কাট্টলী সংগঠন তাদের প্রধান কর্মসূচী গ্রহণ করল সেই গ্রামে আরও বেশী গোপন আশ্রয়স্থল জোগাড় করার জন্য। এই অভিযানে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিল শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার। তার চেষ্টাতেই 'মামার শেলটার' (অপর্ণা চক্রবর্তীর বাড়ি), 'জয়দ্রথের শেলটার' (যোগেশ মজুমদারের বন্ধুর বাড়ি) এবং 'নারকেল বাগান' (একটি নাথ বাড়ি) জোগাড় হয়। চট্টগ্রামে গেরিলা যুদ্ধের সময় এই প্রত্যেকটি শেলটারের দাম অপরিসীম। তার মধ্যে জয়দ্রথের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথ (যোগেশ মজুমদার) বিপ্লবী কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি কাজ করতেন। চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়তলী এলাকাতে আসাম বেঙ্গল রেলের হেড কোয়ার্টার এবং রেলের ওয়ার্কশপ ছিল। যোগেশ মজুমদার এই ওয়ার্কশপেরই একজন দক্ষ কর্মী। দক্ষিণ কাট্টলী থেকে পাহাড়তলী এলাকা পর্যন্ত যোগেশ মজুমদারকে এক-ডাকে সবাই চিনত। তার

মত সাহসী ও দুর্ধর্ষ লোককে সবাই ভয় করত। যোগেশ বাবুর সাহসের পরিচয় লোকে প্রথম পেয়েছিল ১৯২৬ সালে যখন দক্ষিণ কাট্টলীতে 'প্রজা বিদ্রোহ' হয়েছিল। এই বিদ্রোহে চট্টগ্রামে বিখ্যাত সংগীতাচার্য সুরেন দাসের পাশে ছিল এই যোগেশ মজুমদার। সুরেন দাসের পিতা 'প্রাণহরি দাস সেই গ্রামের ডাক-সাইটে জমিদার। ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পুলিশ পর্যন্ত সবাই কোন ঘটনার অনুসন্ধান করতে এলে তাঁরই বাড়িতে উঠতেন এবং তাঁরই সাহায্যে তাঁরা অনুসন্ধান চালাতেন।

বঙ্গোপসাগরের তীরে এই কাট্টলী গ্রামে বহু সংখ্যক জেলে বাস করত। এই জেলেরা মাছ ধরার জন্য মাঝদরিয়ায় পাড়ি দিত। কোন কিছুকেই তারা ভয় পেত না। কিন্তু তাদের ভীষণ ভয় হল প্রাণহরিবাবুর কাছারি বাড়ি—সেখানে তারা মুখফুটে একটাও কথা বলতে পারত না। প্রাণহরিবাবু যতই অন্যায় করুন না কেন কেউই তার প্রতিবাদ করত না। তারা জানতো কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাদের মাছ ধরা জাল, নৌকো প্রভৃতি হারাতে হবে। তাই তারা মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করত। অন্যায় অত্যাচারে যখন তারা জর্জরিত, তখন একদিন তারা প্রাণহরি দাসের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করল। প্রাণহরি দাসের ছেলে সুরেন দাস তাদের কাছে এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও জেলেদের বিক্ষোভ থেকে তিনিও রেহাই পেলেন না। এই মারমুখো বিদ্রোহী জেলেরা যখন প্রাণহরিবাবুর বাড়ি আক্রমণ করেছিল তখন সুরেন দাসের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অসম সাহসী আমাদের যোগেশ মজুমদার। যোগেশ মজুমদারের লাঠির সামনে জেলেরা দাঁড়াতে পারেনি, ছত্রভঙ্গ হয়েছিল। তাদের পরাজয় হলেও একটি সম্মানসূচক চুক্তি হয়। জেলেদের পক্ষে এই সম্মানসূচক চুক্তির জন্য সুরেন দাসকে প্রশংসা করতে হয়। এই যোগেশ মজুমদারকে একবার প্রাণহরিবাবুর দরবারে মেয়েঘটিত ব্যাপারে হাজির হতে হয়। যোগেশ বাবু ঘাড় বেঁকিয়ে প্রাণহরিবাবুর মুখের উপর উত্তর দিয়েছিলেন, 'গর্হিত কাজ যদি হয়েই থাকে, তবে তা বেশ হয়েছে। কার কত শক্তি, আসুক না এগিয়ে।' প্রাণহরিবাবু অতি বিচক্ষণ ও ধূর্ত মানুষ। তিনি সবদিক ভেবে যোগেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে কেস মিটিয়ে ফেললেন। কালীর দীনবন্ধু মামা তারককে যোগেশের সম্বন্ধে এইসব গল্প বলেছিল। সেই গল্পে সত্যতা ছিল। তারকেশ্বর এইসব গল্প খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনে মনে মনে ভেবেছিল, যোগেশ মজুমদারকে অনেক কাজে লাগানো যাবে। তারকেশ্বর যখন যোগেশ সম্বন্ধে এই সব ভাবছিল, তখন

কালীর দীনবন্ধু মামা ফুটুদাকে (তারকেশ্বর) বলল, ফুটুদা সেদিন যে যোগেশের গল্প আপনাকে বলেছিলাম, তার মৃত বন্ধুর বাড়ি তার তত্ত্বাবধানে আছে। বাড়িটি খুবই নিরাপদ জায়গায়। বন্ধুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণ যোগেশ চালায়। যোগেশকে সবাই গুণ্ডা বলে জানলেও, তার মনটি খারাপ নয়। তার বিশেষ গুণ, সে লোকের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সে সবসময়ই করে থাকে। আমি যে এখন পলাতক সে তা খুব ভালভাবে জানে। ওর সঙ্গে আমার যথেষ্ট খাতির আছে। আমি যদি তার ভাগ্নে কালীর জীবন রক্ষার জন্য বন্ধুর বাড়িটি আশ্রয় স্থল হিসাবে চাই, তবে সে জোগাড় করে দেবেই। এখন আপনি বলুন, আমি সে রকম চেষ্টা করব কি না। যদি একবার কালীর নাম ক'রে সেই বাড়িটি বিপ্লবের জন্য পাই তবে আমাদের সবার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

তারক এসব শুনে অনুমতি দিলেন। কী কী কথা, কী কায়দায় সতর্কতা নিয়ে বলবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হোল তাও দেখে যেন তাকে বিশদভাবে রিপোর্টটি দেয়, তাও বলল। তার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সে সিদ্ধান্ত নেবে।

দীনবন্ধু যোগেশের বিশেষ বন্ধু বলে খুবই আশান্বিত ছিল যে, যোগেশ তার কথা ফেলতে পারবে না। কালীর দীনবন্ধু মামা পরের দিনই তারককে জানালো যে, যোগেশবাবু রাজি হয়েছেন, ওর উপরে নির্ভর করা যায়।

পরের দিন দীনবন্ধু কালীকে নতুন আশ্রয়ে নিয়ে গেল। তারকেশ্বর রোজই কালীর কাছ থেকে রিপোর্ট নিতেন। এই সব কথা জেনে তারকেশ্বরের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল, যোগেশ বাবু পুলিশের লোক নয় এবং তাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে। তাই তারকেশ্বর কালীর কাছে প্রস্তাব করল, 'আমি যোগেশ-বাবুর সঙ্গে দেখা করব ও নিজে কথা বলব।

দিন ও সময় স্থির করে সে দীনবন্ধু ও কালীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া বুক, বলিষ্ঠ বাহু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ নিয়ে যখন যোগেশ জ্যোৎস্না রাত্রে তারকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন জ্যোৎস্নার আলোকে তারক একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল —এইটি হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী কালীর অভিমত। যোগেশবাবুর কাছে গিয়ে নমস্কার করতেই তারক তাকে কাছে টেনে বসালো। অল্পক্ষণ পরেই কালী ও দীনবন্ধু সেখান থেকে সরে গেল। তারকেশ্বর দু' ঘণ্টারও বেশী যোগেশবাবুর

সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-অলোচনা করেছিল। প্রথম দিনের আলাপেই তারক বুঝেছিল যোগেশবাবু সাহসী ও সৎ লোক। এই মানুষ বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। একে যদি বিপ্লবীরা আপন করে নেয় ও ভাল ট্রেনিং দেয় তবে তাকে দিয়েও কালীর নিশি কাকার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো যাবে।

যোগেশবাবুর শেলটারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়ে পরিণত হল। মাস্টারদা ও নির্মলদা যোগেশবাবুর মত সাহসী বেপরোয়া লোকের খবর পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন। কালীর দীনবন্ধু মামার বাড়িতে যেমন বোমার লোহার খোল ঢালাই হয়েছিল, ঠিক তেমনি বোমার লোহার খোলে পোরার জন্য পিকরিক অ্যাসিড ও গান কটন তৈরী করার জন্য নির্ভরযোগ্য এই বাড়িটিও ব্যবহার করা হয়েছিল। শহরের কাছাকাছি এই রকম একটি নির্ভরযোগ্য বাড়ি পাওয়াতে বিশেষ কর্মীদের শহরের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এই সময় শহরে অনেক নেতৃস্থানীয় ছেলেমেয়ে বাড়িতে নজরবন্দী অবস্থায় ছিল। তাদের পক্ষে গ্রামে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরে আসা সম্ভব হোত না। তাই সেই বাড়িটি থাকাতে তাদের খুব সুবিধা হয়েছিল। ওই বাড়িতে ফেরার নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তারা সেই রাত্রেই নিজেদের বাড়ি ফিরে আসতে পারত। পয়োজ চৌধুরী শহর সংগঠনের একজন সংগঠক। নির্মল সেন বর্তমানে চট্টগ্রামের একটি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। তারা দু'জনে প্রায় এসে তারকের সঙ্গে দেখা করে সেই রাত্রেই নিজেদের বাড়ি ফিরে যেত। তখনকার দিনে প্রখ্যাত বিপ্লবী কল্পনা দত্ত বহুবার রাত্রির অন্ধকারে পুরুষের বেশে পাহারারত পুলিশকে দস্তুরমত ফাঁকি দিয়ে তারক ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করত।

১৯৩২ সালের শেষের দিকে মাস্টারদা একদিন তারক ও কালীকে পথড়কোড়া গ্রামে 'কপালকুণ্ডলা' শেলটারে ডেকে পাঠালেন। তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত খবর জানলেন। এর কিছুদিন পর ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন 'ধলঘাট যুদ্ধ' হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ক্যামারন নির্মলদার রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। এই যুদ্ধে আমরা নির্মলদা ও অপূর্ব সেনকে হারালাম। মাস্টারদা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে গিয়ে উঠলেন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শেলটার কুটীরে। সেই শেলটারে তখন অজ্ঞাতবাসে ছিল —কালীকিংকর দে, সুশীলচন্দ্র দে এবং মহেন্দ্র চৌধুরী। ধলঘাট গ্রামটি পটিয়া থানার অন্তর্গত। ধলঘাট যুদ্ধে অপরাধী সাব্যস্ত হোল এই থানার প্রতিটি গৃহস্থ।

প্রত্যেক গৃহস্থের উপর ধার্য হল মাসিক পিউনিটিভ ট্যাকস। পটিয়া এবং বোয়াল-খালি থানার গ্রামকে গ্রাম রাত্রির অন্ধকারে ঘেরাও করা হোত। তারপর আচম্বিতে শত শত মিলিটারী সৈন্য দিয়ে ভোর থেকে শুরু হোত বাড়ির পর বাড়ি তল্লাসী। তখন কেউ চোখ খুলেছে কেউ খোলেনি—সেই অবস্থায় প্রতিটি পুরুষ নারী, ছেলে মেয়েকে মিলিটারীর অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হোত। গ্রামে দেখা দিল ত্রাসের সঞ্চার। আবার বিপ্লবীরা আশ্রয়ের অভাব অনুভব করতে লাগলো। অনেক দিন থেকে কোন অ্যাকশনের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে, ফেরার বিপ্লবীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগলো। 'গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য অজ্ঞাত-বাস, বেঁচে থাকার জন্য নয়—যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জালালাবাদ যুদ্ধের এক অপরাজেয় সৈনিক, যে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছিল, সেই বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী মাস্টারদাকে এই কথা বলল। শৈলেশ্বর এই বলে শহরের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকার জন্য মাস্টারদার কাছে অনুমতি চাইল, উদ্দেশ্য ছিল যে-কোন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে 'অ্যাকশানের' একটি পরিকল্পনা নেবে—'ডেথ প্রোগ্রাম' নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই যে সে যাচ্ছে, ফেরারী জীবন কাটাতে, সে আর ফিরে আসবে না। মাস্টারদা শৈলেশ্বরের দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বাধা দিলেন না, তাকে বললেন, যাও, তুমি চেষ্টা করে দেখ।

দু-একদিনের মধ্যেই ব্রজেন দে, কালীকিংকর ও শৈলেশ্বরকে দক্ষিণ কাট্টলীতে কালীর মামার বাড়িতে ১৯৩২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পৌঁছে দিল। কালীর মামা দীনবন্ধুর মুখে জানা গেল যোগেশ বাবু কারাখানা থেকে ইওরোপীয়ান ক্লাবের চাকরিতে বদলী হয়েছে। ইওরোপীয়ান ক্লাবটি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এই এলাকার মধ্যে যারা চাকরি করে, তাদের ওপর আই-বি ও পুলিশের কড়া নজর থাকত। এইসব খবর পাওয়ার পরও শৈলেশ্বর ও কালী যোগেশবাবুর শেলটারে গিয়ে উঠলো। সেখান থেকে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হল। ডাবল মুরিংসের দীনেশ চক্রবর্তী, পাথরঘাটার পয়োজ চৌধুরী, চট্টগ্রাম কলেজ-এর নির্মল সেন (বুলবুল—কোড নাম ছিল বার্ড) এবং শান্তিরঞ্জন সেন সবাই মিলে ডবল মুরিংস থেকে চক বাজার পর্যন্ত শহরের সব এলাকার প্রয়োজনীয় খবরাদি জোগাড করে দিত। এরাই ছিল শহরের নামকরা প্রথম সারির কর্মী। যোগেশবাবুর কাছ থেকে ইওরোপীয়ান ক্লাবের প্রয়োজনীয় সব খবর জানা যেত।

ইওরোপীয়ান ক্লাবটি শহরের একমাত্র স্থান যেটিকে ইংরেজরা ভাবত তাদের

পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কারণ এই ক্লাবটি ছিল পাহাড়ে ঘেরা। এর কাছাকাছি কোন রাস্তা দিয়ে সাধারণ লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণের কোন প্রাইভেট গাড়িও যেতে পারত না। এই এলাকার প্রধান প্রবেশ পথটির ওপরে ছিল অকসিলারী আর্মারী। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই আর্মারীর এলাকা থেকে একদিন টহলদারী মিলিটারী সেপাই বেরিয়ে পড়ত। তাদের সঙ্গে থাকত সঙ্গীনযুক্ত রাইফেল। এদের কাজ ছিল হকিন্স ক্লাব পর্যন্ত টহল দেওয়া। এই এলাকা পুরোটা একবার ঘুরে আসতে তাদের সময় লাগত ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট। সাহেবদের ধারণা তাদের এই ব্যূহে অবাঞ্ছিত লোক এর প্রবেশ একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বিপ্লবীরা তাদের মনোমত লোক সেখানে প্রবেশ করানো খুবই সম্ভব বলে মনে করত। সাহেবরা এই নিরাপদ স্থানে বসে বিপ্লবীদের ধ্বংস করার জন্য কতই না পরিকল্পনা করেছে। তাদের এই ঘাঁটি বিপ্লবীরা উড়িয়ে দেবে ঠিক করেছিল। সাহেবদের আক্রমণ করে তাদের হত্যা করবে—তাও তাদের প্ল্যান ছিল। এই সব সন্ধান পাওয়া ও পরিকল্পনা করা সবই সম্ভব হয়েছিল, যেহেতু যোগেশবাবু সেই ক্লাবে চাকরি করতেন। সরজমিনে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য মাস্টারদা তারককে নিযুক্ত করলেন। সেই ক্লাবে যখন যোগেশবাবুব ডিউটি তখন খবরাদি পাওয়া যে খুব অসম্ভব নয়, তা বুঝতে পারা যায়।

তারক কাট্টলী গ্রামে এলো এবং সে পৃথক পৃথক ভাবে শান্তি চক্রবর্তী গামা ও দীনবন্ধু মজুমদারকে খবরাদি নেবার জন্য নিযুক্ত করলো। তিনজনই পৃথক পৃথকভাবে খবর এনে দিত। তাদের সংক্ষিপ্ত খবরের উপর তারক প্রশ্ন করে সংক্ষিপ্ত উত্তরই পেত। কিন্তু সব উত্তরই প্রায় এক রকম। তাই তারক বুঝলো খোঁজ নেওয়ার ব্যাপাবে ভেজাল নেই। উত্তরও শুদ্ধ বিচার এর এই মাপকাটি নিভু'ল।

তারক যোগেশবাবুর সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শুরু করল। যোগেশবাবু মুগ্ধ হয়ে তারকের কথা শুনতেন এবং দেখা গেছে যোগেশবাবু তারকের কথায় খুবই অনুপ্রাণিত হতেন। একসময় যোগেশবাবু তারককে বললেন, আপনারা যদি সাহেবদের খতম করার জন্য ক্লাবটি আক্রমণ করেন, তবে আমি ভিতর থেকে আপনাদের সব রকম সাহায্য করব।'

তারক এই কথা শোনার পর খুবই খুশী হয়ে বলল, 'যোগেশবাবু হবেন আমাদের ব্যূহরক্ষক। সেই দিন থেকে যোগেশবাবুর কোড নাম হল 'জয়দ্রথ'।

যোগেশবাবুর কাছ থেকে ক্লাবের ছাপানো প্রোগ্রাম পাওয়া যেত। তাই দেখে তাদের একটি বিশেষ জমায়েতর দিনে আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা পাকাপোক্ত হল। ঠিক হল সেই আক্রমণের নেতৃত্ব করবে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাবের হলঘরের প্রধান গেট পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ শুরু করতে হবে। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী এবং কালিকিংকরদের হাতে থাকবে ৪৫৫ বোরের ওয়েবলী রিভলবার। শান্তি চক্রবর্তীর হাতে থাকবে (অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের তৈরী খোলের) বোমা যার মধ্যে থাকবে উচ্চ ধরনের বিস্ফোরক অ্যামন পিকরেট ও পটাশ ক্লোরেট পাউডার এবং যেটি স্ট্রাইকার ফিট করা অর্থাৎ যেটি ছুঁড়ে মারলে মাটিতে পড়েই বার্স্ট করবে। আরেকটি বোমে লোশন দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হবে—সেই রকম একটি বোমাও শান্তির সঙ্গে থাকবে। তার সঙ্গে একটি তরবারিও থাকবে।

প্ল্যানটি ছিল এই রকম—শান্তি প্রথমে স্ট্রাইকার বোমা ফাটাবে, তারপরই লোশন দিয়ে একটি বোমা ছুঁড়বে, যেটি চার-পাঁচ সেকেণ্ড পরে ফাটবে। ইতি-মধ্যে শান্তি তার রিভলবার থেকে সাহেবদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে থাকবে। তারপর তরবারি দিয়ে যাকে সামনে পাবে তার শিরশ্ছেদ করবে। সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী—উভয়ের হাতে থাকবে ব্যারাল কেটে ছোট করা পুলিশ আর্মারি থেকে লুঠ করা মাকসেট্রি। কাস্ট আয়রনে তৈরী স্ট্রাইকারযুক্ত •একটি করে বোমা। আরেকটি লোশন ঢেলে নিক্ষেপ করার উপযুক্ত বোমা। উত্তর দিক থেকে 'বিলিয়ার্ড রুম' আক্রমণ করবে বীরেশ্বর চক্রবর্তী ওয়েবলী পিস্তল নিয়ে। তার পাশে থাকবে পান্নালাল। পান্নালালের হাতে থাকবে একটি মাস্কোট্রি। আর গামার (প্রফুল্ল দাস) হাতে থাকবে, দুটি পূর্ব বর্ণিত বোমা, একটি ছোরা। চতুর্থ দলে দীনেশ চক্রবর্তী ও দীনবন্ধু মজুমদার তিন রকমের ইস্তাহার নিয়ে উপস্থিত থাকবে। ক্লাবের কাছাকাছি একটি জায়গায় তারা থাকবে এবং সেখান থেকে দেখবে ও জানতে চেষ্টা করবে আক্রমণ শুরু হল কিনা। আক্রমণ শুরু হলেই শোনা যাবে বোমা ও গুলির শব্দ। তারা সেই শব্দ শুনেই ছুটে যাবে শহরে যেখানে শান্তিরঞ্জন সেন এবং নির্মল সেন দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের সব ইস্তাহার দিয়ে দেবে যেন তারা সেইগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় বিলি করে দেয়।

নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে আক্রমণকারীরা ক্লাব থেকে জয়দ্রথের সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায় গোপনে ক্লাবঘরের নিকটে প্রস্তুত হয়ে

রইল। তারা জয়দ্রথের বাড়ি থেকে রওনা হয়েই এসেছিল, কিন্তু পথে বিঘ্ন ঘটল। তাই দেরি হওয়াতে জয়দ্রথের সংকেত ছিল সেদিন আক্রমণ করা উচিত হবে না। তারা এই সংকেত পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফিরে যাওয়ার সময় পথে শৈলেশ্বর কালীকে বলছিল, মায়ের ডাক আমি ঠিক শুনেছিলাম, সাড়াও দিয়েছিলাম। এখন দেখছি আমি মায়ের বেদীমূলে বলি হওয়ার উপযুক্ত নই।

তারা সবাই নিজ নিজ শেলটারে গিয়ে উঠল। তাদের অস্ত্রের বর্ণনা আগেই দিয়েছি, তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি করে পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া। জীবন্ত তারা কেউ ধরা দেবে না। সেইজন্য এই বিষের পুরিয়া সঙ্গে রাখা। নিজেদের শেলটারে এসে যখন বন্ধুরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন একজন জেগে ছিল—সে শৈলেশ্বর। সে শুয়েছিল খাটের উপরে, আর মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছিল কালীকিঙ্কর। কালীর রিপোর্ট – শৈলেশ্বর ঘুমায়নি, একবার এপাশ আর একবার ওপাশ করছিল। কালীকে সে দু'বার ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল এখন কটা বাজে? কালী একবার বলল, একটা বাজে; আরেকবার বলল, দুটো বাজে, সে কালীর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিল।

কালী বলল শিরোনামায় লেখা ছিল ডেজ আর গান। লাইফ ইজ গ্রোইং মোর এণ্ড মোর অ্যাবসলিউটলি ভেগ এণ্ড ভেকেণ্ট। লেখা শেষ করে সে কাগজ আর পেন্সিল পাশে রাখল। তারপর বালিশের তলা থেকে বিষের পুরিয়া নিয়ে মুখে পুরে কালীকে বলল, আমি বিষ খেয়েছি। সবাই জানে পটাসিয়াম সায়ানাইড জিভে ঠেকলেই মানুষ মরে যায়, কিন্তু চরম ব্যতিক্রম দেখা গেল শৈলেশ্বরের বেলায়। তার গলায় ঘড়ঘড় অওয়াজ শুরু হোল। দারুণ আওয়াজ। কিছুতেই আওয়াজ বন্ধ হচ্ছিল না, অথচ তার জ্ঞানও ছিল না। এই অবস্থায় কালী আর শান্তি খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগল। শান্তি ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। ভোর বেলায় জয়দ্রথ ডিউটি থেকে ফিরে এসে আত্মহত্যার কাহিনী শুনে বলল, এই ব্যাপার যেন প্রচার না হয়। সে সারাদিন পাহারা দিল যেন বাড়িতে কেউ না এসে ঢোকে। গভীর রাত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে বালুচরে শৈলেশ্বরের শবদেহ সমাধিস্থ করা হল। শিয়রে দেওয়া হয়েছিল একটি তরবারী এবং দেহ নানারকম ফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। তারপর বন্ধুরা শেষ প্রণাম জানায় অনুচ্চস্বরে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে।

আক্রমণের প্ল্যানটি এইরকম শোচনীয় ভাবে বিনষ্ট হওয়ার পর বিপ্লবীরা দমে

গেল না। তারা আবার প্রস্তুত হল আক্রমণ করার জন্য। এইবারে নেতৃত্ব দেবে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আক্রমণের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোন একটি দিন। প্রীতিলতার সঙ্গে আরও দুটি মেয়ের যাওয়ার কথা ছিল—একজন কল্পনা দত্ত, আরেক জন প্রেমলতা (কালী দে'র স্ত্রী)। এই পরিকল্পনাও কার্যে পরিণত হোল না কারণ ক্লাবের কাছাকাছি জায়গায় আক্রমণের আগের দিন ধরা পড়ে গিয়েছিল পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত। তার সঙ্গে নির্মল সেন ও দীনবন্ধু মজুমদারও গ্রেপ্তার হয়েছিল। এই ব্যাপারে সেখানে খুব হৈ চৈ হয়। প্রেমলতাকে এবারেও ফিরে যেতে হল। অল্পদিনের ব্যবধানে এতসব ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। পুলিশ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এসব কিছুই টের পেল না। জয়দ্রথের উপর দলের আস্থা শতগুণে বৃদ্ধি পেল।

আবার দিন ধার্য হল সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে রাত সাড়ে নটা-দশটায়। এই আক্রমণ অভিযানে নেতৃত্ব দেবে স্বয়ং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। দীনেশ ও দীনবন্ধুর জায়গায় দীনেশ একা থাকবে। অন্যান্য সব আগের বারের মতই ঠিক ছিল। এবারের পরিকল্পনাকে কেউ ঠেকাতে পারল না। প্রীতিলতার নেতৃত্বে এই আক্রমণ সাফল্য লাভ করল। টহলদারী মিলিটারী পাহারা শ্বেতাঙ্গ উচ্চ কর্মচারীদের রক্ষা করতে পারল না। টহলদারী মিলিটারীরা যখন ক্লাব ছেড়ে পূর্ব দিকে অকসিলিয়ারী আর্মারীর দিকে গেল, তারপর মিনিট পনের পার হবার পর বিপ্লবীরা মনে করল এই তাদের সুবর্ণ সুযোগ। তারা সঙ্গে সঙ্গে সংকেত দিল। জয়দ্রথও তার উত্তর দিল সংকেতে। চারিদিক থেকে প্ল্যান অনুযায়ী তারা আক্রমণ করল। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ, বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ, চিৎকার চেঁচামেচি শুনে যারা ইস্তাহার বিলি করার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা বুঝল আক্রমণ শুরু হয়েছে, যত শীঘ্র সম্ভব ইস্তাহার বিলি করতে হবে। তারা তখন তাদের কাজ করতে ছুটল।

১৫

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা—দুইটি ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ করা, অর্থাৎ 'টু-ওয়েজ ওয়ার এগেইনষ্ট কিং এম্পায়ার'। সরকার বিপ্লবীদের অজান্তে হুইসকির বোতল উপহার দিল; ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ও আন্তঃপ্রাদেশিক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা এই দুইটিই সরকারের দেওয়া নাম। একটু চেষ্টা করলেই জানা যাবে, ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা বটে, কিন্তু বাস্তবে একটি ডিনামাইটও ছিল না। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অভিযোগে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা বটে কিন্তু তাতে না ছিল রাইফেল, না ছিল স্টেনগান বা ডিনামাইট কেবল ছিল কাগজপত্রে বিরাট প্ল্যান। মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের একটি সুপরিকল্পিত পাল্টা ষড়যন্ত্র যাতে ভারতে সংস্কারবাদী কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর প্রভাবে কম্যুনিজমের সমাধির উপরে বিকল্প কম্যুনিজম জন্ম নেয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চালিয়ে বৃটিশ সরকারের অভিরুচি পূর্ণ হয়নি, তা কেউ বলতে পারবে না। আমার কথাটি বলি—ডিনামাইট মামলা এই মদের বোতলের নেশায় গর্ববোধ করছিলাম। চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা ডিনামাইট যোগাড় করেছিল, তাদের সক্রিয় পরিকল্পনায় ডিনামাইট দিয়ে জেল ভাঙ্গা আদালতে গৃহ ধ্বংস করা, পল্টনে টেনিস খেলার মাঠে সাহেবদের বড় বড় সোফা উড়িয়ে ট্রাইব্যুনালের মোটর গাড়ি ডিনামাইট দিয়ে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা অনেক গুণ বেশী সম্মানের। বন্দুকের বারুদের সাহায্যে তা করা হলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে না। তাই ডিনামাইট প্রচার করতে ভাল লাগত। সরকারই আমাদের সেই সুবিধা করে দিয়েছিল। আমরা মদমত্ত বিপ্লবীর দল অহংকারে মত্ত—আমরা ডিনমাইট জোগাড় করে মাটি খুঁড়ে বড় রাস্তায় রেখেছি। লোকচক্ষুর অন্তরালে একশ-দু'শ গজ ইলেকট্রিক তার মাটির নিচে দিয়ে নিয়ে গেছি ব্যাটারী ও সুইচের সাথে যোগ দিতে। এই সব করতে অনেক বেশী শক্তি ক্ষয় হয়েছে কিন্তু এই কাজে বাস্তবে ডিনামাইট ব্যবহার করতে হলে পরিশ্রম সহস্র গুণ কম হোত। ল্যাণ্ডমাইন বানাতে

প্রথম ১০ মণ আর তারপর আবার ৫ মণ গান পাউডার তৈরী করতে আমাদের যোগাড় করতে হয়েছিল ৭৫ ভাগ সোরা, ১০ ভাগ গন্ধক, আর বাকি ১৫ ভাগ কয়লা। এই প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ গোপনে যোগাড় করা এবং ওগুলোকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে গুঁড়ো করে তারপর ১৫ মণ গান পাউডার তৈরী করার মধ্যে অনেক বৈপ্লবিক ধৈর্য ও কৌশলের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে আমাদের সাফল্য না ভেবে ডিনামাইট প্রচারের বাহাদুরি নিতে বেশী ইচ্ছুক ছিলাম।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিদ্রোহীরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন বটে, তবে তারা বাস্তবে কতখানি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য কাজ করতে পেরেছিলেন। এই প্রশ্ন কি তাদের মনে কখন এসেছিল? একটা ডিনামাইটও নেই, তবু ডিনামাইট কন্সপিরেসী কেস বলে প্রচার হয়েছিল এবং আমরা নিজেরাও তা প্রচার করে যে গর্ব অনুভব করতাম সে সম্বন্ধেও কি আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল? আমি আজ খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমরা যতখানি বিপ্লব চেয়েছি, তার চাইতে অনেক বেশী বিপ্লবের নামে বাহাদুরী চেয়েছি। তাই দেখেছি পার্টিতে পার্টিতে ঝগড়া আর হিংসা। নিজ নিজ পার্টি সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে, সবচেয়ে বেশী বিক্রম প্রদর্শন করেছে এবং সরকার তাদের অ্যাকশনকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিচ্ছে, এই প্রচার করতে নিজেদের সময় ব্যয় করেছে। আজ মনে হয় যদি আমরা সত্যি বিপ্লব চাইতাম এবং বিপ্লবীরা একত্র হয়ে কোন একটি প্রচেষ্টা দিতে পারতাম তবে আমাদের সফলতা অনেক বেশী হোত। আমরা জাহির করতে ব্যস্ত ছিলাম, কার থেকে কত বেশী করেছি। এই ফাঁকে হিসেব-নিকেশ করতে ভুলে যেতাম আমরা সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য কতখানি করতে পেরেছি। বিপ্লবীদের ভিতরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাব ছিল। আমরা অনুশীলন পার্টি থেকে বেশী করেছি আবার কেউ ভাবতেন, আমরা যুগান্তর পার্টি থেকে বেশী করেছি। বি. বি-র কোন সংগঠন নেই। আর অন্যরা ভাবতেন শ্রীসংঘের সদস্যরা বিপ্লবী কর্মপন্থা নিয়ে কাজ করতেই পারবে না। এইরকম হামবড়া ভাব নিয়ে বিপ্লবীরা চলত। সেই রেষারেষী ভাব তখন ছিল এখন আর নেই—ভাবাটা ভুল। রেষারেষি যখন শত্রুতার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অন্যকে খর্ব ও ধ্বংস করতে সব উপায়ই গ্রহণ করে এমনকি পুলিশের সাহায্যে অপর পক্ষকে উৎখাত করতে তাদের বাধে না। এই অবস্থা উপলব্ধি করেও প্রত্যেকটি পার্টি নিজের নিজের গণ্ডিতে নিজেদের অটুট রেখে সক্রিয় কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে

গেছে। সেইজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল নিজেদের শক্ত ঘাঁটি। যে সংগঠনের বেশী শক্ত ঘাটি থাকবে পুলিশকে ও বিপক্ষ দলকে বিপথগামী করতে ততই তারা সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের সময় ওদের শক্ত ঘাঁটি ছিল গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকান, মাস্টারদা যেখানে থাকতেন সেই কংগ্রেস অফিস আর অনন্ত সিংহের গতিশীল ঘাঁটি, তার মোটরগাড়ি। এই তিনটি ঘাঁটি সফলতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিল যেহেতু তাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি শক্ত উপঘাঁটি ছিল। সেই ঘাঁটিগুলোর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, যথা আনন্দের বাড়ি, রজত সেনের বাড়ি। বাড়ি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি বাড়ির লোকদের সহানুভূতিশীল ব্যবহার ও তাঁদের সমর্থন। কোন ঘাঁটি কার্যকরী হবে না, যদি না বাড়ির সবার বিপ্লবীদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল সমর্থন পাওয়া না যায়। রজতের ও আনন্দের মা, বাবা, ভাই, বোন—সবার পুরো সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম। ১৯২৯-৩০ সালে শহরের এই সব প্রধান ঘাঁটির কথা উল্লেখ করলাম। ১৯৩১ সালে ৩০ অগস্ট আসানুল্লা (ডি. এস. পি.) হত্যার পর চট্টগ্রামে বৃটিশ বাহিনীর ভীষণ অত্যাচারে প্রতি ঘরে ঘরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। এই কারণে যুব-বিদ্রোহের গেরিলা বাহিনীর পক্ষে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ চালানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাই ঠিক হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে। ১৯৩২ সালে জানুআরির প্রথম সপ্তাহে নতুন পরিকল্পনা অনুসারে মাস্টারদা এবং নির্মলদা নির্দেশ দিলেন যুব-বিদ্রোহের তৃতীয় নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটু)-কে গোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করতে হবে। তারক, মাস্টারদা এবং নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতা যাবে বলে স্থির করলো। ঠিক করলো সঙ্গে নেবে কালিকিংকর দে এবং ব্রজেন দেকে। সে ঠিক করল ব্রজেন তুলাতলীতে এক রাত্রি থাকবে। পরের দিন সবাইকে নিয়ে সন্ধ্যার পর সে নদীর ওপারে পতেঙ্গা গ্রামে গেল। আগে থেকে ঠিক করা ছিল এই গ্রামে তারা একদিন থাকবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এমন আশ্রয় পেল না যাতে এক রাত্রিও থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত তারকেশ্বরের কথামত শেষ ভরসা দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামের উদ্দেশ্যে তারা রওনা হোল। তারা তিনজন সমুদ্রের পার দিয়ে সারারাত হেঁটে গিয়ে পৌছলো দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে। এই গ্রামে কালীর মামা শ্রীজগবন্ধু মজুমদার থাকতেন। তারা একেবারে ভোররাত্রে গিয়ে তাঁর বাড়িতে

উপস্থিত হোল। জগবন্ধু বাবু তাদের সঙ্গে কালীকে দেখে তাদের দু-দিন রাখবেন বলে কথা দিলেন। যে বাড়িতে তাদের রাখার জন্য ঠিক হোল, সেই বাড়িটি হোল কালিকিঙ্করের কাকা নিশিচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি। মাস্টারদার নির্দেশ ছিল, তাদের আশ্রয় ঠিক হলে ব্রজেন যেন গিয়ে তাঁকে সংবাদটি দেয়। সেইজন্য পরের দিন ব্রজেন দে এই নিরাপদ আশ্রয়ের খবরটি পৌছে দেবার জন্য মাস্টারদা ও নির্মলদার কাছে গেল। কালীদের জগবন্ধু মামা এবং তার কাকা নিশিচন্দ্র দে দু'জনেই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে চাকরি করতেন।

মামার মুখে খবর পেয়ে কাকা কালিকিঙ্করের সাথে দেখা করতে মামার সাথেই এলেন। ভাইপো কালিকিঙ্করকে তিনি বরাবর বিপ্লবী কাজে সাহায্য করে এসেছেন। তিনি ভাইপোকে খুব ভালবাসতেন, খুব বিশ্বাসও করতেন। সেইজন্য অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন 'ডিনামাইট' তৈরীর কারখানা করতে। তিনি তাঁর এই শ্বশুরবাড়িটিও ব্যবহার করেছেন বোমার লোহার খোল ঢালাই করার ব্যাপারে। এই বাড়িটিতে ল্যাণ্ডমাইনের নানা সাজ-সরঞ্জাম, এ্যাসিড প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থাও তিনি করে ছিলেন। তাকে যখন ডবল-মুরিং বাড়ি থেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করল, তখন তাঁর ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে। তিনি একেবারে নির্বাক ও নিস্তব্ধ ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে শত চেষ্টা করেও পুলিশ একটিও গোপন কথা বার করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত পুলিশ এই বাড়ির সন্ধান পায়নি। তিনি এই জেল-যন্ত্রণা ভোগ করে, পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়ে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখনও বিপ্লবের আগুন তাঁর অন্তরে নির্বাসিত হয়নি। তার পরও তিনি বিভিন্ন সময়ে উৎসাহের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী কাজে সাহায্য করেছেন। তাই তার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা সব সময় ছিল। তার ওপর কালীদের অটুট ভরসা ছিল।

তারকেশ্বর এক সন্ধ্যায় কালীর কাকাকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে ছিল। সেই দিনই তারকের সঙ্গে তাঁর খুব খোলাখুলি আলোচনা হয়। তিনি তারককে তাঁর পূর্ণ সাহায্য দানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারকের অনুরোধে পরের দিন তিনি কালীর স্ত্রীকে এই বাড়িতে এনে দিয়েছিলেন। কাকা না হলে বাড়ি থেকে তার স্ত্রীকে এখানে আনা সম্ভব হোত না। কালীর এই কাকা প্রতিদিনই ওয়ার্কশপ ছুটি হবার পর এই বাড়িতে আসতেন। তিনি তারকেশ্বরের সঙ্গে খুব কথা বলতেন এবং ক্রমেই তারকেশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কাকার

অনুরোধে কালীর জগবন্ধু মামা কালী ও তারকেশ্বরকে তাদের কলকাতা রওনা হওয়ার দিন পর্যন্ত তাঁদের আশ্রয়ে রাখার ঝুঁকি নিলেন। তাঁদের নিজেদের বাড়িতে কোন মেয়ের থাকার অসুবিধা ছিল। কালীর বড় মামা জগবন্ধু ছোট মামা দীনবন্ধুর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন তাঁদের পুরোহিত শ্রীঅপর্ণা ঠাকুরের বাড়িটিকে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে যেন ব্যবহার করা যায়। শ্রীঅপর্ণা ঠাকুর শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

এদিকে কলকাতা থেকে খবর এলো তারকেশ্বর যেন তার কলকাতা যাওয়া স্থগিত রাখে। এই কারণে কালীর স্ত্রী প্রেমলতাকে তারকের কথামত তার কাকা ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

এখানে একটি কথা বলা দরকার, ঠিক হয়েছিল তারক যখন কলকাতা যাবে তখন যেন সস্ত্রীক যাচ্ছে এমন ভান করে যায়। এও ঠিক হয়েছিল কালীর স্ত্রী এই বলে সহায়তা করবে।

কালীর ছোট মামা দীনবন্ধু বিপ্লবী দলের সভ্য হয়েছিল। এই সময়ে তারকের অনুমতি নিয়ে দীনবন্ধু মামার সাহায্যে কালী প্রফুল্ল দাসের (গামা) সাথে দেখা করে। জালালাবাদ যুদ্ধের পরে এই প্রফুল্ল দাস কালীকে অনেকবার অনুরোধ করেছে তাকে বিপ্লবী দলের সভ্য করে নিতে। কালী সেই সুযোগ এবার নিল। প্রফুল্ল দাস দলে যোগ দিল।

কাট্টলী গ্রামের আর একটি ছেলে শান্তি চক্রবর্তী আমাদের দলে যোগ দিল। শান্তি বহু চেষ্টা করে প্রথমে আমাদের দলে যোগ দিতে না পেরে সে অনুশীলন দলে যোগ দেয়। শান্তি, গামা ও দীনবন্ধু তিনজনেই জানতে পেরেছিল জালালাবাদ যুদ্ধের পর বিপ্লবীদের একটি ছোট দল ফেরার পথে একটি পুকুর তাদের মাস্কেট্রি রেখে গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই এই তিন বন্ধু পুকুরে থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে যায়। শান্তি তখন অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিল। দীনবন্ধু ও প্রফুল্ল দাসের থেকে আমাদের দলের ছেলেরা জানতে পারলো যে শান্তি ঐ সব বন্দুক অনুশীলন পার্টিকে দিয়েছে। তারকেশ্বর এই কথা তাদের মুখে শুনে খুবই চিন্তিত হলেন। কালি দের সঙ্গে শান্তি চক্রবর্তীর বিশেষ ভাব হয় এবং সেই তাকে আমাদের দলে আনে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অর্থাৎ শান্তির বন্দুকগুলিকে অনুশীলন পার্টিকে দিয়ে দেওয়াতে আমাদের দলের সদস্যরা তার সাথে সাবধানে মিশত। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান চাই। সেইহেতু তারকেশ্বর কালীকে বলল, সে যেন

খুব সতর্কতার সঙ্গে শান্তির সাথে গিয়ে দেখা করে এবং তার ভাবগতিক দেখে যেন বোঝে তার মতিগতি কী এবং সে যদি সূর্য সেনের দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ পায় তবে কি সে যোগ দেবে।

শান্তি কালীর বিশেষ বন্ধু। তাই সতর্কতা নিয়ে তার সঙ্গে কালীর দেখা করা খুব অসুবিধা হয়নি। কালীর কাছ থেকে যে রিপোর্টটা পাওয়া গেল, তা খুবই আশাপ্রদ। তারকেশ্বর শান্তি সম্বন্ধে কালীর কাছ থেকে যা জানতে পারলো, তার থেকে সে সিদ্ধান্ত করলো সে নিজে যাবে তার সাথে কথা বলতে। কালীকে নিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই তারকেশ্বর হঠাৎ তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। শান্তি তারকেশ্বরের পরিচয় পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হোল যখন সে জানলো তারকেশ্বরই তখন মাস্টারদার দক্ষিণ হস্ত হয়ে কাজ করছে। রাইফেলগুলো অনুশীলন পার্টির হেপাজতে ছিল না, শান্তির কাছেই সেগুলো ছিল। কাজেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল কারণ আমাদের ছেলেদের জন্য মাস্কেট্রির খুব চাহিদা ছিল। শান্তি চক্রবর্তী আমাদের দলে যোগ দিল এবং ঐ মাস্কেট্রিগুলো নিয়ে এলো।

এই সময় আরেকজনকে আমাদের দলের সভ্য হিসাবে পেয়েছিলাম, তাঁর নাম যতীন মজুমদার। যতীন মজুমদার শান্তির বন্ধু। এদের নিয়েই দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে ১৯২২ সালে জানুআরিতে এই সংগঠনটি গড়ে উঠলো। চট্টগ্রাম শহরের পাশে এইরকম একটি শক্ত ঘাঁটি আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল। মাস্টারদা এই খবর পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এই ঘাঁটিটির সাহায্যে অন্যান্য জায়গায় সংযোগ রাখা সহজ হযেছিল। চট্টগ্রাম থেকে বাইরের যোগাযোগে এই সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। কাট্টলীর এই সংগঠনের সাহায্যে ১৯২২ সালে ফেব্রুআরি-মার্চ মাসে শ্রীশচীন সেন (মানদা) ও শ্রীবিনোদ দত্ত কুমিল্লা ও নোয়াখালি গেল।

আমার সঙ্গে আন্দামানে শান্তি চক্রবর্তীর দেখা হয়। শান্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমি শান্তির সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম। সবাই তাকে প্রশংসা করত। সে ছিল একনিষ্ঠ কর্মী। মাস্টারদার প্রতি তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। মাস্টারদার নির্দেশ পেলেই সে কাজ করতে ছুটতো। তার প্রখর বুদ্ধি ছিল। আন্দামানে সাড়ে চারশো বন্দীর ভিতরে সে-ই ছিল সবচেয়ে বেঁটে। সে যেদিন প্রথম আন্দামানে এলো আমার সঙ্গে সেদিন তার কথা হচ্ছিল। শান্তি—আমি এখন আর একসারসাইজ করতে পারি না। প্যারালাল বারে কোন রকম জিমন্যাসটিক করতে আমি অক্ষম।

১৬

এই সংঘর্ষের সময় এক মিলিটারী অফিসারের গুলিতে প্রীতিলতা আহত হন। আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে প্রীতির সঙ্গে কালীর একটি চুক্তি হয় যে, প্রীতিলতা এই সংঘর্ষ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে না। এই কথাটি আক্রমণকারীরা সবাই জানতো, এমনকি তারকেশ্বর ও মাস্টারদাও জানতেন। কালী প্রীতিকে অনেক বুঝিয়েছিল এবং তার এই ধরনের মনোভাব থেকে তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রীতিলতা একেবারে অনঢ়। প্রীতিলতা কালীকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আমাকে কথা দিন, পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওনার পরও আমি মরছি না দেখলে আপনার পটাসিয়াম সায়ানাইডের টুকরোটাও আমার মুখে গুঁজে দেবেন।

ভীষণ গুলিগোলা চলার পরে যখন ইংরেজরা পালালো আর বিপ্লবী ছেলেরা ফিরে আসছিল তখন প্রীতিলতাও তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলেছিল। তার পাশে ছিল কালী। সবাই তখন দূরে গেছে। প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া খুলে মুখে দিয়ে সেখানেই ঢলে পড়লো। কালী দেখে বুঝেছিল তার মৃত্যু অনিবার্য। তার চুক্তির কথা মনে পড়ল। সে তখন তার নিজের পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রীতির মুখে দিয়ে দিল।

এই পর্ব এখানেই শেষ হল। কিন্তু জয়দ্রথের কথা কিছুটা আমাকে বলতে হয়। জয়দ্রথ ক্লাব থেকে বার হয়নি। সে সেখানকার কর্মচারী। সেরূপ দায়িত্বজ্ঞানে সেখানেই থাকাটা সে সমীচীন মনে করেছিল। পুলিশ ও মিলিটারী এসে দেখে জয়দ্রথ একটি ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে। জয়দ্রথ এই ঘর থেকেই লাইট দিয়ে সংকেত দেয়। মিলিটারী এসে সেই ঘর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার ওপর খুব শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিল। জয়দ্রথ ইচ্ছা করলে প্রত্যেকের নাম ঠিকানা বলে দিতে পারতো, কিন্তু তার মুখ থেকে পুলিশ একটা কথাও বের করতে পারেনি। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর জয়দ্রথ

ছাড়া পেয়েছিল। তার পরেও বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে গেছে এবং নানা উপায়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছে। জয়দ্রথের সঙ্গে আমার কোনদিন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তবে আমাদের দলের প্রতি তাঁর যে সমর্থন ছিল, সেইজন্য আমি তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলাম। জয়দ্রথ এখন যেখানেই থাক না কেন সে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুক।

১০ই জানুআরি ১৯৭০ সালে আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। যাঁর বাড়ি থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করল, তিনি আমার কাকাবাবু সুবোধচন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন জেলার অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টার। তাঁরই গড়িয়ায় বাড়ি 'শিবালয়' থেকে আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। কাকাবাবু একজন শিবতুল্য লোক। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তারা তাঁকে কখনই ভুলতে পারেননি। ইমাম সাহেব তাঁর এককালের ছাত্র, এখন বেশ অবস্থাপন্ন এবং কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ নাগরিক। তিনি ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এক প্রাইভেট লিমিটেড প্রেসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। তিনি বারাসাতে (যেখানে তাঁর বাড়ি)। একটি হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই নতুন স্কুলটি ভালভাবে অর্গানাইজ করে দেওয়ার জন্য তিনি কাকাবাবুকে অর্থাৎ সুবোধচন্দ্র সেনকে হেড মাস্টারের পদে নিযুক্ত করবেন বলে মনস্থ করে কাকাবাবুর কাছে 'শিবালয়ে' এসে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি সেই হেড মাস্টারের পদটি গ্রহণ করেন। কাকাবাবু তখন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টার। চাকরি করলে মন্দ হয় না, কিন্তু অতদূরে স্কুল যাওয়া-আসা করাটা তাঁর মনঃপুত হচ্ছিল না। কিন্তু ইমাম সাহেবের এত মিষ্টি স্বভাব যে, তাঁর অনুরোধ কাকাবাবুর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এই ইমাম সাহেব হিন্দু-মুসলমান রায়টের সময় হিন্দু এলাকায় থাকাটা একেবারেই নিরাপদ বলে মনে করছিলেন না। কাকাবাবু তাকে একেবারে নিজের ছেলের মত ভাবতেন। একদিন তিনি ইমামকে বললেন, 'রায়টের সময় কখন কি হবে বলা যায় না। কাজেই তুমি আমার বাড়ি এসে যতদিন ইচ্ছে থাক।' ইমাম সাহেব কাকাবাবুর বাড়িতে প্রায় এক মাস ছিলেন।

কাকাবাবু হেডমাস্টারের পদটি গ্রহণ করেছিলেন এবং অতদূর থেকে তিনি সেখানে যাতায়াত করতেন। স্কুল খুব ভালভাবেই চলেছিল। খুব শীঘ্র সরকারী গ্রান্ট ও স্কুল বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছিল। কাকাবাবু সেখানে বোধ হয় দু-তিন বছর চাকরি করেছিলেন। তারপর তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণে ইমাম

সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে তিনি সেই প্রধান শিক্ষক পদে ইস্তফা দিলেন। আমি বলতে পারি, আমার গ্রেপ্তারের সময় তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তবে জোর গলায় প্রতিবাদ করতেন। তিনি কখনই বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, আমি কখন কোন অসামাজিক ও অন্যায় কাজ করতে পারি। কাকাবাবুর আমার প্রতি বিশ্বাসটি আমার জীবনের একটি মহামূল্য সঞ্চয়।

পুলিশের বড়কর্তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন পাঁচটি বড় বড় ডাকাতির ব্যাপারে। দুর্গাপুর 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়াতে' ডাকাতি অবশ্য হয়নি, তবে ডাকাতির সমস্ত রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিল। সেই তথ্যাদির উপর নির্ভর করে গল্প করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। যখন তাঁরা বুঝলেন আমি তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে কোন কথা বলবই না, তখন তাঁরা চলে গেলেন তের চৌদ্দ বছরের আগের কলকাতার বড় বড় ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে। এই সম্বন্ধে আমি আমার কথা আগেই লিখেছি। এখন পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য আমি যা জানতে পেরেছি সে কথা বলব।

সকাল নটা নাগাদ পার্ক স্ট্রীট পোস্ট-অফিসে একটি ভয়ংকর সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে গেল। এই ডাকাতি স্মরণ করিয়ে দেয় রুশ দেশের ট্রিফলিস্ ডাকাতি। জি. পি. ও থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা একটি ট্রাঙ্ক ও একটি ব্যাগে করে পার্ক স্ট্রীট পোষ্ট-অফিসে আসছিল। টাকা ছিল পোস্ট-অফিসের ভ্যানে। পোস্ট-অফিসে বিভিন্ন ধরনের ভ্যান ব্যবহৃত হোত। প্রতিদিনই জি. পি. ও-থেকে টাকা নিয়ে প্রায় ৬১টি পোস্ট-অফিসে টাকা দিয়ে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবার সন্ধ্যার সময় প্রত্যেকটি পোস্ট-অফিস থেকে টাকা কালেক্ট করে জি. পি. ও-তে নিয়ে যাওয়া হোত। এইজন্য প্রায় দশ এগারোটি ভ্যান প্রতিদিন ব্যবহৃত হোত। লাল রঙের পোস্টাল ভ্যানগুলোর সাইজ ও হাইট বিভিন্ন ধরনের। পেছনের দরজা দু' পাল্লা নয়ত এক পাল্লা হোত। বেশীর ভাগই দু' পাল্লা হোত। পেছনের দরজার ওপরের দিকে দুটি জানালা থাকত বাইরে দেখার জন্য। ভিতরে টাকা নিয়ে ক্যাশিয়ার ও ক্লার্ক বসত আর থাকত একজন কিংবা দু'জন রাইফেল নিয়ে সি. আর. পি। এই ভ্যানে ড্রাইভারের সামনের সীট পিছনের অংশ থেকে পার্টিশন করা। টাকা নিয়ে যাওয়া-আসার সময় আর একজন সি. আর. পি বন্দুক নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসত।

সেইদিন গাড়িটি জি. পি. ও থেকে প্রথম টাকা নিয়ে পার্ক স্ট্রীট

পোস্ট অফিসে আসছিল। সেদিন এই গ্রুপের সাতটা পোস্ট অফিসে টাকা ডেলিভারী দেওয়ার কথা ছিল। কাজেই যাদের টাকা লুট করার কথা ছিল, তারা ঠিক করেছিল টাকা কোন পোস্ট অফিসে ডেলিভারী দেওয়ার আগেই সব টাকা তারা লুঠ করে নেবে। তাই স্থানটি নির্দিষ্ট হল পার্ক স্ট্রীট থানার কাছে পোস্ট অফিসে। সকাল নটার সময় পার্ক স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। ঘন ঘন গাড়ি ও পুলিশের ভ্যান সেই পথে চলে। তাদের পরের ডেলিভারীর জায়গা ছিল এলগিন রোড পোস্ট অফিসে। এলগিন রোড পোস্ট অফিস অপেক্ষাকৃত অনেক নিরাপদ স্থানে ডাকাতি হতে পারত কিন্তু তার আগেই টাকার একটি বিরাট অংশ পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে ডেলিভারী হয়ে যেত। পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে বিপদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও ডাকাতির প্ল্যানটি চূড়ান্ত ভাবে ঠিক করা হয়েছিল যে, পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে পূর্বদিকের দরজা দিয়ে যখন টাকা ডেলিভারী দেবে, তখন ডাকাতিটি করা হবে। ভ্যানটি পোস্ট অফিসের পূর্বদিকে গা ঘেঁষে গলিটি দিয়ে প্রায় ৩০ গজ ভেতরে যাওয়ার পর একটি উঠোনের মত জায়গা আছে যেখানে গাড়ি ঘোরানো যায়, সেখানেই পোস্ট অফিসের পূর্বদিকের দরজা। টাকার থলি এই গেট দিয়ে নামিয়ে পোস্ট অফিসের ভেতরে সেভিংস ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শীল করা থলিতে ক্যাশ জমা নেয়। গলির মুখ থেকে উঠোন পর্যন্ত রাস্তার মাঝখানে ডাকাতি করা হবে ঠিক হয়েছিল। অনেক গবেষণা করে ঠিক হয়েছিল, উঠোনে যখন গাড়ি এসে থেমে যাবে এবং বড় বড় টাকার ব্যাগ নামাবে, সেইটি আক্রমণের ঠিক সময়।

নির্দিষ্ট দিনে টাকা নিয়ে ছোট ভ্যানটি এলো। তাতে 'ডাকাতদের' সমস্যা অনেক কমে গেল। যদি বড় ভ্যান আসতো, তবে তার ভিতরে যে বন্দুকধারী প্রহরী ও ক্যাশিয়ার প্রমুখ থাকত, তাদের বাইরে থেকে দেখা যায় না; সেইহেতু একটি দেড়ফুট উঁচু লম্বা বেঞ্চ এবং একটি ছোট দেড় ফুট উঁচু টুলও তাদের নিতে হয়েছিল। উঁচু ভ্যানের মধ্যে বন্দুকধারী প্রহরী ও ক্যাশিয়ার প্রমুখ লোকদের পিস্তল, স্টেনগান প্রভৃতি দেখিয়ে কমাণ্ড করতে হলে এই জাতীয় টুল ও বেঞ্চ ছাড়া কাজ হোত না। ঐ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য তারা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। পোস্ট অফিসের গলির মুখে ফুটপাথের উপরে ছোট পান বিড়ির দোকানের সামনে তারা সকাল নটা থেকে বেঞ্চ নিয়ে বসেছিল। যদি সেদিন বড় ভ্যান এসে পড়ত তবে এই বেঞ্চগুলি টেনে নিয়ে উঠোন পর্যন্ত যাওয়া হত এবং ভ্যানটি থামলেই ভ্যানের পাশের ও পেছনের জানলার দিকে বেঞ্চ ও

টুল রাখা হ'ত। যে দু'জন যুবকের ভ্যানের ভিতরের লোকদের পিস্তল দেখিয়ে কমাণ্ড করার কথা ছিল, তারা চট্ করে এই বেঞ্চ ও টুলে দাঁড়িয়ে কমাণ্ড করত। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না।

ছোট ভ্যানটি এসে দাঁড়াল। নীচে দাঁড়িয়েই ভ্যানের ভিতরটা সব দেখা যায়। ভ্যান দাঁড়ান মাত্রই তাদের কাজ শুরু হয়ে গেল। দুটি রোড ব্লক দিয়ে ভ্যানের চাকা জাম করে দিল আর চাকা দুটি পাংচার করে দিল। সামনের সীটে ড্রাইভার ও তার পাশে একজন বন্দুকধারী সেপাই ছিল। আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন সেপাইকে গুলি করল, যদিও তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল—'বিনা প্রয়োজনে কাউকে গুলি করবে না।' তাদের যথেষ্ট বলা হয়েছিল যেন একজন কম্যাণ্ড করে এবং সেই কম্যাণ্ড যেন সরকারী পক্ষের পুলিশ ও পোস্ট অফিসের কর্মচারীরা বুঝতে পারে। কিন্তু সেখানে এমনই একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা সবাই মিলে বলছিল, 'বন্দুক ফেলে দাও, চুপ করে থাক, ভয় পেও না, পালাতে চেষ্টা ক'র না' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ড্রাইভারের সীটের বাঁ পাশ থেকে ফায়ার হল। সেপাইটি বন্দুক ফেলে সেখানেই ভয়ে পড়ে রইল। ক্যাশিয়ার বাবু তার বন্দুকটি তুলে নিয়ে ভ্যানের পেছনের দিকে ডাকাতদের লক্ষ্য করে বন্দুকের ট্রিগার টিপলেন। বোঁ করে একটা গুলি ছুটলো। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল একজন ডাকাত। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গুলি এসে আঘাত করল ক্যাশিয়ার বাবুকে। ক্যাশিয়ার বাবুর হাতের বন্দুক খসে পড়ল। এরা একটি ভারী ট্রাঙ্ক ভ্যান থেকে বার করে আনল। বিভিন্ন পোস্ট অফিসে টাকা ডেলিভারী দেওয়ার জন্য এই ট্রাঙ্কে টাকা ভর্তি ছটি ব্যাগ ছিল। পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে দেওয়ার জন্য একটি বড় ব্যাগ আলাদা করে বাঁধা ছিল। যুবকরা ট্রাঙ্কটা নামাল কিন্তু বড় ব্যাগটা নামাল না। গুলি করা, সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি করা, ব্যাগ ফেলে আসা—এ সবই স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে ঘটল। ওদের যদি মাথা ঠাণ্ডা থাকত ও সুশৃঙ্খল ভাবে গাড়িটি ঘেরাও করে সঠিক ভাবে কম্যাণ্ড করত তবে দেখতে পেত সবাই কাবু হয়েছে এবং ভ্যানের ভিতরের ক্যাশিয়ার বাবু সেপাই-এর পরিত্যক্ত বন্দুক নিয়ে গুলি ছুঁড়তেও পারতেন না। আর ড্রাইভারের পাশে যে সেপাই বন্দুক নিয়ে বসেছিল সে-ও বন্দুক ফেলে পালাতে পারত না, ড্রাইভারও পালিয়ে যেতে পারত না।

পুলিশ এইসব কথাই আমার কাছে ব্যক্ত করে, তবু সামান্য একটি বেতের

ছড়ি নিয়ে অনেক গবেষণা করেও সেইটির তাৎপর্য উদ্ধার করতে পারেনি। কেন ছড়িটি নেওয়া হয়েছিল ? বন্দুক নয় পিস্তল নয়, সামান্য একটি ছড়ি। এইটির বিশেষ তাৎপর্য আমি তাদের মুখে শুনেছিলাম। তারা একটি সমস্যার কথা ভেবে খুব গবেষণা করে এই ছড়িটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 'সমস্যাটা' হল এই—ভ্যানের পেছনে যে সেপাই বা পোস্ট অফিসের কর্মচারী বসে থাকে সে পেছনের দরজাটা একটু খোলা রেখে দরজার পাল্লাটা ধরে থাকে বাতাস পাওয়ার জন্য। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার পর ভয়ে বা স্বজ্ঞানে একটানে যদি দরজাটা বন্ধ করে দেয়, তবে বিপ্লবী ডাকাতদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়াত ভীষণ এক সমস্যা। দরজা ভাঙতে হোত। সেইজন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। হ্যামার দিয়ে আঘাত করে ক্রো-বার (রেল লাইন তোলার যন্ত্র) দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া পাঁচ ছয় ইঞ্চি বিস্ফোরক দ্রব্য ভর্তি লোহার পাইপটি দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ইলেট্রিক সুইচের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটালে দরজা ভেঙে চুরমার হোত। এই বিরাট আয়োজনের বদলে কেবল একটি ছড়ি দিয়ে যদি সময়মত কাজ করা হয়, তবে এই সমস্ত গুরু দায়িত্ব এড়ানো যায়। আক্রমণ করার পূর্ব মুহূর্তে এবং কম্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে একজন ঐ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঐ ছড়িটি গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দেবে, তাহলে যতই দরজা টানুক না কেন দরজা বন্ধ করা আর সম্ভব নয়। কাজেই সামান্য একটি ছড়ির সময়মত ব্যবহার একেবারে অপরিহার্য ছিল। সেইজন্য তারা আগে প্র্যাকটিশও করে। পুলিশ হতভম্ব হয়েছিল। এই ছড়িটির অর্থ তারা খুঁজে পায়নি ; কারণ বৃটিশ আর্মি ম্যানুয়েলে এই সবের উল্লেখ নেই। গেরিলা যুদ্ধে এই জাতীয় তুচ্ছ জিনিসকেও কাজে লাগানো হয়।

বিপ্লবী ডাকাতরা যখন ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন রক্তাক্ত দেহে পড়ে থাকা ক্যাশিয়ার বাবুকে দেখে মনে করেছিল তিনি হয়ত আর বাঁচাবেন না। বড় রাস্তার ধারে তাদের গাড়ি:রেডি ছিল। টাকা ভর্তি বড় ভারী ট্রাঙ্ক গাড়ির পেছনে ক্যারিয়ার বক্সে তুলল। গার্ডদের দুটো টেন শট ম্যাগাজীন রাইফেল নিয়ে আসতে তারা ভুল করেনি। ড্রাইভার আগে থেকেই গাড়িতে বসে ছিল। আরও পাঁচজন গাড়িতে উঠল। তারা ছয় জনই খুব কায়দা করে বসেছিল। পিছনের সীটের মাঝের ছেলেটি পিস্তল হাতে হাঁটু গেড়ে পিছনের দিকে মুখ করে বসে। তার পাশে একজন ডানদিকে আর একজন বাঁদিকে মুখ করে

রিভলবার হাতে বসেছিল। ড্রাইভারের পাশে যে দু'জন ছিল, তার একজন বাঁদিকে এবং অপরজন সামনের দিকে ও ডানদিকে লক্ষ্য রাখছিল। তাদের রুট ছিল ডানদিক ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে যাওয়া। অফিস টাইম। দু'দিক দিয়েই গাড়ি চলছে। তবু গাড়ি থামিয়ে ডানদিক দিয়ে তাদের ঘুরতেই হবে।

পেছনের সীটে ডানদিকে যে ছিল, সে রিভলবার বার করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, গাড়ি থামাও। সামনের সীটে যে বাঁদিকে বসেছিল, সেও রিভলবার বার করে উচ্চস্বরে সবাইকে বলতে লাগল, 'গাড়ি থামাও।' কাজেই দু'দিকের গাড়ি থেমে যাওয়াতে তাদের গাড়ি ঘোরাতে সুবিধা হল। সেই মুহূর্তে তারা একটি খুব শক্তিশালী ক্র্যাকার (দেশী হাত বোমা) ফাটল। ক্র্যাকারের ভয়ংকর শব্দে সবাই ভীত ও ত্রস্ত হল। নির্বিবাদে বিপ্লবীদের গাড়িটি এগিয়ে গেল। তবু তারা প্রস্তুত ছিল যদি আচম্বিতে সামনের ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে কোন পুলিশ ভ্যান আসে। সেইরূপ ক্ষেত্রে তারা ট্রাফিক আইন ভেঙ্গে ত্রিকোণ পার্কের ফুটপাথের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে বেঁকে বেরিয়ে যাবে। এই যুদ্ধনীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। রামায়ণ-মহাভারতেও হয়েছে, আর হিটলারও বেলজিয়ামের নিউট্রালিটি মানেননি। 'আতুরে নিয়ম নাস্তি'। যাই হোক সেইদিনের সব লক্ষণই বিপ্লবীদের অনুকূলে ছিল।

তাদের প্রায় দশ পনের বছর পরে এই অভিযান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হল। গাড়িটি ছিল ল্যাণ্ডমাস্টার। তাতে বেশকিছু ডিফেক্টও ছিল। গাড়িটি সারানো হয়নি। ভাল গাড়ি যেটি ছিল, এই ডাকাতির একদিন আগে সেটি অ্যাকসিডেন্ট হয়। কাজেই সেটি অকেজো হয়েছিল। কিন্তু তবু তারা নির্দিষ্ট দিনটি পরিবর্তন করল না। অনেক ডিফেক্ট থাকা সত্ত্বেও তারা ল্যাণ্ডমাস্টারটি নিয়ে গেল। যদি এই গাড়িটি হঠাৎ অচল হয়ে পড়ত, তবে তার পরিবর্ত হিসাবে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি তারা আগে থেকে ভাড়া করে রেখেছিল। যে গাড়িটি ভাড়া করেছিল, সে একজন সুদক্ষ ড্রাইভার। যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তার হাতে ট্যাক্সি চালাবার জন্য নতুন গাড়িটি ছেড়ে দিল, তার পুরো পরিচয় তিনি জানতেন। যদি এই গাড়িটি ঘটনাস্থলে কোন কারণবশতঃ ধরা পড়ত বা যে ট্যাক্সি চালাবার জন্য এই গাড়িটিকে নিয়ে এসেছিল সে ধরা পড়ত, তবে তার সূত্রে পুলিশ দলের অন্যদের ধরে ফেলত। তবুও মন্দের ভাল, স্পটে ধরা না পড়ার জন্য শেষ পর্যন্ত এই নতুন গাড়ি ব্যবহার করার রিস্ক তারা নিয়েছিল।

১৭

যখন বিপ্লবী ডাকাতরা হানা দেয় তখন পোস্ট অফিস থেকে পার্ক স্ট্রীট থানায় টেলিফোন করে। পার্ক স্ট্রীট থানা মুহূর্তে লালবাজারে খবর দেয় এবং পার্ক-স্ট্রীট থানা থেকে দুটি ভ্যান বোঝাই পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পার্ক স্ট্রীট থানার দরজায় ডাকাতি, তবু তোড়জোড় করে আসতে পুলিশের দশ-পনের মিনিট লেগে গেল। যখন তারা এল, ডাকাত তখন হাওয়া। তখন পুলিশ এসে কি করবে? সব পুলিশ ভ্যানকে ওয়্যারলেশে খবর দেওয়া হল—'কালো ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়িতে ছয়জন ডাকাত ডাকাতি করে পালিয়েছে। তাদের সঙ্গে বোমা পিস্তল আছে।' পথে পথে সন্দেহজনক ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়ি পুলিশ চেক করতে লাগল।

এদিকে বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে এই বিপ্লবী ডাকাতদের গাড়িটি তাদের নির্দিষ্ট আস্তনায় গিয়ে পৌছাল। পথে এই গাড়িটিকে নিয়ে তাদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। রেডিয়েটারে এক ফোঁটাও জল ছিল না। লেকের সামনে গাড়িটি দাঁড় করিয়ে তারা রেডিয়েটারে জল ঢালে। যে পাড়ায় গাড়িটিকে নিয়ে গিয়েছিল সে পাড়ায় রিটায়ার্ড বড় বড় পুলিশ অফিসারেদের বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতেই রিভলভার নিয়ে তাদের বডি-গার্ড থাকে।

টাকার ট্রাঙ্কটি মস্ত বড়। ভারীও খুব। সেটি নামাতে দেখলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ছিল দুটি ম্যাগাজীন রাইফেল নামান। পাছে কারো চোখে পড়ে। ডাকাতির স্পট থেকে গাড়ি ছুটে এসেছে। খুব দূর থেকে কেউ যদি লক্ষ্য করে থাকে, তাহলে পুলিশ খুবই শীঘ্র এসে হানা দেবে।

লুটের টাকা ও দুটো ম্যাগাজীন রাইফেল সেই বাড়িতে রেখে তালা দিয়ে তক্ষুনি সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত মনে করে তারা সরে গিয়েছিল। এইরকম নির্দেশই তাদের উপর ছিল। কিন্তু কোন পুলিশ এসে হানা দেয়নি।

বাড়িটির উপর পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তারা নজর রেখেছিল। বোঝা গিয়েছিল কেউ বাড়িটিতে নজর রাখেনি। তবু এক ঘণ্টা পরে সতর্কতা

নিয়ে তারা তিনজন সেই বাড়িটিতে ঢুকে নোটগুলো বার করল। তাদের সেণ্ট্রাল কমিটির একজন সদস্য একলক্ষ টাকার একটি বাণ্ডিল দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, বলে নিল। আরেকটি পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল দেওয়া হল আর একজন সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্যকে যার সঙ্গে তাদের মতের খুব মিল ছিল না, বনিবনাও ছিল না। বাকী টাকা কলকাতা শহরে তিনটি বাড়িতে রাখা হল। এই কাজ একঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত করে ঘরে তালা দিয়ে তারা সবাই আবার চলে গেল। দূর থেকে পাহারার ব্যবস্থা রাখল কারণ তখন সেই বাড়িতে পোস্ট-অফিসের বড় একটি খালি ট্রাঙ্ক ও দুটি ম্যাগাজিন রাইফেল ছিল। দিনের বেলা এগুলোকে সরানো যুক্তি সঙ্গত হবে না বলে মনে করেছিল। রাত আটটার সময় গাড়ি নিয়ে এসে সেই বড় ট্রাঙ্ক ও দুটি রাইফেল তারা সেই বাড়ি থেকে নিয়ে কুইন্স পার্কের রাস্তার ধারে ট্রাঙ্কটি নামিয়ে রাখল, আর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে রাস্তার ধারে রাইফেল দুটো নামিয়ে তারা গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

রাত প্রায় বারোটার সময় টহলদারী পুলিশ ট্রাঙ্ক ও রাইফেল দেখতে পেয়ে বালিগঞ্জ থানায় রিপোর্ট করে। থানা থেকে পুলিশ এসে সেগুলো নিয়ে থানায় জমা দিল এবং লালবাজারে খবর দিল। লালবাজার থেকে বিজ্ঞ অফিসাররা এসে যখন বুঝল পোস্ট-অফিসের ডাকাতির ট্রাঙ্ক ও লুট করা দুটি রাইফেল, তখন তাদের আক্কেল গুড়ুম। তারা ভেবেই পাচ্ছিল না ডাকাতরা রাইফেল দুটি নিলই বা কেন, ফেরতই বা দিল কেন? এই নিয়ে পুলিশদের মধ্যে বহু গবেষণা হয়েছে। কেবল তা-ই নয় পাবলিকের মধ্যেও এই নিয়ে কম গবেষণা হয়নি। পুলিশের বিশেষজ্ঞরা আমাকে এই প্রশ্নটি করে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জবাবের আশায়। আমি তাদের উত্তর দিয়েছিলাম, 'আপনাদের এতজন বিশেষজ্ঞ পুলিশের মাথায় এই প্রশ্নের জবাব যখন খুঁজে পেলেন না, তখন কি করে আশা করতে পারেন আমার কাছে জবাব পাবেন?'

এখন আমি বলি কেন দুটো রাইফেল সেখানে আবার বিপ্লবী ডাকাতরা ফেলে গিয়েছিল। দুটো রাইফেল কোন বাড়িতে লুকিয়ে রাখা খুব সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়; বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রীর অনুমোদন না থাকলে এবং স্বেচ্ছায় যদি তারা রাইফেল গোপন রাখার জন্য জায়গা না দেন, তবে রাইফেল রাখা সহজ নয়। সংগঠনে প্রতিষ্ঠাবান লোকের সংখ্যা মোটেই ছিল না বললেই চলে। সংগঠনের সদস্যরা প্রায় সবাই নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তাদের কোন আলাদা ঘর নেই। একটি ঘরেই হয়ত বাবা মা ভাই বোন সবাই একসঙ্গে থাকে। সেইরকম

বাড়িতে কি ভাবা যায় রাইফেল রাখার কথা ? তাছাড়া সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য যার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখতে দেওয়া হয়েছিল, সে সন্ধ্যার সময় তা ফেরত দিল এবং বলল টাকা রাখার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আরেকজন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য যে একলক্ষ টাকা নিজের হেপাজতে রাখবে, বলে নিয়ে গিয়েছিল, সে দু'দিন পরে ফেরৎ নিয়ে এলো এবং দুঃখের সঙ্গে জানাল টাকা রাখার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই ছিল সংগঠনের বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থা দলের সাধারণ সদস্যরা বুঝতে না পারলেও দলের শ্রেষ্ঠ নায়ক ভাল করেই বুঝেছিলেন। এই অবস্থায় রাইফেল রেখে যে ঝুঁকি সবসময় নিতে হত সেই ধরনের প্রস্তুতি তাদের ছিল না বললেই চলে। তাই নির্বিবাদে যে চার লক্ষ টাকা পাওয়া গেল, তা দিয়ে বিভিন্ন খরচ মিটিয়ে সংগঠনের বুনিয়াদটি তৈরী করার অধিক প্রয়োজন ছিল।

'আওয়ার স্ট্যাণ্ড'-এর সময় থেকে আমাদের একটা চিন্তাধারা ছিল যে চার লক্ষ টাকা আমাদের নির্বিবাদে পেতে হবে। পোস্ট অফিসে এই ডাকাতির পরে আমাদের এতদিনের স্বপ্ন ও সাধনা সফল হয়েছে বলে মনে হল। পুলিশ আমাদের কাউকে ধরতে পারল না। লুটের মাল ধরা পড়ল না। পুলিশ আমাদের সন্দেহও করতে পারল না। এই ডাকাতির পর পুলিশ প্রায় এক হাজার লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করেছে তাদের সঙ্গে বার চৌদ্দ বছর আগে সোনার দোকানে যারা ডাকাতি করেছিল তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে কিনা। পুলিশ কাউকে সোজা প্রশ্ন করেছে অনন্ত সিংহকে তারা সন্দেহ করে কিনা। কেউ কেউ নাকি উত্তর দিয়েছিল, অনন্ত সিংহের হাতে কি একটা পিস্তল বা স্টেনগান ছিল না ? তাদের ডাকাতি করতে হল পাইপগান দিয়ে ?' সত্যি ডাকাতিটি হয়েছিল ক্র্যাকার ও পাইপগান দিয়ে।

১৯২৩ সালে পড়ইকোড়া গ্রামে ডাকাতির সময় আমরা রিভলভার, ক্র্যাকার ও শর্টগান ব্যবহার করেছিলাম, তবু পিস্তল ফায়ার করা হয়নি। কারণ পিস্তল ফায়ার করলে কার্তুজের খোল বাইরে ছিটকে পড়ে এবং তা দেখে পুলিশ বুঝতে পারে যে পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছে। রিভলবারের কার্টিজ ফায়ার করার পরে বাইরে পড়ে না, চেম্বারেই থেকে যায়। সাধারণ লোক কেবলমাত্র আওয়াজ শুনে বন্দুক ফায়ার হয়েছে কী রিভলভার ফায়ার হয়েছে, তা বলতে পারে না। পিস্তল ব্যবহার করলে পুলিশ বুঝে নিত স্বদেশীরা আবার তৎপর হয়েছে।

পোস্ট অফিসের চার লক্ষ টাকা ডাকাতি হওয়াতে পুলিশ বিভ্রান্ত হয়েছিল—

সঠিক বুঝতে পারছিল না যে, এই ডাকাতি অনন্ত সিংহের দলের লোক করেছে কিনা। কারণ এই ডাকাতিতে তারা পাইপগান ব্যবহার করেছিল এবং নিজেদের তৈরী পাইপগান ইচ্ছে করে সেখানে ফেলে এসেছিল।

পুলিশ অনুসন্ধান বন্ধ করেনি। দিনের বেলায় এতবড় একটি ডাকাতি হয়ে গেল, ডাকাতরা চার লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হল, ক্যাশিয়ার বাবু ও সি. আর. পি-র লোক আহত হল—এতসব কাণ্ডের পরেও ডাকাত দলের হদিস করতে না পারা কলকাতার ডি. ডি. ডিপার্টমেন্টের পক্ষে খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। তাই এই কলঙ্ক মোচন করতে তারা বেছে বেছে কয়েকজনকে ডাকাত সন্দেহ করে ধরল এবং তাদের পুলিশ কাস্টাডিতে রেখে কারো কারো কাছ থেকে 'স্বীকারোক্তি' আদায় করল, আবার তাদের মধ্যে কারোকে দিয়ে হাকিমের কাছে জুডিসিয়াল কনফেসন রেকর্ড করাল। এই দুর্ভাগা ব্যক্তিদের বহু মাস ধরে জেল হাজতে আটক থাকতে হয়েছিল। তারপর যখন পুলিশ অনন্ত সিংহের দলকে ধরে মামলা রুজু করতে যাচ্ছে তখন তারা তাদের মারাত্মক ভুল বুঝতে পারল এবং ভুল ব্যক্তিদের নামে মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছে। তাদের সবাইকে তখন জামিনে মুক্তি দেওয়া হল।

আজ মনে হচ্ছে যদি পুলিশ আমাদের দোষী মনে করে না ধরত তবে হয়ত এই হতভাগ্যদের সাজা হত ও তাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড ভোগ করে মরা ছাড়া উপায় ছিল না। যখন আমাদের চার্জশীট দেয়, তখন এই ভদ্রলোকদের কেস পুলিশ তুলে নিল।

এই ডাকাতি সুসম্পন্ন হওয়ার পরে যখন আমরা একেবারে পুলিশের দৃষ্টির বাইরে ছিলাম তখন ভেবেছিলাম আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ নির্বিবাদে শেষ করতে পারব। আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল চার লক্ষ টাকা খরচ করে সংগঠনের একটি অপরিহার্য প্রাথমিক স্তর তৈরী করব। সেখান থেকে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে কাজ করা যাবে। প্রাথমিক স্তরের কাজ হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম যে, কাজ চালাবার জন্য কয়েকটি বাড়ি এবং গাড়ি থাকবে। আমি প্রথম কাজটি সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে বাছাই করা ক্যাডারকে নিয়ে স্কুল চালাব। সেই স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব আমারই থাকবে। স্কুলে সদস্যরা আসবে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যেন তাদের আসা যাওয়াটা অহেতুক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। আর আমি যাব গোপনে এবং প্রয়োজনে মেক-আপও নেব। যে শিক্ষা আমি তাদের দেব বলে ভেবেছিলাম সেই শিক্ষা আমাদের সংগঠনে আর কেউ দিতে পারত বলে আমার জানা ছিল না। বিভিন্ন

গ্রুপে মাঠে বসে যেসব সদস্যদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা এই পরিকল্পনার কথা আমার মুখেই শুনেছিল। তিন ঘণ্টা করে চারটি ক্লাশ করব চারটি নিরাপদ বাড়িতে। বাড়ি নিশ্চয় বড় হবে। যারা ঢুকবে বের হবে, তাদের পরিচয় পুলিশ জানবে না। এই বাড়িতে ক্লাশ হচ্ছে তাও বুঝবে না। আর আমাকে নিয়ে একটি গাড়ি প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে ঢুকে যাবে।

আমাদের যেসব সদস্য ছিল, তাদের অধিকাংশেরই বয়স কম এবং প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সেই রকম বড় বাড়ি ওদের কারো পক্ষে ভাড়া করা সম্ভব ছিল না। তার জন্য চাই স্ট্যাটাস। স্টাটাস তৈরী করে তখন বাড়ি ভাড়ার চেষ্টা করা হত। সেইরকম পরিকল্পনার কাঠামোটা আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল। কিন্তু কোন কিছুই করা যাচ্ছিল না আমাদের টাকার অভাবে। নির্বিবাদে চার লক্ষ টাকা আসার পর আর দেরী করার কোন প্রয়োজন ছিল না। চারটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী তৈরী করা, প্রত্যেকটি কোম্পানীতে তিন চারজন করে ডাইরেক্টরের এবং একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টারেব নাম দেওয়া, কোন জানা উকিল বা এটর্ণীর সাহায্যে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোশিয়েশন ও 'আর্টিকেলস অফ মেমোরাণ্ডাম ছাপিয়ে নিয়ে রেজিস্ট্রি করা। কোন কোম্পানী এভাবে চালু করতে খুব সামান্য টাকায় করা যায়। তার পরের কাজ অর্থসাপেক্ষ। যেমন নাকি গাড়ি কেনা ও বড় বাড়ি ভাড়া করা। সেই সব বাড়িতে কেবল থিওরিটিক্যাল ক্লাশ হবার কথা ছিল তা নয়, সেখানে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া ও প্রাথমিক আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করারও ইচ্ছা ছিল।

মোটর গাড় চালাবার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা ও টার্গেট প্র্যাকটিশ করার পরিকল্পনাও ছিল।

আমাদের সংগঠনের গোপন পুস্তিকা বার করার জন্য একটি ছোট প্রেস কেনার পরিকল্পনা ছিল। ভাবা হয়েছিল পুলিশই সেরকম পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করবে, আর প্রেস সীজ করবে তা নয়, অন্যান্য বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের বিরূপ মতবাদের প্রচার থাকলে তারা যে-কোন সময় প্রেসটি ভেঙ্গে দিতে পারে ও যারা এই গোপন পুস্তিকা বহন করবে, তাদেরও মারধোর করে পুস্তিকা সব পুড়িয়ে দিতে পারে। এইসব আশংকা করে তার বিকল্প ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যে ধরনের কাজ করা প্রয়োজন, সেই ট্রেনিং দেওয়ারও কথা ছিল। এই ভেবেই আমরা সংগঠনের প্রথম স্তরে একটি স্প্রিং বোর্ড তৈরী করার পরিকল্পনা অনিবার্য বলে মনে করেছিলাম। আমাদের সংগঠনের প্রথম সারির ছেলেরা

এবং নেতারা নিশ্চয় এই বিষয় খুব ভাল করে জানত। কিন্তু ডাকাতি হয়ে যাবার পর এই সাংগঠনিক প্রোগ্রাম নিয়েই আমাদের আলোচনার কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু আমাদের ভিতরে আমার পরেই যে ফিল্ড কম্যাণ্ডে ছিল, সে হঠাৎ নতুন করে অবতারণা করল, 'আপনি আগে এই ধরনের কথা যা বলেছিলেন, সেগুলো তখন আমি খুব ভাল করে শুনিনি। আমার মনে হয় এখন আমাদের আবার ভাল করে আলোচনা করে কর্মসূচী স্থির করা উচিত। এই সব টেকনিকাল প্রোগ্রাম আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত নয়। তার পূর্বে আমাদের স্থির করতে হবে বিপ্লবের নীতি ও কৌশল।'

মার্কসবাদী ও লেনিনবাদীদের বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশল প্রথম থেকেই জানতে হয়। অর্থাৎ কোন শ্রেণী বর্তমান যুগে বিপ্লবী শ্রেণী বলে গণ্য হবে এবং এই বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে কারা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে আর কারা সহানুভূতিশীল থাকবে—এইসব তত্ত্ব আমাদের মধ্যে আগে বহুবার আলোচনা হয়েছে। আজ যখন চার লক্ষ টাকা খরচ করে প্রাথমিক স্তরে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করা প্রয়োজন, যেমন মোটর গাড়ি কেনা দরকার, কয়েকটি বড় বাড়ি ও ছোট নিরাপদ বাড়ি ভাড়া করা প্রয়োজন যখন এইসব বড় বাড়িতে অন্তত চল্লিশজন ক্যাডারকে গোপনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, তখন তা না করে ওই ধরনের প্রসঙ্গ তুলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নীতি ও কৌশল নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনকে হয়েছিল।

দিনের বেলা পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে চার লক্ষ টাকা ডাকাতি হওয়ার পর আমাদের প্রথম সারির চল্লিশটি ছেলে বুঝতে পারে যে, সবারই মনোবল অনেক বেড়ে গেছে। তারা উৎসাহিত হল এবং দিন গুণতে লাগল কবে সক্রিয়ভাবে তাদের ট্রেনিং ক্লাশ শুরু হবে, যে ট্রেনিং ক্লাশ স্বয়ং আমি পরিচালনা করব। ওদের মধ্যে যারা ফিল্ড কম্যাণ্ডারের কথায় বিভ্রান্ত হল, তারা বলতে লাগল 'কি ক্লাশ হবে? আমরা তো কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো কয়েকবার পড়ে মুখস্ত করে ফেলেছি। লেনিনের 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' বহুবারই পড়েছি। নতুন তিনি আর কি বলবেন?...এদের মধ্যে প্রায় সবাই জেলে আট বছর থাকার পরে বলতে লাগল—'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো, 'হোয়াইট ইজ টু বি ডান' প্রভৃতি কিছুই বুঝিনি, না বুঝেছি চাইনাজ কম্যুনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশল। আমরা কেবল স্লোগানের ভিত্তিতে চাইনীজ কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি ও কৌশল বুঝেছি বলে মাত্র জাহির করেছি যথা 'গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও করা' কিন্তু বুঝিনি

যে কৃষি বিপ্লব করতে হবে কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে প্রলেটারীয়ান পার্টির নেতৃত্বে। এই মূল জিনিসটি অর্থ বিশ্লেষণ করে না! বুঝে চেঁচালে বিপ্লব কখন হয় না। মূল তাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি যে এক ছিল না, তা নিয়ে এখানে আর বিশেষ বলব না।

আমাদের প্রথম সফল ডাকাতির পর চার লক্ষ টাকা পার্টি ফাণ্ডে আসার পরে যে কাজের প্রোগ্রাম সাধারণভাবে আমাদের কাছে নির্ধারিত ছিল তা ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের গোপন দলের সর্ব স্তরের সবাই কেবল আলোচনা করেই সময় কাটালাম তিন মাস। আর সব কমরেডরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারা কিছু জানতে পারছিল না। তাদের মনে প্রশ্ন ছিল। কেন ক্লাশ না করে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তাদের তা বিশ্লেষণ করে বলাও হয়নি। এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীনের পরিচয় আমাদের দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না। কেন আমরা এই রাজনৈতিক ডাকাতির আগে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুরো সচেতন ছিলাম না? ফিল্ড কম্যাণ্ডের নেতা কেন প্রশ্নটি নতুন করে তুললেন—কেন কিভাবে আমরা প্রোগ্রাম ঠিক করব তা বিবেচনা করা উচিত। আমি সেই সভায় বলেছিলাম—না বুঝে ও প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেয়ে ফিল্ড কম্যাণ্ডার কি করে ডাকাতি করতে পারলেন? আজ কেন তিনি এই রকম বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের আলোচনা করতে চাইছেন। আলোচনা যখন শুরু হয়েছে তখন তা শেষ না করে কোন উপায় ছিল না।

আমি এক মাসের জন্য চোখের ছানি কাটাতে বম্বে যাই। বম্বে থেকে ফিরে এসে দেখি সংগঠনে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থা। তারপরে হল আমাদের গোপন সভা এবং সেই সভায় নিশ্চলতার কারণ আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিল যখন বুঝলাম সমস্ত বিভ্রান্তির মূলে আছে ফিল্ড কম্যাণ্ডার। ইতিমধ্যে ফিল্ড কম্যাণ্ডার প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছে এবং প্রত্যেককে তার স্বপক্ষে পেয়েছে, কেবল একজনই তার মতবাদ মেনে নিতে পারেনি। তাকে ধরে নেওয়া যায় সেই ছিল সংগঠনের মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে আমার মত ও পথ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করল। সত্যি বলতে কি আমি সেদিন নিজেকে খুব অসহায় মনে করেছিলাম, আর ভেবেছিলাম তখনই সংগঠন ছেড়ে চলে যাই। সে এক অসম্ভব অবস্থা। এক এক করে সবাই বক্তব্য রাখল এবং ফিল্ড কম্যাণ্ডারকে সমর্থন করে গেল। তখন আমার মনে হয়েছিল আমার আর কিছু করার নেই, আমি বিদায় হই। কিন্তু কর্তব্যের ডাক শুনতে পেলাম—"অনন্ত সিং, ধৈর্য ধর। তোমায় সাহস করে এগোতে হবে।' আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম এবং নিজেকে সংযত করে নিয়ে আলোচনায় যোগ দিলাম।

১৮

প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা ও তারও বেশী সময় আমার বক্তব্য যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাতে লাগলাম। এভাবে পাঁচ ছয় দিন বোঝার পর প্রত্যেকেই আমার যুক্তি মেনে নিল, এমনকি ফিল্ড কম্যাণ্ডারও আমার যুক্তি স্বীকার করে নিল। তারপর আমরা সবাই একমত হয়ে কয়েকটা কর্মসূচী গ্রহণ করলাম।

যখন সবাইকে নিয়ে এই পর্ব শেষ হচ্ছিল, তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উগ্রপন্থী যে সে টাইফয়েডে ভুগছিল। সে অন্যের মুখে সব রিপোর্ট পাচ্ছিল। সবার মূল ভাবনা যে কি, মাত্র একজনের রিপোর্টে তা বোঝা যায় না, সেও বুঝতে পারেনি বা বুঝতে হয়তো চায়নি আর তখন তার বোঝার মত ক্ষমতাও হয়ত ছিল না। এই ছিল সংগঠনের ভিতরের অবস্থা।

আমি যে এগুলো প্রকাশ করছি, তাতে অনেকের মনে প্রশ্ন—এই দুর্বলতা প্রকাশ করার কি কোন অর্থ আছে? আমার কাছে দুর্বলতা গোপন করে রাখা অনুচিত বলে মনে হয়। মতভেদ ও সাংগঠনিক দুর্বলতার বর্ণনা দিয়ে সবাইকে সচেতন করে দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে তারা গবেষণা করে বুঝবে ঐরূপ মতভেদের সত্যি কি কোন তত্ত্বগত কারণ ছিল? নাকি তাদের অহংভাব বিভেদের মূলে ছিল? নিজস্ব প্রাধান্যের জন্যই কি ঐরূপ প্রচেষ্টা তারা করত?

যে-কমরেড টাইফয়েডে ভুগছিল সে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল এবং সেল মিটিংয়ে অংশগ্রহণও করেছিল। প্রথম থেকেই সে আমাদের সেণ্ট্রাল ডিসিশন গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সেণ্ট্রাল ডিসিশনের বিরুদ্ধে মত সে প্রচার করতে ব্যস্ত হল। সেণ্ট্রাল কমিটির প্রত্যেকে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউ সমর্থ হয়নি। তাকে আমাদের সেণ্ট্রাল এগজিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলতে ডেকে আনা হয়েছিল। সেখানে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়। সে প্রথম থেকেই খুব চটেছিল এবং আমাদের কোন কথাই তার ভাল লাগছিল না। সে তার বিরুদ্ধ মত খুব জোরের সঙ্গেই ব্যক্ত করছিল। আমি ছাড়া বাকী চারজন যারা ছিল, তারা প্রত্যেকে আমার সম্বন্ধে বলল—তার সঙ্গে

আর চলা যাবে না তাকে বাদ দিয়েই চলতে হবে। তবু আমি শেষ চেষ্টা করে দেখব বলে মত প্রকাশ করলাম। দিন সাতেক খুব সহানুভূতির সঙ্গে তার কথা শুনলাম এবং আমার কথাগুলোও খুব সহানুভূতি সহকারে তার কাছে রাখলাম। যেসব কথা সে আগে শুনতে চায়নি, ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে, সে কথাই সে আমার কাছ থেকে সব শুনে একমতও হল। তারপর তার সঙ্গে সেণ্ট্রাল কমিটি একটি কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করল।

ট্রেনিং ক্লাশটিই খোলার জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কর্মসূচীর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ট্রেনিং ক্লাশের বিষদ একটি খসড়া অনুমোদিত হয়। দুদিন পরে এই কর্মসূচীর খসড়াটি আমাদের কাছে লিখিত ভাবে উপস্থিত করার জন্য ফিল্ড কম্যাণ্ডারকে ভার দেওয়া হয়েছিল। স্থান, সময় ও দিন ঠিক করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ দিনটিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সবাই ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু যার উপরে ভার ছিল খসড়া কর্মসূচী লিখিত ভাবে উপস্থিত করার সেই ফিল্ড কম্যাণ্ডার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এসে উপস্থিত হল। খুব গম্ভীর। তাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হল। ছ'মাস পরে এত ঝগড়াঝাটি ও মন কষাকষির পর যদিও আমরা একমত হয়েছিলাম, তার পরেও ফিল্ড কম্যাণ্ডার এসে অগ্নি উদ্গীরণ করতে লাগল 'আমরা' এ কি করতে যাচ্ছি? আমি যতই ভাবছি ততই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়েছে, আমি সারারাত কেঁদেছি। একি, আমাদের ক্লাশ করতে হবে? কি ক্লাশ করব? তিনি ক্লাশ নেবেন, আর আমরা সব হাঁ করে বসে থাকব? কি নতুন কথা তিনি বলবেন যে, আমাদের সেখানে বসে বসে শুনতে হবে? এ আমার একেবারে অসহ্য মনে হয়েছে ·।'

তাছাড়া যে কমরেড টাইফয়েডে ভুগে উঠেছে, তার ব্যাক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সে কতগুলো কথা বলেছিল। তক্ষুনি সেই কমরেড রেগে উঠে বলল, 'আমি জানতাম আপনার সঙ্গে আমার এই রকমটি একদিন হবে। তা দেখছি আজই হল। আমরা এখনই নিজ নিজ পথে চলে যেতে পারি। প্যাচ ওয়ার্ক করে দল রেখে কোন কাজ নেই।

এতদিনের পরিশ্রমের পর যদিও সংগঠনটি এক কর্মসূচী নিল, কিন্তু পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, মনে হল এই ক্ষণিক আশাটি বোধ হয় বিলীন হয়ে যাবে। তবুও তাদের বোঝবার জন্য সবাই কিছু কিছু চেষ্টা করল। আমিও যতদূর পারি চেষ্টা করেছিলাম। যার উপরে কোন ভরসাই করতে

পারিনি সেই অসুস্থ কমরেডেরই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখলাম। যে আমার সব কথাই মেনে নিল। তখন আমাদের চোখে ফিল্ড কম্যাণ্ডার ছোট হয়ে গেল। আমার মনে হয় ফিল্ড কম্যাণ্ডার এর জন্য নিজে দায়ী। কোন এক অবসর সময় ফিল্ড কম্যাণ্ডার নিজে বিশ্লেষণ করে বুঝবে এই কথা ঠিক কি না।

আমাদের অর্গানাইজেশনে বাইরের কাঠামো দেখে আপাতদৃষ্টিতে সবারই হয়ত মনে হবে একটি সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। কেবল বহিঃপ্রকাশ দেখে মনে হবে অর্গানাইজেশন খুবই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সেণ্ট্রাল কম্যাণ্ডে মনের দিক থেকে সবাই একমত ছিল না। তারা ছিল খুবই দুর্বল।

কোন অর্গানাইজেশনই সবল হতে পারে না, যদি তার ভিতরের বনিয়াদ শক্ত না হয়। আমাদের অর্গানাইজেশনে সংগঠকরা দুর্বলতামুক্ত ছিল না এবং তাদের বিবাদ ও কলহ দিন দিন বেড়েই গিয়েছিল। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাদের গুপ্ত দল বিবাদে-বিসম্বাদে ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রধানত তিন অংশে তারা বিভক্ত হয়। তারপর প্রত্যেক অংশের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়।

আমরা সংগঠনে বিশৃঙ্খলার পুরো দস্তুর আভাস ও ইঙ্গিত পেলাম! নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য অতি ক্ষুদ্র বিপ্লবী সংগঠনেও যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে ছিল। প্রত্যেকেই যেন নভোমণ্ডলের নীচে একাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের নিখুঁত সমঝদার। নিজেদের ভেতরে তিক্ততা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সেই তিক্ততা রোধ করার ক্ষমতা কারও ছিল না। স্বার্থের প্রশ্ন যখন দেখা দিল, তখন বিপ্লবের আদর্শ তাকে ধরে রাখতে পারল না। বিপ্লব ভেসে যাক, তবু নিজ স্বার্থই তার কাছে প্রধান।

মন কিভাবে বিষিয়ে যায় এবং সেই রকম ব্যাধিগ্রস্ত মনের উপর পুলিশের প্রভাব কিভাবে পড়ে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজসাক্ষীর কথা একটু বলি। ৫৬নং রাজসাক্ষী তার দরখাস্তে লিখেছিল—আমি ১৯৬৭ সালে যখন ভাড়া বাড়িতে থাকতাম তখন আমি মোটর পার্টসের ব্যবসা করতাম। আমি হারুকে ওরফে হারাধন দাসকে চিনতাম। সে আমাদের পাড়ায় থাকত। সে আমাদের বলত ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব হতে হবে। এই নিয়ে সে আমাকে কদিন সশস্ত্র বিপ্লব কেমন করে ঘটাতে হবে বুঝিয়েছিল। সে আরও বলেছিল ইণ্ডিয়ার রেভলিউশনার কম্যুনিষ্ট কাউন্সিলের সে ধরনের একটি কর্মসূচী আছে। এই বলে সে আমার কাছে জানতে চায় যদি সেরকম কোন দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ তার আসে তবে সে যোগ দেবে কিনা এবং আরও বলেছিল, যদি আমি

সেরকম ইচ্ছা প্রকাশ করি, তবে সে দলের বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। আমি হারুকে তক্ষুনি বললাম, আমি এইরকম বিপ্লবী দলে নিশ্চয় যোগ দিতে চাই।

আমার কথা শোনার পর হারু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে আর দেরী করব না তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু তোমার একটা কাজ করতে হবে,—যে দিনটির কথা বলছি, সেদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় তোমার চৌরঙ্গি হোটেলে যেতে হবে। যিনি ঐ দলের নেতা তিনি সেদিন ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। হারু আমাকে অ্যাট্রাকটিভ শার্ট পরে যেতে বলল, আর বলল যে লিডার আসবে তার শার্টের বুক পকেটে থাকবে গোল্ড ক্যাপের পেন। এটাই হবে তাঁকে চিনে নেওয়ার চিহ্ন। আমি যেন তার কাছে গিয়ে একটি দেশলাই চাই।

এই কথা মত ১৯৬৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে কোন একদিন সেই হোটেলে যাই। সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট, একজন এলেন। তার বুক পকেটে দেখলাম গোল্ড ক্যাপের পেন রয়েছে। বুঝলাম তিনিই হবেন দলের নেতা। আমি তার কাছে গিয়ে দেশলাই চাইলাম। তিনি আমাকে বুঝে নিয়ে দেশলাই দিলেন এবং বললেন চলুন আমরা ভিতরে গিয়ে বসি।

ভিতরে একটি কেবিনে আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। বসার পর আমি আমার নাম তাকে বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমাদের প্রত্যেকেরই একটি করে ছদ্মনাম আছে, তোমাকেও একটা ছদ্মনাম নিতে হবে। অর্গানাইজেশনে তুমি সেই নামেই সবার কাছে পরিচিত হবে। সবাই জানে আমার নাম সুব্রত রায়। তোমার নাম হবে ইন্দ্রজিৎ কাপুর। তারপর তিনি আমার সঙ্গে সাধারণ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং বিশদভাবে বললেন। রুশ ও চীন দেশের বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি বললেন, ভারতবর্ষে আমাদের সেইরূপ বিপ্লবই করতে হবে এবং তা করতে হলে চাই মানুষ, অর্থ এবং অস্ত্র। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছিলেন পার্টিতে তোমার বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে হলে প্রথমেই তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে অর্থ ও অলংকারাদি এনে দিতে হবে, তা তুমি কি পারবে?

আমি শুনে জবাব দিয়েছিলাম, বে-আইনীভাবে আপনার কথামত আমার কলকাতার বাড়ি থেকে যৎসামান্য টাকা ও গহনা হয়ত আমি আনতে পারতাম, কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমার মনে হয় না। তার থেকে অনেক সহজ

উপায়ে দেশের বাড়ি পাঞ্জাব থেকে আমি তা আনতে পারি। এবং তা নিয়ে গোলমালও তেমন হবে না। কাজেই আমাকে দেশের বাড়িতে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক যাতে আমি বেশ কিছু টাকা ও গহনা আনতে পারি। দেখলাম সেই নেতার মুখ হাসিতে ভরে গেল। তিনি তাতে মত দিলেন। আমরা এবার সেখান থেকে উঠে পড়লাম।

১৯৬৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে কিছু টাকা যোগাড় করে পাঞ্জাবে গেলাম। বাড়ি থেকে বেশী কিছু নিতে পারলাম না, নগদে মাত্র ৮০০ টাকা নিলাম। আমি হারুর মারফৎ সুব্রতদার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ করলাম সুব্রত রায়ের সঙ্গে সিমলা হোটেলে দেখা করব। সিমলা হোটেল আমাদেরই লোকালিটিতে ছিল, আমার কথা অনুযায়ী সেই টাকা সুব্রতবাবুকে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন আমি যেন সেইদিন সন্ধ্যায় কালীঘাট পার্কে তার সঙ্গে দেখা করি। আমি সেই সন্ধ্যায় কালীঘাট পার্কে সুব্রতবাবু ও অন্য আর এক জনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সেখানে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল—দিলীপ, পরেশ, সুকান্ত, অরবিন্দ ও হারু। সুব্রত রায় বললেন, তোমাদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি হল আর এই গ্রুপের চার্জে থাকবে দিলীপ। এই গ্রুপ আর. সি. সি. আই-এর নিদেশ মেনে চলবে। এই কথা বলে সুব্রতবাবু চলে গেলেন। আমরা পরে কোন একটি মিটিংয়ের দিন ঠিক করে বাড়ি গেলাম।

আমার যতদূর জানা আছে অন্যান্য সদস্যরাও নিজেদের বাড়ি থেকে টাকা ও গহনা এনে দিয়েছিল। আমি এই গ্রুপের কারো কারো সঙ্গে তাদের বাড়ি যাই এবং তারা যা টাকা ও গহনা এনে দিয়েছিল তা আমি গ্রুপ কম্যাণ্ডারকে পৌঁছে দিই। সেই সব টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছিল। কিছু অলংকারাদি বিক্রয় করা হয়েছিল এবং বাদ বাকী গহনা মজুত রাখা হয়েছিল পরবর্তিকালে সুবিধামত বিক্রয় করার জন্য। আমি নিজের কাছে কোনা গহনা বা টাকা কড়ি রাখিনি। আমাদের গ্রুপ-ইন-চারজ দিলীপের কাছে শুনেছিলাম— ১৯৬৭ সালে আমাদের পার্টির ন্যূনতম খরচ সভ্যদের দেওয়া গহনা ও টাকায় কোনমতে মিটেছিল।

১৯৬৮ সালের শুরুতে সুব্রত রায় আমাদের ডেকে বলেছিলেন আমাদের কাণ্ড বাড়াবার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম নিতে হবে। যারা প্ল্যানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে তারা ছাড়া আর কেউ সেই প্ল্যানের কথা জানবে না। সেণ্ট্রাল কমিটি ঠিক করবে কারা প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য অংশ গ্রহণ করবে। সেই

সময় যে সেন্ট্রাল কমিটি ছিল তার মেম্বার হলেন অনন্ত সিং ওরফে ওল্ড গার্ড ওরফে অবিনাশ। অন্যান্য মেম্বার যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুব্রত রায়, দীপু, বেচু, সরকারদা, শ্যামলদা, পরেশ।

১৯৬৭ সালে লেক প্যালেসে আমি ইন্দ্রজিৎ কাপুর নাম নিয়ে একটি ঘর মাসিক ১০০ টাকায় লীজ নিলাম। বাড়িওয়ালার কাছে নিজেকে একজন ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম কাজের জন্য আমাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হতে পারে। এখন আমি সেই বাড়ির নম্বর মনে করতে পারছি না। প্রথমে ঠিক হয়েছিল পরেশ ওখানে থাকবে। পরে ঠিক করেছিল সেই বাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী হবে। তারপর আমরা নিজেরা ঠিক করেছিলাম পরেশের সঙ্গে হারু ওরফে প্রশান্তও সেখানে থাকবে।

এই বাড়িটি পার্টির কাজে ব্যবহার করতে দিয়ে আমি নিজে আমার ভবানীপুরের বাড়িতে থাকতাম। পার্টির কাজে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকায় আমি নিজের মোটর পার্টসের ব্যবসা করতে পারতাম না। পার্টিতে সদস্যদের ১০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হোত। আমি ১০০ টাকা পেতাম। ধীরে ধীরে আমি পার্টি থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। পরে আমার সঙ্গে পার্টির খুব সামান্যই যোগাযোগ ছিল বলা চলে। ১৯৭৮ সালে সকাল প্রায় সাড়ে নটার সময় হারু আর মানিককে দেখলাম ট্যাক্সি করে হারু বাড়ির সামনে থামল। হারু ট্যাক্সি থেকে নেমে তার বাড়িতে ঢুকলো। প্রায় দশ-পনর মিনিট পরে হারু একটি সুটকেশ হাতে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো। সেই সময় আমাকে দেখতে পেয়ে হারু বলল হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে তা আমি জিজ্ঞেস করিনি। বুঝে নিয়েছিলাম ডাকাতি একটি হয়েছে। কারণ বহুদিন ধরেই শুনছিলাম ফাণ্ডে টাকা নেই, ডাকাতি হবে। কিন্তু ডাকাতি না হওয়ার জন্য আমি একটু ভগ্নোৎসাহী হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। তাই হয়ত হারু আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলে গেল—হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের একটি গ্রুপ মিটিং ছিল। বহুদিনই আমি গ্রুপ মিটিংয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিছু একটা হবে কিছু একটা করব—এইসব কথা রোজ রোজ আর কত শোনা যায়—তাই আমি আর মিটিংয়ে যেতাম না। হয়ে গেছে শুনে উৎসাহিত হয়েছিলাম, দু-এক ঘন্টার ভিতর সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল লোমহর্ষক এক দুঃসাহসিক ডাকাতির কথা। সন্ধ্যায় গ্রুপ মিটিংয়ে গেলাম। সেখানে দিলীপ, পার্ক স্ট্রীট পোস্টাল ভ্যানের ডাকাতির

বিস্তারিত বর্ণনা দিল আর বলল এই ডাকাতি আমাদের পার্টির ছেলেরাই করেছে। আমরা সবাই উৎসাহিত হলাম এবং মিটিং শেষে বাড়ি ফিরে এলাম।

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আমাদের গ্রুপ-ইন-চারজ আমাকে বললেন, তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশ হারুর বাড়ি সার্চ করতে পারে, আর যেহেতু তুমি হারুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই তোমাকেও অ্যারেষ্ট করতে পারে। আমি বাড়ি থেকে চলে গেলাম। সেই সময় আমার বিশেষ কাজ ছিল দলের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া করা। বাড়ি পাওয়া কিন্তু সহজ ব্যাপার ছিল না। বাড়িওয়ালারা সহজে যাকে তাকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। তারা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ চায় প্রতি মাসে ভাড়া দেওয়ার সংস্থান আছে কিনা। যদি কোন অফিসে চাকুরে হয় তবে এই প্রশ্নের জবাব সহজে তারা পেতে পারে কিন্তু সেইরূপ বয়স আমাদের কমরেডদের কারো ছিল না। চাকরে না হয়ে আমাদের ব্যবসাদার সেজেই যেতে হত। বাড়িওয়ালা কেমন ব্যবসাদার তা জানবার জন্য চেষ্টা করতেন। কাজেই বাড়ি চাইলাম—বাড়ি দিয়ে দিল—তা নয়। প্রত্যেকটি বাড়ির জন্য চুক্তিনামায় সই করতে হয়েছে। এইসব কাজ করতে প্রচুর সময় যেত। কিন্তু না করে উপায়ও ছিল না। আমরা অনেকগুলো ছোট ও মাঝারি ধরনের বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। আমাদের গ্রুপে আমরা যে রকম কষ্ট করে বাড়ি যোগাড় করেছি তেমনি অন্য গ্রুপের ছেলেরাও দলের জন্য বাড়ি যোগাড় করেছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় কাজের জন্য বড় বাড়ি নিশ্চয় জোগাড় করা হয়েছিল তবে তা দলের নেতারাই জানতেন।

ভেবে দেখুন যদি দলের জন্য পঞ্চাশটি বাড়ি ভাড়া করা হয় এবং যদি বাড়ি ভাড়া গড়ে মাসিক ২০০ টাকা হয়, তবে প্রতি মাসে নীট ১০,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়ায় চলে যায়। আর এইসব বাড়িতে ভাড়া করা ফার্ণিচারের জন্য প্রতি মাসের ব্যয় অন্তত ৫০০০ টাকা। যদি ১০টি মোটর গাড়ি দলে থেকে থাকে, তবে প্রতিটি গাড়ির জন্য খরচ অন্তত, কমপক্ষে মাসে হাজার টাকা। তাহলে ১০টি গাড়ির জন্য মাসে কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে।

আমরা কয়েকটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি দলের জন্য কিনেছিলাম। তার জন্য ব্যয় হয়েছিল অন্তত ষাট-সত্তর হাজার টাকা। একটি নৌকো কেনা হয়েছিল তার জন্য প্রায় এককালীন হাজার দেড়-দুই টাকা ব্যয় করতে হয়। মাঝি রাখতে হয়েছিল। দলে মোটর গাড়ি বসিয়ে রাখা হোত না। সেই মোটর গাড়ি দিয়ে

গাড়ি চালানো শেখানো হোত। কাজেই তিনজন ড্রাইভারকে ভাল বেতন দিয়ে রাখা হয়। এই তিনজন ড্রাইভার মাসিক বেতনের জন্য মাসে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা লাগত।

আমাদের প্রধান খরচ ছিল সভ্যদের জন্য বেতন দেওয়া। কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রভৃতিতে বেতন দেওয়ার প্রচলন আছে। সব সময়ের কর্মী ও পার্ট-টাইম কর্মীকে আমাদের বেতন দিতে হত। এই বেতনের হার নির্ধারণ করেছিলাম তাদের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী। আমাদের কর্মীরা সবাই গৃহছাড়া এবং তারা মৃত্যুপণ করে কাজ করছিল। কাজেই তাদের নৈতিক অধিকার ছিল পরিমাণমত ন্যায্য বেতন নেওয়া। কেউ টাকার অভাবে চাকরি কিংবা টিউশানি করুক, সেটি আমি চাইনি। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা যদি প্রতি মাসে ৪০০-৫০০ টাকা বেতন নিতে পারে তবে আমাদের কমরেডদের তার চেয়ে কম দেওয়া উচিত নয়। তারা ফার্স্ট লাইনে থাকে—যুদ্ধ করবে, প্রাণ দেবে তাই তাদের নৈতিক অধিকার অনেক বেশী। টাকার অভাব থাকলে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে কেউ না কেউ পুলিশ হয়েও যেতে পারে। সেইজন্য এই সব প্রশ্ন মনে রেখে প্রত্যেকের বেতন ঠিক করেছিলাম গড়ে অন্তত তিনশ টাকা। যদি সত্তর জন কমরেডকে মাসে গড়ে তিন'শ টাকা করে দিয়ে থাকি তবে মাসে খরচ দাঁড়ায় ২১০০০ টাকা

এখন মোট খরচ—

বাড়ি ভাড়া	১০,০০০ টাকা
ফার্ণিচার ভাড়া	৫,০০০ ”
গাড়ির খরচ	১০,০০০ ”
ড্রাইভার ও মাঝির বেতন	১,৫০০ ”
কমরেডদের বেতন	২১,০০০ ”
প্রতি মাসে মোট খরচ	৪৭,৫০০ টাকা

এর সাথে এককালীন খরচ—মোটর গাড়ির জন্য ৭০,০০০ টাকা নৌকোর জন্য ২,০০০ টাকা।

স্বীকার করতেই হবে পোস্টাল ভ্যানে ডাকাতির পর ছয়-সাত মাস কেবল তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করলাম, সেই নৈতিক অধিকার আমাদের ছিল না। কোন কাজ না করেই প্রতি মাসে আমাদের ৪৭,৫০০ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল।

যে টাকার হিসাব আমি দিলাম, সেটি আমি কোন খাতা দেখে দিইনি, মনে মনে হিসাব করেই দিয়েছি। কোন খাতে হয়ত বেশী ধরেছি আবার কোন বিষয় হয়ত উল্লেখই করিনি। যেমন নাকি মোটর গাড়ি হায়ার পারচেজে কেনায় প্রতি মাসে কিস্তি সেটার উল্লেখই করিনি। আমি স্থূলভাবে হিসাব করে দেখিয়েছি মাসে কত টাকা খরচ হত।

পোস্টাল ভ্যান ডাকাতির সাত মাস পরে স্বভাবতই অর্গানাইজেশনের উপর চাপ এলো টাকার জন্য। ফাণ্ড শর্ট—টাকা পেতেই হবে। কারণ কোন বাড়ি ওয়ালা বাড়ি ভাড়া বাকি রাখবে না। হায়ার পারচেজের কিস্তির টাকা বাকি রাখা চলে না। আমাদের ওয়েজ কিংবা বেতন নিতেই হবে, তাও বাকি রাখা যায় না—তবে সেখানে আমরা টাকা কম নিতে পারি কিন্তু সেভাবে জোড়াতালি দিয়েই বা কদিন চলবে। এই ভাবে অর্গানাইজেশন চলতে পারে না। আমরা ক্রমশই একেবারে শেষ সীমায় এসে পেঁছালাম। আবার তোড়জোড় করতে হল—ডাকাতি করতে হবে। ভাবা হয়েছিল যদি রেলের ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা একবারের ডাকাতিতেই পেয়ে যাই তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাতির ঝুঁকি নিতে হয় না। সেইজন্য চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার যে সন্ধানটি আমাদের কাছে ছিল সেটিকে বেছে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয় পরিকল্পনা মত আমরা এগিয়ে যেতে চেষ্ট করলাম। চলার পথে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে লাগলাম। আমারই এই সক্রিয় গ্রুপের বাছাই করা কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার ভার ছিল।

এইটি একটি অতি দুঃসাহসিক ডাকাতির প্ল্যান। টাকার ভ্যানের আগে ও পিছে দুটি মোটর ভ্যানে মিলিটারী রাইফেল নিয়ে সি. আর. পি সৈন্য থাকত। এই কনভয়টি অপেক্ষাকৃত খুব নির্জন পথ দিয়েই যেত। আমরা এমন স্থান বেছে নিয়েছিলাম যেখানে সামনের ও পিছনের মিলিটারী ভ্যান দুটিকে খুব চতুরতার সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে পারি। দুটো ভ্যান আলাদা করার পর আমাদের সুরক্ষিত আর্মাড কার ভ্যানটিকে সামনে থেকে আটক করত এবং আমাদের এই আর্মাড কার থেকে লাউড স্পীকারে আদেশ করা হত—'গাড়ি থামাও। যারা আছ তারা বন্দুক গাড়ির ভিতর ফেলে রেখে হাত মাথার উপরে তুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। যদি একটু বিলম্ব কর তবে আমরা স্প্রে করে সালফিউরিক অ্যাসিড ছড়াব।

ঐদিকে যে ভ্যানকে আলাদা করার কথা তাদেরও নিরস্ত্র করার জন্য লাউড-স্পীকারে আদেশ দেওয়া হোত—অস্ত্র ফেলে সবাই এক্ষুনি বেরিয়ে যাও, নইলে

বিপদ আছে। ভ্যান আমরা উড়িয়ে দেব।' দুটি ল্যাণ্ড টর্পেডোর ব্যবস্থা আমরা রাখতাম। বেগতিক বুঝলে সেগুলো ভ্যানের নীচে গিয়ে ফেটে সি. আর. পি -র ভ্যান ধ্বংস করত। এইসব কিছুরই প্রয়োজন হোত না, যদি আমরা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে আমদের আদেশ বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে তাদের শোনাতে পারতাম।

কাজেই এই ডাকাতি করার জন্য আমাদের এক বিরাট প্রস্তুতি, আয়োজন ও ট্রেনিং চলছিল। এক-একটি সমস্যা চোখের সামনে পড়েছে এবং তা সমাধান করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যেমন, লাউড স্পীকার দিয়ে হুকুম দিতে হবে—সেই জন্য লাউডস্পীকার কেনা হবে, বসানো হবে এবং ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে। আবার ধরুন ঠিক হল অ্যাসিড স্প্রে করে গাড়ি থেকে সশস্ত্র পুলিশ বা সেপাইদের বার করে দিতে হবে। তার জন্য কোথায় উপযুক্ত স্প্রে পাওয়া যায় খোঁজ নিতে হবে এবং অ্যাসিডের বদলে জল স্প্রে করে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে বাস্তবে তা কতখানি কার্যকরী হচ্ছে। যেসব কমরেডরা এই গ্রুপে ছিল, তাদের ট্রেনিংয়ের মধ্যে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধেও বলা হত। এইসব জিনিসপত্র যোগাড় ও ব্যবহার করার নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হত।

এই প্রস্তুতি পর্ব চলাকালে প্রত্যেক কমরেডের মানসিক প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হত, যখন একটি বাস্তব চিত্র সামনে রেখে বলা হত একটি মোটর গাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য ভর্তি ব্যারাল নিয়ে গাড়ি চালিয়ে সামনাসামনি কোন এক মিলিটারী ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে, গাড়ির চালক নিজে গাড়ির সঙ্গে উড়ে যাবে এবং মিলিটারী ভ্যান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। এ আর তেমন কিছু নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা তাদের বেতনভোগী অল্পবয়সী সৈন্যদের এমনভাবে প্রস্তুত করেছিল, যেন তারা এরোপ্লেনে টর্পেডো নিয়ে যুদ্ধ-জাহাজের উপরে গিয়ে পড়ে। গর্বিত বৃটিশ নৌ-বাহিনী যখন সিঙ্গাপুরে এলো, তখন সেই নৌবহরের সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্-কে' লক্ষ্য করে অল্পবয়সী জাপানী সৈন্যরা এরোপ্লেনের সঙ্গে টর্পেডো বেঁধে যুদ্ধ জাহাজটিকে আক্রমণ করল। একটি টর্পেডো বাঁধা প্লেন নিয়ে একজন জাপানী পাইলট সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনে প্রিন্স অফ ওয়েলসের চোঙার ভেতরে ঢুকে গেল। পরক্ষণেই বিরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে প্রিন্স অব ওয়েলস ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল এবং তার সলিল সমাধি হল।

ইংরেজের সঙ্গে জার্মানী যখন নরওয়ে আক্রমণ করল, তখন নার্ভিক বন্দরে বৃটিশের সর্ববৃহৎ রণতরী 'ডানকাক' উপস্থিত হল। জার্মানীর বোমারু বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণে 'ডানকাক্' রণতরীটিও নরওয়ের উত্তর উপকূলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেল। গবেষণা করে নৌ-যুদ্ধ বিশারদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উপকূলের সংকীর্ণ সাগরের জলে বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ ম্যানুভার করতে পারে না এবং সেই জন্য বোমারু বিমানের প্রাধান্য থাকবেই। কিন্তু এই শিক্ষা বৃটিশ নাবিকরা গ্রহণ না করে তাদের অতি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' জাপানের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে পাঠালো। অতি দর্পে হত-লংকা। বৃটিশের গর্ব প্রিন্স অফ ওয়েলস' জাপানী বিমানবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে জলে ডুবে গেল। অনেকগুলো বিমান একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল, তা নয়। বায়ুসেনার স্যুইসাইড স্কোয়াডের একজন সৈনিক নির্ভিকচিত্তে জাহাজের নল লক্ষ্য করে তার ভিতরে নিজে ঢুকে যায়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বার্থে সে নিজেকে উৎসর্গ করল, কিন্তু তার সাহস ও বিক্রম শিক্ষণীয় বটে। .যা সাম্রাজ্যবাদী বেতনভোগী সৈন্য পারে, তা আমরা বিপ্লবীরা পারব না, হতেই পারে না। এইভাবে আমার বক্তব্য ট্রেনিংয়ের সময় অন্যান্য কমরেডদের কাছে রাখতাম।

১৯

এ কেবল আমার ফাঁকা বক্তব্যই নয়, মনেপ্রাণে অনুভূতি দিয়ে বুঝতাম। অনুভূতি দিয়েই আমি তা প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করে বলতাম। আমার ধারণা আমার প্রকাশভঙ্গী দেখে তারা নিশ্চয়ই বুঝত যে আমাদের প্রাণ হাতে নিয়ে ঐরকম দুঃসাহসিক ডাকাতি দুটি মিলিটারী ভ্যানের মাঝে করতে হবে যেন কোন লোক মারা না যায়। আমাদের প্রত্যেকটি ডাকাতি:ত প্ল্যান করতে একটি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল, যেন কাউকে মার্ডার করতে না হয়। তার জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যান করতে অনেক দেরী হয় এবং খরচও লাগে। যদি সোজা হিসাব করতাম অতর্কিতে আক্রমণ করব এবং ল্যাণ্ডমাইন, ডিনামাইট ও হাতবোমা ব্যবহার করে সব নিশ্চিহ্ন করে দেব, তবে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও মেহনত অনেক কম হত।

যখন রেলের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ডাকাতি করার প্ল্যান হচ্ছিল, তখন সবাই ভাবল এ এক সংঘাতিক প্ল্যান। এটি কার্যকরী করতে হলে দু'দিকে সৈন্যদের রাইফেলের সম্মুখীন হতেই হবে। যদিও অতর্কিতেই আক্রমণ করার কথা বলা হচ্ছিল, তবু ফিল্ডে যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের অতগুলো রাইফেলের বেষ্টনীর ভিতরে থাকতেই হচ্ছে। কাজেই সেই সময় কেউ গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে কিনা কেউ তা বলতে পারে না। সবারই মনে গভীর আতঙ্ক ছিল বোধ হয় রাইফেলের গুলিতে প্রাণ যাবে। কাজেই ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ডাকাতি করার জন্য আমরা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হতে পারব না। তাই এই প্ল্যান আমরা পরিহার করলাম। বিকল্প ব্যবস্থার জন্য ছোট-খাট ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে সব ছেলেই ভীতু ছিল তা নয়, অসীম সাহসী ও দুর্ধর্ষ ছেলে কম ছিল না। তাদের বলে আমরা বলীয়ান ছিলাম। তাদের শক্তিতে সংগঠন শক্তিশালী ছিল। তাদের সাহস, বিক্রম শক্তি সংগঠনের মেরুদণ্ড ছিল। সেই শক্তির উপরে নির্ভর করেই সংগঠন ছোট ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে প্রস্তুত হচ্ছিল।

ন্যাশানাল গ্রাণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চ, অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে অবস্থিত। আমাদের হাতে তখন এমন সময় ছিল না, যাতে অনেক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে খোঁজখবর করে তারপর ঠিক করতে পারি কোনটাতে ডাকাতি করে সবচেয়ে বেশী টাকা পাব। এইসব ব্যাঙ্কেও অন্তত দেড় লাখ-দুই লাখ টাকা পাওয়া যেতে পারে। বেশী তথ্য সংগ্রহ করিনি। তেমন সময়ও ছিল না, আর ব্যাঙ্কের পজিশনটা হচ্ছে এই রকম—ব্যাঙ্কের ভিতরে আমাদের কোন লোকও ছিল না।

ব্যাঙ্কের বাইরে থেকে লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম লাখ দেড় টাকা থাকবেই। ব্যাঙ্কের পঁচিশ তিরিশ গজ দূরে নলিনীরঞ্জন এভিন্যুয়ের উপর একটি পেট্রোল-পাম্প ছিল। পেট্রোল-পাম্প থেকে বেহালার রাস্তার ট্রামলাইন অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে। এই রাস্তা ও পেট্রোল-পাম্পে পুলিশের গাড়ি ও ভ্যান প্রায়ই দেখা যেত। নিউ-আলিপুর থানা থেকে এই ব্যাঙ্ক খুব দূরে নয়।

ব্যাঙ্কের সদর দরজা সাটার দিয়ে বন্ধ থাকত। ঠিক দশটার সময় ব্যাঙ্কের দারোয়ান চাবি দিয়ে সাটারটি খুলে তারপর কাঠের দরজা খুলে দিত। ব্যাঙ্কের কাস্টমাররা আগে থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভেতরে ঢুকতেন। ব্যাঙ্কের সব কাউণ্টারগুলো এক সাইডে ছিল। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে ঢুকে সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গেলে সব কাউণ্টারগুলো ডানদিকে পড়ত। ম্যানেজারবাবুর ঘর আলাদা দূরে।

ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের একজন পুরনো কর্মচারী একটি টাকার বাক্স নিয়ে এসে কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টের কাউণ্টারে দিয়ে যেত। কাউণ্টারের সামনে মানুষের গলা পর্যন্ত কাঠ দিয়ে ঘেরা ছিল। সব কাউণ্টারেই টেবিলের মত তক্তা দেওয়া ছিল, যাতে লেন-দেন হতে পারে। তার উপরে নীচু রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল।

আমাদের এমন ব্যবস্থা ছিল যেন টাকার বাক্সটি নিয়ে আসার পরে টাকার বাক্স থেকে টাকা বার করে বিভিন্ন কাউণ্টারে দেওয়ার আগেই সেখান থেকে টাকা ভর্তি বাক্সটি তুলে নিতে পারি। সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে এই বিপ্লবী ডাকাত দল তাদের শক্তি সমাবেশ করে।

গেটে একজন থাকবে স্টেনগান নিয়ে সামনের ভীড় রুখবার জন্য এবং সে সেখান থেকে ব্যাঙ্কের ভেতরটা লক্ষ্য রাখবে যেন কেউ হঠাৎ কোন কিছু দিয়ে আক্রমণ করতে না পারে। কাউণ্টারে যাবে তিনজন। একজন ক্যাশিয়ার

এবং অন্যান্যদের পিস্তল দেখিয়ে সাবধান করবে যেন কেউ বাধা না দেয়। আর একজন লাফিয়ে কাউণ্টারের ভিতর ঢুকে টাকার বাক্সটি তুলে কাউণ্টারের রেলিংয়ের উপর দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির হাতে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়বে। এবার তিনজন একত্র হয়ে সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে বাইরে আসবে। সেই প্যাসেজে সোফায় কাস্টমাররা বসে থাকে। খুব সম্ভাবনা ছিল তাদের বেরিয়ে যাওয়ার সময় কাস্টমারদের মধ্যে কেউ তাদের ঝাপটে ধরলেও ধরতে পারে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তারা সেখানে যায়।

স্টেনগান নিয়ে যে গেটে ছিল সে প্রথমেই বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারও করে। সে চেঁচিয়ে বলেছিল 'ভয় নেই চেঁচাবেন না। চুপ করে বসে থাকুন। নড়লেই গুলি করবো।'

তার কম্যাণ্ড শুনে ব্যাঙ্কের কর্মচাবী ব্যাঙ্কেব ভিতরে খুব ঠাণ্ডা হয়ে বসেছিল। কিন্তু বাইরের কাস্টমাররা ঐ সংকীর্ণ প্যাসেজে সোফায় বসেছিলেন তারা কিন্তু খুবই বিচলিত হয়ে প্রাণভয়ে পালাতে চেষ্টা কবলো। আমাদের ফ্রন্ট গার্ডের ওদের ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু ভুল করে সে তাদেরও আটক করতে চেষ্টা করে। তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রাণভয়ে যারা পালাচ্ছিল তারা পালালোই। ইতিমধ্যে মিনিট দু-তিনেকের মধ্যে আমাদের ডাকাতি শেষ হল এবং ঐ তিনজন একত্রিত হয়ে টাকার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এলো। গেটে যে ছিল সেও তাদেব সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। এই গাড়ি চার-পাচ মিনিট আগে ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ব্যাঙ্কের ভিতরে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার ও চেঁচামেচির শব্দ শুনে বাইরের লোক আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। আর কোন কোন কাস্টমার পেট্রোল-পাম্পে এসে বলাও করে বলছিল, ব্যাঙ্কে ডাকাতি হচ্ছে'।

পেট্রোল-পাম্পে কয়েকজন লোক হাতে ইঁট-পাথর নিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে ছুটে গেল। গাড়িটিকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা ধরে নিয়েছিল ঐ গাড়িটি ডাকাত দলের। তাদের ভিতরে কেউ ড্রাইভার ও গাড়িকে লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ে।

এদিকে সবাই এসে গাড়িতে ওঠার পরে গাড়ি ছেড়ে দিল। একজন মোটর সাইকেল নিয়ে তাঁদের গাড়ি অনুসরণ করতে লাগলো। তাঁকে নিশ্চেষ্ট করার জন্য একটি ক্র্যাকার নিক্ষেপ করা হল।

কোর্টে সেই মোটর সাইকেল চালক সাক্ষী দেন এবং এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে

বলেন—তাকে যখন নিশ্চেষ্ট করার জন্য ক্র্যাকার ছোঁড়া হল, তখন তিনি দূর থেকে ফলো করছিলেন। কিন্তু দূর থেকে ফলো করে যে তাদের ধরা যাবে না, তা তিনি জানতেন, বিশেষ স্থানে আমাদের অন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তারা সবাই সেই গাড়িতে উঠে অন্যদিকে গেল। আর মাত্র একজন লোক এই গাড়িটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে পথে ফলস্ নাম্বার প্লেট খুলে আবার আসল নাম্বার প্লেটটি লাগিয়ে গাড়িটি যেখানে থাকত, সেই বাড়ির গ্যারেজে নিয়ে গেল।

একটি স্পটে আর্মস নিয়ে আমাদের একজন নেমে পড়লো এবং বিশেষ স্থানে তা নিয়ে গেল। তারপর টাকার বাক্সটি যে বাড়িতে নিয়ে যাবাব কথা সেখানে নিয়ে যাওয়া হোল এবং টাকা গুণে বিভিন্ন প্যাকেটে করে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোল। ডাকাতি হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কাজটি সম্পন্ন হয়।

সেই বাড়িতে টাকা পৌঁছানোর পর যে দু'জনের সেখানে গিয়ে টাকা আলাদা আলাদা করে প্যাকেট করার কথা, তারা নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে গিয়েছিল। তারা টাকা গুণে দেখলো প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা। যতদুর মনে পড়ছে রেডিওতে ঘোষণা করেছিল বিয়াল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। ঘোষণার সংখ্যা ও আমরা গুণে যে সংখ্যা পেয়েছিলাম তাতে বারো থেকে পনের হাজার টাকা কম ছিল, সে ফিগারকে সন্দেহ করার মত কারণ ছিল না। তবে এ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল কি করে?

যার বাড়িতে টাকা তোলা হয়েছিল সেখানে সেই দশ মিনিটে সে এবং তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর দু'জন এলো টাকা গুণতে এবং ভাগ ভাগ করে প্যাকেট করতে। রেডিওর সংবাদ থেকে জানা গেল যে টাকা গোণা হয়েছিল তার থেকে প্রায় পনেরো হাজার টাকা বেশী ডাকাতি হয়েছিল। তবে কে এই টাকা সরালো?

আমাদের এমনিতে ফাণ্ডে টাকা ছিলই না বললে হয়। এই ব্যাঙ্কের ডাকাতিতে দেড় লক্ষ টাকাও আসেনি। কাজেই আমরা খুবই চিন্তিত ও বিব্রত বোধ করছিলাম। আর যখন দেখি সত্যি এমত অবস্থায় আমাদের টাকা উধাও হয়েছে, তখন কে এই কাজ করতে পারে তা আমি অন্তত নির্ণয় করেছিলাম। অন্যরাও মনে মনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেও সাহস করে বলতে পারছিল না। আমি যেহেতু অতীতে তার কতকগুলো চুরির ঘটনা জানতাম, তাই তাকে সন্দেহ করতে আমার একটুও বাধে নি। আমি তখন খুব জোরের সঙ্গে অন্যান্য

কমরেডদের বলেছিলাম, আমাদের দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। তাঁর স্ত্রী ও তিনটি সন্তানের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে শাণিত ছুরি বুকে বসিয়ে দেওয়া হোক।'

আমাদের ফিল্ড কম্যাণ্ডার আমাকে প্রটেস্ট করে বলেছিল, 'এই লঘু কাজে তাকে এত গুরু দণ্ড দেওয়া উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে তাকে বিতাড়িত করা হোক।'

ফিল্ড কম্যাণ্ডারের মত আরও দু'তিন জন সমর্থন করলো। আমি তখন বললাম, 'বেশ তো, আপনারা যখন মৃত্যুদণ্ড দিতে চান না, তখন দেখেন না। কিন্তু আমার মতে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। তার স্ত্রীর কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হোক। এবং তার স্ত্রীকে তাব টাকা অপসারণ কবাব আগের নজিরগুলো পরিষ্কাব করে জানিয়ে বলতে হবে, যদি সে এই টাকা ফেরত না দেয়, তবে এই ছুরি দিয়ে তার বুক ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো। কাজেই আপনাকে আমরা পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। তাকে বুঝিয়ে বলুন, টাকা যেন সে এক্ষুনি ফেরত দেয়।'

আমি সত্যিই কী নিষ্ঠুর! আমি কী অতখানি নির্দয় ছিলাম? আমার হৃদয়ে কী বিন্দুমাত্র দয়ামায়া ছিল না? আজকে মনে হয় কি করে আমি ভাবতে পেরেছিলাম টাকা অপহরণের জন্য কমবেডটিকে চরম মৃত্যুদণ্ড দেব। সে নিয়ে আজ আলোচনা করব না। আমার অন্যান্য কমরেডবা বিবেচনার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল, লঘু অপরাধে অর্থাৎ আমাদের কষ্টের ডাকাতির টাকা অপহরণ করার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না, মৃত্যুদণ্ড কি লঘু অপরাধে চরম গুরুদণ্ড হবে না? তারা তাই সাব্যস্ত করেছিল, তাকে মেরে না ফেলে দল থেকে বহিষ্কার করা। তারপর এই লেখার সময় কত বছর পরে যখন আমি এটা বলছিলাম যে তার স্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েদের সামনে তাকে নিয়ে গিয়ে শাণিত ছুরি আর বুকে ঠেকিয়ে রেখে বলতাম, যদি তুমি বাঁচতে চাও তবে এক্ষুণি লুণ্ঠিত টাকার মধ্যে থেকে যে কটি হাজার টাকা অপহরণ করেছ তা ফেরৎ দাও। আর তা না দাও, এই শাণিত ছুরি তোমার বক্ষে বসিয়ে দেব। এই বলে তাকে ভয় দেখিয়ে যে টাকা অপহরণ করেছে সব টাকা ফেরৎ চাইব। যে আমার এটা কপি করছিল সে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল 'আপনি এত নিষ্ঠুর'। এত নির্দয় যে ছেলেমেয়েদের সামনে ওকে এমনি করে মেরে ফেলতেন?' আমার এটুকু শুনলে তাই মনে হবে। কিন্তু এটুকুই শেষ নয়।

ডাকাতির প্রত্যেকটি প্ল্যানে ও ট্রেনিং-এর সময় আমাকে সব সময় প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে যে, যেন একজনও না মরে বা আহত হয়। আমার মনে হত ডাকাতি করতে গিয়ে অন্যকে মেরে ফেলার বা আহত করার অধিকার নেই। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে পারি। এই নীতি অনুসরণ করেছিলাম আমার জীবনের সূচনা থেকেই। তাই রেল কোম্পানীর টাকা যখন লুঠ করি একটি ফায়ার না করেও আমরা টাকা নিয়েছিলাম। আবার যখন টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করে বিধ্বংস করি তখনো একটি ফায়ার না করে করেছিলাম।

সময়, কাল, পাত্র বিবেচনা করে ভেবেছিলাম আমাদের বিপ্লবী ফাণ্ডের টাকা অপহরণ করার দণ্ড মৃত্যুই হওয়া উচিৎ। মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে টাকা ফেরৎ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ভয় দেখাবার জন্য, তার ছেলেমেয়েদের কাছে উপস্থিত করে টাকা ফেরৎ চাওয়া সঠিক হবে বলে মনে করেছিলাম। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে টাকা ফেরৎ দিত আর তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। ভালই হল, শেষ পর্যন্ত তা আমাদের করতে হয়নি। অন্যান্যরা সাব্যস্ত করল ওকে মুক্তি দেওয়া হোক ও দল থেকে বিতাড়িত করা হোক।

এই সামান্য টাকা যা ডাকাতি করে পাওয়া গেল, তা আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের খরচ—এটা আর ক'মাসের? যদি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া, ফার্নিচার ভাড়া, কমরেডদের বেতন দেওয়া না হত তবে হয়তো সেই টাকায় কয়েক মাস চলা সম্ভব ছিল। কেবল কমরেডদের বেতনের খাতে টাকা কমানো যায়, টাকা কমানোই হয়েছিল, তার জন্যে আর কয়েক মাস হয়তো বেশি টানতে পারা গেল। কিন্তু সংগঠনে বিপুল ভাবে টাকার চাপ অনুভব করতে লাগলাম। যে ধরনের টেকনিক্যাল সংগঠন তাতে বেতন কমানো সমীচীন হয়নি। কিন্তু আমাদের যে প্রোগ্রামে ট্রেনিং স্কুল সংগঠন বাড়াবার কল্পনা ছিল তার জন্যে টাকা কই? সেই টাকা এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকায় মেটবার কথা নয়। অগত্যা পার্টিকে বাধ্য হয়ে তাকে তার প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা, প্রিন্টিং প্রেসের বন্দোবস্ত করা, আমাদের তৈরী কয়েকটি লোহার বর্ম লাগান গাড়ি ও সংগঠনের প্রত্যেকটি সদস্যকে মোটর চালাবার শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই টাকার প্রয়োজন সেইজন্য। অন্য আরেকটি বড় ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সেইজন্য চাই প্রাথমিক টাকা, সেইরূপ বলিষ্ঠ বিচক্ষণ ও সাহসী কর্মী ও আনুষঙ্গিক ব্যবহার্যের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, ও বর্ম লাগানো মোটর গাড়ি। এক-এক দিন দেরী

হওয়ার অর্থ সংগঠনের অনেক হাজার টাকা বিনা কাজে বেহাত হওয়া। এই ধারণাটি অন্তরে পোষণ করে প্রত্যেকটি কমরেডের কাজ করা প্রয়োজন ছিল।

যাদের উপর পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কী করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আনা যায়। তেমন ডাকাতির প্ল্যান কোথায় স্থির করতে হবে এবং কারাই বা সেরূপ ডাকাতি করতে উপযুক্ত ?

তারা বহু আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল দুর্গাপুরে স্টীল প্ল্যাণ্টে ও কারখানায় অনেক টাকা প্রতিমাসে পেমেণ্ট হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ দুর্গাপুরে আছে—সেই ব্রাঞ্চে প্রায় দেড় কোটি দু' কোটি টাকা থাকে। আমাদের প্রয়োজন সেই ব্যাঙ্কের লোকেশন সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করা। আর সেই প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের যা অস্ত্র আছে ও প্রথম সারির সভ্যরা আছে, তাদের দিয়ে ঐ দুর্গাপুরের ব্যাঙ্কটি লুঠ করতে হবে। আমাদের হাতে যে টাকা আমরা ডাকাতির পর পেলাম, টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার আগে যদি দুর্গাপুরে ব্যাঙ্কের ডাকাতি করার প্ল্যানটি সমাপ্ত করতে হয় তবে দু' মাসের ভিতরেই তা শেষ করতে হবে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক ঘুরে দেখা আমাদের সময় ছিল না। দুর্গাপুরে ব্যাঙ্কটির সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়েছিল তা থেকে আমরা সুনিশ্চিত বুঝেছিলাম এক কোটি টাকা সেখানে পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের ভল্টে সেই টাকা থাকে। প্রাথমিক এই সংবাদের ভিত্তিতে আমাদের আয়োজন শুরু হল দুর্গাপুর আমাদের সংগঠনের একটি কলোনীতে পরিণত হল। আমাদের পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলে সেখানে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন সময়ে গিয়েছিল। এবং প্রায় বিশজন বিভিন্ন বাড়িতে থাকত। যেখানে ব্যাঙ্কটি ছিল সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে আসানসোল যাওয়ার ট্র্যাংক রাস্তা পড়ে। এই ব্যাঙ্কের পেছন থেকে পঁচিশ গজের ভেতরে ট্রেজারি। ট্রেজারিতে সব সময় প্রায় বারজন সেপাই রাইফেল নিয়ে থাকে। আর একটু দূরে বেঙ্গল ভলেণ্টিয়ার্সের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন থাকত। সি. আর পি. সৈন্যও তাদের পাশাপাশি থাকত। দুর্গাপুর ব্যাঙ্কটিতে ব্যাঙ্কের দারোয়ান পাহারা দিত। ব্যাঙ্কের দারোয়ান ও ব্যাঙ্কটি কোনো সমসা ছিল না, কিন্তু সমস্যা ছিল সি. আর. পি., বেঙ্গল ভলেণ্টিয়ার্স এবং ট্রেজার রাইফেল গার্ড।

দুর্গাপুর অপরিচিত জায়গা নয়। কিন্তু এক কোটি টাকা ব্যাঙ্ক লুঠ করে নিয়ে আসা সোজা কথা নয়। কাজেই সাধারণভাবে যদি এই অবস্থান সম্বন্ধে মাত্র সাধারণ জ্ঞান থাকে তবে সেই জ্ঞান নিয়ে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

ঘটান সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কে ও ব্যাঙ্কের লোকালিটি ও দুর্গাপুরের দিক থেকে আমাদের কলকাতা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তার টপোগ্রাফী আমাদের জানা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তার জন্য ট্রাংক রোডটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাদি আমাদের নখদর্পণে রাখার প্রয়োজন ছিল। একবার বেড়াতে গেলাম আর ট্রাংক রোডের বৈশিষ্ট্য বুঝে ফেললাম তা নয়। রাস্তায় কি কি বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ করে পুলিশ পোস্টিং কোথায় আছে তা আমাদের দেখা দরকার ছিল। ডাকাতির পরে এক কোটি টাকা কোন পথে এবং কিভাবে আমাদের কলকাতার হেড কোয়ার্টারে আনা যায় সেই প্ল্যানটিও বিশদভাবে করার দায়িত্ব ছিল। ডাকাতি হল আর টাকা আনার ব্যবস্থা হল না। তাহলে কোন প্ল্যানই হল না। এক কোটি টাকা ব্যাংকের ঘর থেকে বার করতে হবে তারপর পুলিশ ও মিলিটারী বেষ্টনী ভেঙ্গে রেলপথে মোটর রাস্তায় নিয়ে আসা চাই। কাজেই আক্রমণ করাটাই সব নয়, আক্রমণ করে টাকা নিরাপদে নিয়ে আসাটাও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই সবটাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সময়সাপেক্ষ ও অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। সেই জন্য বেছে বেছে ছেলেদের সেখানে পাঠান হল। এবং তাদের পরিচালনা করার জন্য রুট কম্যাণ্ডার ও ফিল্ড কম্যাণ্ডারকে পাঠান হয়েছিল।

ব্যাঙ্কটিকে কখন, কোন্ সময় আক্রমণ করলে অল্প পরিশ্রমে কাজ সাফাই হতে পারে সেই সময়টুকু নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ব্যাঙ্কে কোন সময় এক কোটি টাকা উঠতে থাকবে সেটি জানা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। আর সেই সময় বা কোন একটি বিশেষ দিনে হানা দিলে সহজে এই এক কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। এই একটি ব্যাপারই করতে গিয়ে ব্যাঙ্কে আমাদের কয়েকটি ছোট ছোট সেভিংস অ্যাকাউন্টস খুলতে হয়। এই অ্যাকাউন্টস্ অপারেট করার উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্কে যাই কেবল দেখতে কোন কাউন্টার থেকে টাকা দিচ্ছে ও কোন্ কাউন্টারে টাকা জমা হচ্ছে। টাকার ভল্টটি কোথায় এবং সেই ভল্টের চাবি কার কাছে থাকে এবং কে তা খোলেন, কিভাবে তা খোলেন। মাত্র এইটুকু কাজই ভেবে দেখুন সমাপ্ত করা কত কষ্টসাধ্য। ভল্টটি ফার্স্ট আওয়ারে ভেঙ্গে যায় ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারের সঙ্গে চাবি থাকত কারণ তারা দু'জনে একত্রে হয়ে চাবি ঘোরালে তবেই ভল্টটি খোলা যেত। ভল্টের মস্ত বড় দরজা ও দরজায় একটা চাকার মত ছিল। কিন্তু সেই চাকা কেউ ঘোরাতে পারত না যদি না কেউ চাবি দিয়ে আগে খোলে। ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার একসঙ্গে এসে ভিন্ন ভিন্ন চাবি দিয়ে

আগে চাবির কল খুলতেন। তারপর বার ইঞ্চি চাকা যা দরজার বাইরে থাকে সেটি ঘুরিয়ে দরজা খোলা হত। ক্যাশিয়ারবাবু ব্যাঙ্কের ভল্টের যেতেন। তিনি যে সব টাকার বাক্স বার করে দিতেন ব্যাঙ্কের বিশ্বাসী কর্মচারীরা তা বার করে নিয়ে আসত। তারপর প্রয়োজন অনুসারে যে কাউণ্টারে যত টাকা ফেলা দরকার তা দিত। এই একটি ব্যাপার বোঝবার জন্য লিখলাম যে কতখানি শক্ত কাজ ছিল তা করা। একদিনে তা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দিনে আমাদের বিভিন্ন কমরেডদের এই সমস্ত ব্যাপার দেখে আসতে হয়। বিভিন্ন কমরেডদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে ব্যাঙ্কের ভল্ট খোলা সম্বন্ধে ধারণাটি পাকা করি। সেই ধারণা তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা আরো বিস্তারিত পরিকল্পনা করি।

যেরূপে বিস্তারিত প্রসেসে আমাদের কাজ চলেছিল তাতে প্ল্যান শেষ করা কয়েকটা দিন বা সপ্তাহের কাজ নয়। কয়েকটি মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কে যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে কী আমরা কয়েক মাস ধরে প্ল্যান করতে পারতাম ? তাছাড়া এক কোটি টাকা সরিয়ে দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করব কোন্ পথে এবং কিভাবে সে নিয়েও বিস্তারিত পরিকল্পনা আমাদের করতে হয়। যেমন নাকি অয়েল ট্যাংকার বা কোল ট্যাংকারে পুরে ট্রাংক রোডের উপর দিয়ে দ্রুত নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছিলাম কেবল ট্রাংকারগুলি হলেই হত না, আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার জন্যে অন্যান্য মোটরগাড়ি রাখতে হত। এই সবের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। তারপর দুর্গাপুরে বাড়িভাড়া, কমরেডদের থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্রচুর খরচ মেটানো গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের টাকায় কুলানো যাচ্ছিল না। এর উপরে সমগ্র সংগঠনের খরচ প্রতিমাসে যা দেওয়া হয় তার চাপ অনুভব করতে লাগলাম। দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক লুঠের পরিকল্পনা আমরা যদি দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে পারতাম তবে হয়তো কোন মতে পারা যেত। কিন্তু তা হওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই সংগঠনের মধ্যে আবার গোলমাল শুরু হল। অনেকেই এই রূপ ডাকাতির প্ল্যানে মত দিতে পারছিল না। আমাদের কোন বিশেষ কমরেড দুর্গাপুরে ব্যাঙ্কের কাছে ক্যান্টিন খোলে। ব্যাঙ্ক সেই ক্যান্টিন থেকে দুপুরের ও বিকেলের জল খাবার সাপ্লাই করা হত। এই যে ক্যান্টিন খোলা এবং সেখানে পরিচিতি লাভ করা তাও সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনে তাও আমরা করেছিলাম। কলকাতা থেকে অতদূরে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ

ছোট একটা ক্যান্টিন খুলে বসে থাকা সেই কমরেডের বিশেষ মানুষিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করছিল এবং তারপর সেই ক্যান্টিনের খাবার জিনিস কোর্ট ও ব্যাঙ্কে সাপ্লাই করত। এইরূপভাবে ধাপে ধাপে আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল দু'মাস কেন আরো দু'মাসের মধ্যে প্ল্যানটি সম্পূর্ণভাবে শেষ করা অসম্ভব ছিল। যেমন নেতৃস্থানীয় নেতারা এই বিরাট আয়োজনে বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারছিল তখন সাধারণ সদস্যরাও বেশ উপলব্ধি করেছিল যে এই পরিকল্পনা শেষ করতে আরো বহুদিন লাগবে। কাজেই তাদের মনে তখন প্রশ্ন জাগতে লাগল এবং অনেক কাজেই শিথিলতা দেখা দিল যখন পুরো উদ্যমে ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করা প্রয়োজন ছিল তখন এই বাস্তব দুর্বলতা আমাদের সবাইকে কম বেশী বিচলিত করেছিল।

একদিকে দেরী হওয়া অন্যদিকে কাজে অস্বাভাবিক চাপ ও সমস্যা যখন দেখা দিল তখন সংগঠনে বিশৃংখলা দেখা দেবে তাতে আশ্চর্য কি? স্লোগান-ভিত্তিক গ্রাম থেকে শহর সব ঘেরাও করা যুক্তি নিয়ে সংগঠনের মধ্যে একদল সোচ্চার হয়ে উঠল। তাদের কাছে লেনিনের "হোয়াট ইজ টু বী ডান' পুস্তকের সমালোচনা হতে লাগল। সেইসব কর্মীরা 'হোয়াট ইস টু বী ডানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান কালে আর নেই বলে ঘোষণা করল। কাজেই সংগঠনের মধ্যে দুটি মত দেখা দিল। একদল ঠিকই করল যে তারা ডাকাতি আর করবে না কৃষকদের মধ্যে গিয়ে তাদের নিয়ে সংগঠন করবে। দুর্গাপুর থেকে এই ঢেউটি কলকাতার শহরে সব কমরেডকে কিছু না কিছু বিভ্রান্ত করল। এই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে আমরা সব কমরেডকে ডেকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারে মিটিং করি ও বাক্‌বিতণ্ডা হয়, কিন্তু সমাধান কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। একদল অপর দলকে বলতে লাগল কলকাতা আপসার্চ করার জন্য ডাকাতি প্রভৃতি করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। অপর পক্ষে বলা হচ্ছিল যে, তারা কৃষি বিপ্লবের ধোঁয়া ধরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করবে। এই ডায়মণ্ড হারবারের গুপ্ত মিটিং-এর পর তারা আবার গুপ্ত মিটিং-এর প্রয়োজন অনুভব করছিল। সেই মিটিংটি নৌকার ওপর হয়। দুই পক্ষই বিশেষ মতে অটল, কাজেই তাদের মধ্যে দল ভেঙ্গে যাওয়াটা অনিবার্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দলের যা আর্মস্ ছিল তা ভাল হয়ে গেল গাড়িও ভাগ হল। যা টাকা ছিল তাও ভাগ হয়ে গেল।

যারা কৃষক বিপ্লব করবে মনস্থির করেছিল তারা গ্রামে চলে যেতে লাগল আর যারা কলকাতায় সাংহাই অভ্যুত্থানের মত একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য পরিকল্পনা করছিল তারা তাদের মতে অবিচল থেকে শহরে শহরে সশস্ত্র সংগঠন করে যাবে স্থির করল।

ভেবেছিলাম ভাঙ্গন হলেও তিক্ততা আসবে না, কিন্তু কোন মহান আদর্শই এই তিক্ততা থেকে সংগঠনকে মুক্ত রাখতে পারে নি।

২০

যাদের উপর সংগঠনের দায়িত্ব ছিল অর্থাৎ অতগুলো বাড়িভাড়া, মোটর-গাড়ি প্রভৃতি খরচ চালাবার, তা তারা ইচ্ছা করলেই তখন বাদ দিতে পারে নি। তাই প্রায় সব দায়িত্বগুলোই এসে পড়ল তাদের ঘাড়ে যারা শহরে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই প্রস্তুতির পথে টাকা যোগাড় করাটা তাদের ঘাড়ে এসে পড়ল। হাতে তাদের সময় খুব কম। তাদের সদস্য ও সংগঠকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, তবু তাদের দুর্গাপুর প্ল্যান সমাপ্ত করতেই হবে।

এতে তাদের টাকা ও সময় দুয়ের-ই প্রয়োজন। তাদের কোন গুপ্ত সম্পত্তি ছিল না যে সেখান থেকে এই প্রয়োজন মেটানো যায়। অগত্যা তাদের আরেকটি ছোট ডাকাতি করে লক্ষাধিক টাকা যোগাড় করা প্রয়োজন। সুনিশ্চিত ভাবে লক্ষাধিক টাকা অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতি করে পেতে হলে কোন ব্যাঙ্কে ডাকাতি প্ল্যান করতে হয়। সবরকম তথ্য সংগ্রহ করে ছোটখাটো ব্যাঙ্কে ডাকাতি করা অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব ছিল, যদি সেইরূপ আমাদের সংবাদ থাকত, কিন্তু তা ছিল না, একমাত্র আমাদের নিখুঁত সংবাদ ছিল নিউ আলিপুর গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক। সেই ব্যাঙ্কে কয়েক মাস আগে আমরা ডাকাতি করেছি, তবু দেখা গেল সেই ব্যাঙ্কের মালিকরা বা পুলিশ কোনরূপ নতুন সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করেনি। তাই আমাদের এতে মনে হয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে আবার গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কটি ডাকাতি করা হোক।

খুবই আশ্চর্যের কথা, ডাকাতি হয়ে যাবার পর ব্যাঙ্ক কেন নতুন পাহারার ব্যবস্থা করে নি, এই প্রশ্নটি আমাদের মনে এসেছিল, এটা কী এমনি কথা যে ন্যাশনাল গ্রিণ্ডলেজের মালিকরা ভেবেছিল যে একবার ডাকাতি করার পর সেখানে আর শীঘ্র ডাকাতি হবে না। এরূপ ভেবে তারা কোন সুব্যবস্থা না করতেও বা পারেন। আবার এও হতে পারে যে তারা নতুন ব্যবস্থা নিয়েছিল যা বাইরে থেকে চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। ব্যাঙ্কে আমরা ব্যাঙ্কিং

আওয়ার্সের ভিতরে যাই এবং কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখেছি নতুন কোন ব্যবস্থা আছে কিনা অর্থাৎ সাদা পোশাকে রিভলভার নিয়ে কেউ পাহারা দিচ্ছে কি না। যতদূর জানতে পেরেছিলাম তা থেকে স্থির বুঝেছিলাম যে, তারা সংরক্ষণের জন্য কোন নতুন ব্যবস্থাই করে নি। তাই পনের দিনের মধ্যে আমরা এই ব্যাঙ্কটি আবার আক্রমণ করে টাকা লুঠ করব মনস্থ করলাম।

প্ল্যান আগের মতই। কোন্ গাড়ি যাবে কে, গাড়ি চালাবে, নাম্বার প্লেট কে কোথায় চেঞ্জ করে নেবে অর্থাৎ নাম্বার প্লেটে এমন নাম্বার থাকা উচিত যে নাম্বারে ডুপ্লিকেট নাম্বারযুক্ত অন্য কোন গাড়ি হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হবে না। এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে গাড়ি রিপেয়ারিং অবস্থায় পড়ে আছে সে নিশ্চয় রাস্তায় বের হবে না, সেই নাম্বারটি আমরা কাল কাগজের ওপরে নাম্বার প্লেটের সাইজে সাদা কালিতে লিখে নিলাম। এই কাগজের ফল্‌স নাম্বার প্লেট ডাকাতির দশ পনের মিনিট আগে নিকটবর্তী কোন একটি গোপন স্থানে ভেসলিন মাখিয়ে গাড়ির অরিজিনাল নাম্বার প্লেটের উপর আটকে দিতাম। সেইরূপ রাস্তা কিংবা গলি গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের সামনে আমরা দেখে রেখেছিলাম। গাড়ির চালক কে হবে তা আমরা ঠিক করলাম, গাড়ির চালক গাড়িটি নিয়ে পাঁচ মিনিট আগে সেইস্থানে উপস্থিত হবে, ডাকাতি শেষ করে এবং আরেকজন যে গেটে ও অন্যজন মোটর গাড়িতে পাহারা দেবে তারা এসে গাড়িতে উঠবে। তারপরের ব্যবস্থা গাড়ি টাকা লুঠ হওয়ার পরে কোন্ পথে যাবে, সেটি ঠিক করা ছিল। কোন একটি পয়েন্টে টাকার ব্যাগ নামিয়ে দিলে, সেই ব্যাগ কোন নিরাপদ স্থানে, কোন নিরাপদ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গুণে প্যাক করার ব্যবস্থা করা ছিল। সেরূপভাবে আবার আর্মসের বক্স নামিয়ে দিলে তাও নিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ডাকাতি করার পরে যাওয়ার পথে কোথায় নেমে যাবে এবং কোন্ পথে কোথায় যাবে প্রত্যেকের ওপর এবং পরে কে কোথায় মিলিত হবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। তারপর এইসব বন্দোবস্ত থাকার পর ডাকাতির স্পটে অর্থাৎ ব্যাঙ্কে হঠাৎ কি ঘটনা ঘটবে এবং সেরূপ ঘটনাকে কিরূপে সমাধান করা যায় তার জন্যে বিশেষ চিন্তা করে কতকগুলো নির্দেশ দেওয়া ছিল। যেমন, আমরা আশংকা করেছিলাম (১) ব্যাঙ্কে যখন তারা ডাকাতি করবে তখন হঠাৎ গেটের সাটারটি টেনে বন্ধ করে দিতে পারে। (২) ব্যাঙ্কের ভিতরে এবার হয়তো সাদা পোশাকে আর্মড পুলিশ পিস্তল, রিভলভার নিয়ে থাকবে এবং তারা হঠাৎ প্রতি আক্রমণ শুরু

করতে পারে। (৩) ভিজিটাররা লম্বা প্যাসেজে যেখানে বসে থাকত সেখানে কোন একজন বা দু'জন পুলিশের লোক ভিজিটারস সেজে বসে হয়তো থাকবে এবং যাওয়ার সময় শেষের একজন দু'জনকে ঝাপটে ধরে ফেলবে। বাইরে এসে মোটর গাড়িতে ওঠার সময় বিক্ষুব্ধ পাবলিক মোটরগাড়ি লক্ষ্য করে যেমন আগের বারে ইঁট-পাটকেল ছুড়েছিল তেমনটি এবারও ছুড়তে পারে। এমন কি এবার ইঁটপাটকেলের আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। (৪) সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল যদি আমাদের কেউ হঠাৎ আহত হয় বা অ্যাকশনে কারুর মৃত্যু হয় সেরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য তার পরিকল্পনা করেছিলাম।

মনে মনে পরিকল্পনা থাকলে হয় না সেই প্ল্যানকে কার্যে পরিণত করার জন্য যে চেষ্টা ও ব্যবস্থা থাকা উচিত সেটি ছিল কি না এটাই ছিল প্রশ্ন। সর্বোপরি এরূপ দারুণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েও মাথা স্থির রেখে কাজ করে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহস কমরেডদের ছিল কি না প্রশ্ন। ব্যবস্থা থাকলেও যদি সাহস না থাকে তবে তা করা সম্ভব নয়। কাজেই সবাইকে এই কথাটি উপলব্ধি করতে বার বার জোর দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে টিম গঠন ও সুসজ্জিত করে ব্যাঙ্কে নির্ধারিত দিনে পাঠান হয়। সবাই দৃঢ সংকল্প হয়ে টাইম মত ব্যাঙ্ক আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করল।

ব্যাঙ্ক খুলবার পাঁচ মিনিট আগে বিপ্লবীদের যেখানে যার পজিশন নেওয়ার কথা তা তারা নিয়েছিল। তারও কিছু আগে গাড়ির নাম্বার প্লেটটি চেঞ্জ করে লুঠের টাকা ও আমাদের কমরেডদের নিয়ে সে স্থান থেকে পেরিয়ে যাবার জন্য গাড়ি তৈরী ছিল।

ঠিক সময় দারোয়ান এল এবং ব্যাঙ্কের দরজার সাটার খুলে উপরে তুলে দিল। তখনই আমাদের তিনজন কমরেড ব্যাঙ্কে ঢোকার জন্য যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল। এন. সি. সি. পোশাক পরা কমরেডটি এগিয়ে গিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরেকজন ব্যাঙ্কের গেট থেকে রাস্তা পর্যন্ত সিঁড়ি কভার করে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়াল। নিয়মমাফিক এজেন্টের ঘর থেকে ক্যাসিয়ারবাবু ক্যাস বাক্স নিয়ে ক্যাশ কাউণ্টারে এলেন। আসা মাত্রই যে তিনজন কমরেড কাউণ্টারে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন কাউণ্টারের টেবিলে লাফিয়ে উঠে সমস্ত ব্যাঙ্কটিকে চমকে দিয়ে কম্যাণ্ড করল যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকবেন, ভয় নেই। আমরা টাকা লুঠ করব। একজন যে উপরে উঠে কম্যাণ্ড করল সে নামল এবং ক্যাশ বাক্সটি তুলে নিয়ে যে দু'জন

কাউন্টারের বাইরে ছিল তাদের হাতে দিল এবং কাউন্টারের ভেতর থেকে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল ছিল। দু'জনে বাক্সটি নিয়ে এবং তৃতীয় কমরেডটি তাদের সঙ্গে সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলল। ক্যাশ কাউন্টারের সামনে ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ পথ চলার বারান্দাটা দিয়ে তাদের বাইরে চলে যাওয়ার পথ। সেই সরু চলা পথে ডানপাশে যারা ব্যাঙ্কের কাজে এসেছিল তারা কেউ বসা কেউ দাঁড়ান। তাদেরই সামনে দিয়ে তারা সোজা গেটের দিকে চলে গেল, কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করল না। সবাইকে দেখা গেল খুবই সন্ত্রস্ত ও ভীত। তবু কমরেডরা খুবই সতর্ক ছিল, হঠাৎ আক্রমণ হলে আত্মরক্ষা করার জন্য। এই এক মিনিটের মধ্যে তারা তিনজন টাকা নিয়ে সদর দরজার কাছে এসে গেল। এন. সি. সি. পোশাকে গেটে যে পাহারা দিচ্ছিল—সে তখন সবাইকে ভয় দেখাবার জন্য উপরের দিকে স্টেনগানের কয়েকটি গুলি ছোঁড়ে। ব্যাঙ্কের কর্মচারী সবাই সচকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভয়ে কেউ নিজেদের আসন ছেড়ে ছোটাছুটি করেন নি। তারা চারজন বাইরে এসে দেখে সিঁড়ির উপর থেকে মোটর গাড়ি পর্যন্ত যে পাহারা দিচ্ছিল সে তখন একটা ছুটো ফাঁকা শব্দ করল, বিক্ষুব্ধ লোক যারা সেখানে জড়ো হচ্ছিল তাদের ভয় দেখানোর জন্য। সবকিছু সমাধান করে তারা গাড়িতে উঠল। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছিল। অদূরে পেট্রোল পাম্পে ইতিমধ্যেই কিছু লোক জমে গেল। ব্যাঙ্কে যে আবার ডাকাতি হচ্ছে তা তাদের বুঝতে বাকি রইল না। তবু তাদের তেমন কিছু এর বিরুদ্ধে করণীয় ছিল না। তাদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ব্যক্তি থান ইট দিয়ে গাড়ির দিকে ছুঁড়ে মারল, ইট কাউকে আহত করে নি, গাড়ি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের নিজের অন্য একটি গাড়ি দূর থেকে ঐ গাড়িটিকে অনুসরণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল পথে যদি তাদের গাড়ি বিগড়ে যায় গাড়িটি তৎক্ষণাৎ এসে টাকা ও তাদের নিয়ে উধাও হবে। কিন্তু সেইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি। নির্দিষ্ট পথে গাড়িটি বিনা বাধায় এগিয়ে গেল, এবং আর্মস ও টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লোক নেমে গেল। আর পর মুহূর্তে গাড়ির নাম্বার প্লেটের উপর যে ফল্‌স নাম্বার প্লেটের কাগজ ছিল তা তুলে ফেলা হল। পরে অরিজিনাল নাম্বার নিয়ে গাড়িটি নিজেদের গ্যারেজে রাখল। টাকার ব্যাগ নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িতে গিয়েছিল এবং সেখানে তাদের মধ্যে দু'জন এসে টাকা গুণে দেখল কত টাকা, তারপর প্যাক করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রেডিও এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির সংবাদটি প্রচার করল। অর্থ লুঠের যে সংখ্যাটি ঘোষণা করল তা এক লক্ষ পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা। এবার কোন টাকা অপসারিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। বলতে গেলে সাফল্যের সঙ্গে ডাকাতিটি হয়েছিল ও লক্ষাধিক টাকা বিনা রক্তপাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবুও আজকে সমীক্ষা করে দেখে বলতে হবে এ আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে প্রথম পোস্টাল ব্যাঙ্কে ডাকাতির পর সব টাকা আনতে না পারার জন্য অর্থাৎ একটি লক্ষাধিক টাকার পোস্টাল গুলি ভ্যানের ভিতর ফেলে এসেছিল যে তারপর কালাতিপাত না করে আমরা কার্যত কর্মসূচীর রূপ দিতে না পেরে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করেছিলাম। টেকনিক্যাল প্রস্তুতিপর্বে যে সব কাজ আমাদের হাতে জমেছিল তা সমাধান না করে তর্ক করার আমাদের অধিকার ছিল না। এইভাবে দেরী করাতে আমাদের নিশ্চিত গাফিলতি হয়েছিল, তারই জন্য দণ্ড দিতে হয়—অর্থাৎ আরেকটি ডাকাতির ঝুঁকি নিতে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত করতে হয়। অর্থাৎ এই ব্যাঙ্কে দু'তিন চার মাস পূর্বে আমাদের ডাকাতি করতে হয়। তারপরও আমাদের গাফিলতির শেষ ছিল না, সেই টাকা নিয়েও আমরা দুর্গাপুরে ডাকাতির প্ল্যান সমাপ্ত করতে পারলাম না, তাই আমাদের অনেক গুণাগার দিতে হল। সেইজন্য এই দ্বিতীয় ডাকাতিটি করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল এত অল্প টাকায়, যেখানে নাকি মাত্র লক্ষাধিক টাকা পেলাম সেই টাকা দিয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা কি সম্ভবপর হবে ?

ভাববার সময় নেই, তবু প্রাণপণে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করলাম। এই সময় আমাদের দল আগেই বিভক্ত হয়ে গেছে, গ্রাম থেকে শহর যারা ঘেরাও করবে প্রোগ্রাম নিয়েছে সেই কৃষি বিপ্লবের প্রোগ্রাম নিয়ে তারা গ্রামে গেল। আমরা যারা সাংহাই আপ সার্জের মত শহর দখল করব তারা অন্য ধারায় প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদেরই দুর্গাপুর প্ল্যানটি শেষ করার দায়িত্ব। আমাদেরই শহর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার জন্য এক কোটি টাকা অন্তত প্রয়োজন। তাই সীমিত শক্তি নিয়েও এই ডাকাতির পর দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম। কলকাতা আপ সার্চটি প্ল্যানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমরা ধরে নিয়েছিলাম। কার্যতঃ প্ল্যানটি প্রায় সবটাই বাকি ছিল। গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক দ্বিতীয়বার ডাকাতি হওয়ার পর পুলিশ আমাদের দলটিকে সন্দেহ করছিল

তা আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গেল, তা সত্ত্বেও আমাদের কাজ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। ধীর গতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না। পুলিশ এবার আমাকেও সন্দেহ করছে, এবং তদনুযায়ী আমাকে অনুসরণ করার জন্য তাদের এজেন্টদের নিযুক্ত করেছে তা বেশ বুঝতে পারা গেল। আমাকে অনুসরণ করতে হলে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে করা সম্ভব ছিল না কারণ আমি সব সময়ই মোটর গাড়ি করে বের হতাম। আমার গাড়ি অনুসরণ করতে হলে তাদের গাড়ি আমার গাড়ির দৃষ্টির বাইরে থেকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা কার্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। সেই ক্ষেত্রে পুলিশ বেছে বেছে তাদের ওয়াচ্ করার পোস্ট ঠিক করেছিল, সেইসব স্থানে আমার যাতায়াত হতই, কাজেই আগে থেকে সেখানে এজেন্টদের বসিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। এই দুই পদ্ধতিতে পুলিশ মরিয়া হয়ে আমাকে ওয়াচ করার কাজ শুরু করেছিল। আমি কিন্তু ছোটাছুটি একদম করতাম না। আমার গতি তখন খুবই মন্থর করেছিলাম। কেউ দেখলে যেন মনে করতে না পারে যে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে কোন কাজে যাচ্ছি বা নিজে সাবধান হতে চেষ্টা করছি। আমার ভাবটা ছিল এমন যেন আমি কোন গুরুতর কাজ করছি না। কোন কাজেই আমার ব্যস্ততা নেই।

পুলিশের হঠাৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এইরূপ পথ নেওয়াই আমার প্রথম কাজ ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রতি আক্রমণকে প্রতিহত করে পরের প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়ত, এই সময় আমাদের ভিতরে পার্থক্য ও রেষারেষি আরো বেড়ে গেল। সেইজন্য সভ্যদেব নিয়ে ঘন ঘন গ্রুপ মিটিং ও জেনারেল মিটিং ডাকা হচ্ছিল। মিটিং-এ আমাকেও নানাভাবে অংশ নিতে ও সেই সব মিটিং চালাবার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্কুলার পাঠাতে হয়। আমাদের সংগঠনে টাকা আবার টান পড়বে জানা ছিল। প্রতি মাসে প্রচুর খরচ—(১) কমরেডদের থাকা খাওয়ার জন্য, (২) অনেকগুলো বাড়ি ভাড়া, (৩) মোটর গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক খরচ, (৪) হায়ার পারচেজে ডিউ দেওয়া, (৫) ফার্নিচার প্রভৃতি ভাড়ার জন্য প্রতি মাসে খরচ দিতে আমরা বাধ্য ছিলাম। তাছাড়া দুর্গাপুরে অতজন কমরেডকে রাখার আর দুর্গাপুরে অত বড় একটি ডাকাতির প্ল্যানকে রূপ দেওয়ার জন্য খরচ

হত অনেক টাকার। এইসব টাকা ম্যানেজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজেই প্রতিটি দিন প্ল্যানটি পিছিয়ে যাচ্ছিল বলে তার জন্য আমাদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছিল। আমরা সবার মানসিক অবস্থা যাচাই করে দেখে তখনই গো অরডার দিতে পারতাম যদি বুঝতাম যে ফিল্ড কম্যাণ্ডার যেখানে অ্যাকশন করতে প্রস্তুত হয়ে আছে কিন্তু ছোটখাট ডিফেক্টের জন্য অ্যাকশন্ শুরু করা সম্ভব ছিল না। যে দিন অ্যাকশান্ হওয়ার কথা ছিল সেদিন করা গেল না যেহেতু শেষ মুহূর্তে টাকা তুলে আনার ট্রান্সারটির স্টিয়ারিং হুইলে একটি মারাত্মক দোষ দেখা দিল। সকাল থেকে চারটে পর্যন্ত স্পেশাল মিস্ত্রি দিয়ে এই স্টিয়ারিং হুইলটি ঠিক করার জন্য চেষ্টা চলেছিল। তবু এই চেষ্টায় সেইদিন সফল না হওয়ায় প্ল্যানটি স্থগিত থাকে।

দ্বিতীয় দিন সকালে দু' তিন ঘণ্টার ভিতরে ঐ মোটরের স্টিয়ারিং হুইলের দোষটি সারানো যাবে বলে মিস্ত্রি বলেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সি. আর. পি. পুলিশ কালভাটের নীচে থেকে ডিনামাইট আবিষ্কার করল। এই ডিনামাইট-গুলি রাখা হয়েছিল ঐ কালভাটটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য। এই কালভাটটি উড়িয়ে দিলে সি. আর. পি. সমস্ত মিলিটারী ভ্যান ও গাড়ি এই পথে চলতে পারত না। এই পথে ট্রাঙ্ক রোডে আসতে হয়। ওদের পথ অবরোধ করার জন্য আমরা জিরো আওয়ারে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলাম আবার আরেকটি রাস্তা ব্যাঙ্কের পেছন দিক থেকে একটুখানি গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে সোজা ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়তে পারত। এই রাস্তাটি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও সি. আর. পি. মিলিটারী ভ্যান ও গাড়ি বেরিয়ে ট্রাঙ্ক রোডে পড়ার আরেকটি রাস্তা। এই রাস্তাটি ট্রাঙ্ক রোডে মিলিত হওয়ার আগে এই রাস্তার নীচের দিকেও একটি কালভার্ট ছিল। এই কালভার্টটি যদি উড়িয়ে দেওয়া হত তবে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও সি. আর. পি. পথ সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হত।

পুলিশ ঐ কালভার্টের নীচে ডিনামাইট আবিষ্কার করে বুঝেছিল যে, কোন দুষ্কৃতকারী দলের অভিপ্রায়ের জন্য এই ডিনামাইট সেখানে রেখেছে। কিন্তু এই থেকে ব্যাঙ্ক লুঠ হবে তা তারা ভাবতে পারে নি। এবং এই কালভার্টের নীচে ডিনামাইট পাওয়ার সূত্র ধরে আরেকটি কালভার্ট—অন্য পথে আবিষ্কার করে নি।

২১
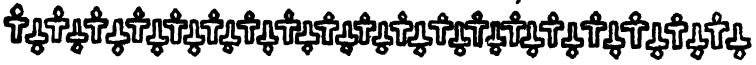
প্রথম দিন আমরা ব্যাঙ্ক আক্রমণ স্থগিত রাখতে বাধ্য হই যেহেতু আমাদের তৈরী আমার গাড়ির মেরামত কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। দ্বিতীয় দিন এই গোলমাল হওয়াতে অর্থাৎ ডিনামাইট আবিষ্কার করার পর মিলিটারী ও পুলিশ সচকিত হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় দিনও অ্যাকশন্ করা সমীচীন বলে মনে করিনি। ডিনামাইট পুলিশ আবিষ্কার করেছিল সকালবেলার দিকে। প্রায় বারটার সময় পুলিশ মাঠে একটু জংলা জায়গার ভিতর 'গাদা কামান' উদ্ধার করল। গাদা কামান অর্থাৎ পুরু ষ্টীলের চোঙা যার ভেতর বিস্ফোরক দ্রব্য পোরা ছিল।' সেগুলিকে ট্রেঞ্চ মর্টারের মত ব্যবহার করা হত। এই জংলা জায়গাটি থেকে ট্রাঙ্ক রোডের পাশে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের গুর্খারা পাহারা দিত। যেকটি গাদা কামান ওখানে পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো ঐ সৈন্যদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে বসান ছিল। এসব তথ্য আমরা বিচারের সময় সাক্ষীদের বর্ণনায় শুনতে পেয়েছিলাম। আর কোর্ট আদালতে ট্রাইব্যুনাল জজের কাছে গাদা কামান তারা হাজির করে।

এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি এক কোটি টাকা সহজে ব্যাঙ্ক লুঠ করা যেত না। ব্যাঙ্ক লুঠ হওয়ার পরে সি. আর. পি.; বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই যদি আমরা ডাকাতিটি নিঃশব্দ রজনীতে সারতে পারতাম তবে এই বিরাট প্রতি আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেতাম। সেইজন্য কালিঘাটে মার পূজা দিয়ে এই কাজ করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব করতে হলে আমাদেরই করতে হবে তা বুঝেছিলাম। তার জন্য শক্তি অনুযায়ী আমাদের একটি গেরিলা প্ল্যান বাস্তবে পরিণত করতে যাই। সেই জন্য আমাদের ম্যানেজারের বাড়ির পাশে বহু কষ্টে একটি বাসা ভাড়া

করতে হয়। সম্ভাব্য এবং বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখিয়ে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। সেই কমরেডের একটি গাড়িও ছিল, কমরেডটি তক্‌কে তক্‌কে ছিল। একদিন ম্যানেজার বাবুকে অফিস যাওয়ার পথে বা অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়িতে তুলে নেয়। বেশ কিছুদিন এইভাবে চেষ্টা করে সে খুব সাফল্যের সঙ্গে তাকে তাঁর প্রতিবেশী পরিচয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। ম্যানেজারবাবু তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার বাসায় আসতো যেতো। কাজেই ব্যাঙ্ক থেকে তার বাড়ি যাওয়ার পথে কোন এক সময় তার কাছ থেকে চাবিটি জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হবে তা ঠিক ছিল। ক্যাশিয়ার-বাবুকেও অনুসরণ করে করে ও তাঁর প্রতিবেশী হিসাবে ভাব জমানো হল। জিনিসটি খুবই শক্ত, আবার তেমন শক্ত নয়, যদি প্ল্যান করে সুপরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী চেষ্টা করে যাই। ক্যাশিয়'র ও ম্যানেজারবাবুকে তাদের অফিস থেকে ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি যাওয়ার আগে কোন সুবিধামত জায়গায় গাড়িতে তুলে নিয়ে বা গাড়িতে তোলার আগে চাবি নিয়ে নিতে হবে যা প্ল্যান করা হয়েছিল। একই সময়ে একই স্থানে দু'জনকে পাওয়া যেত না। দুটি বিভিন্ন স্থানে তাঁদের ধরে নিয়ে চাবি নেওয়া হত এবং তাঁদের নিয়ে মাঠের মধ্যে একটি সুন্দর নতুন পাকা বাড়িতে তোলা হত। মাঠের উপর সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। তার মধ্যে বেছে আমাদের মধ্যে কেউ একটি বাড়ি ভাড়া করে। তার জন্য যা বিশ্বাসযোগ্য একস্‌প্ল্যানেশন্ দেওয়া উচিত তা দেওয়া হত। বাড়িওয়ালার সঙ্গে খাতির করে থাকার সুবিধার জন্য কিছু কিছু ঘরের চেঞ্জ করতে হয়েছিল। তাছাড়া নিজেদের ছুতার মিস্ত্রি এনে কিছু কিছু কনস্ট্রাকশন্ করাতে হয়েছিল। ভিতরে অ্যারেঞ্জমেণ্টের প্রধান একটি অ্যারেঞ্জমেণ্ট হল একটি লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘর তৈরী করা। এর ভিতবে পায়খানা, প্রস্রাবের জন্য দুটি তোলা কমোড পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল। ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারবাবুকে বন্দী করে এখানে আনার ইচ্ছা ছিল। এখানে তাদের রেখে আলাদা ভাবে কথা বলে আমাদের পক্ষে তাদের সহানুভূতিশীল করে তোলার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য কিভাবে মনস্তাত্বিক কথা তাঁদের সঙ্গে বলতে হবে, তা লিখে ফেলা হয়।

কথাগুলি এইরূপ—দেখুন আমরা অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করলাম তার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চাইছি। জানি ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায় না, এটা অন্তত বুঝি। যদি আপনি আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ক্ষমা করা যায় বুক্তি দিয়ে

বুঝতে পারেন তবে অবশ্য আপনার কাছ থেকে তদনুরূপ দাবি করতে পারি। তাই আপনাদের জানাচ্ছি আমাদের জীবন মিলিটারী ও পুলিশের গুলিতে যাবে সেইরূপ আশংকা প্রতি মুহূর্তেই করছি। তবু আমাদের মা, বাবা ও প্রিয়জনদের স্নেহ মমতা বিসর্জন দিয়ে এরূপ একটি ভয়াবহ কাজে নেমেছি। অন্তর থেকে বুঝেছি আমি নিজে প্রাণ দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, তখন সেই কাজের সমাধানের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হলে অন্যের জীবন নেওয়ার অধিকারও আমার আছে।

'আমরা নিজেরা ভাবি যে যুক্তির কাছে মাথা নত করে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি, সেই যুক্তি যদি ঠিকমত বলা যায় ও আপনারা বোঝেন তবে আপনারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারবেন না। আমাদের এই অপরাধ আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।'

দেখুন আমাদের কারুর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া পরার অভাব নেই, আমাদের কারুর ডাকাতি করা জীবিকার জন্য প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে এক দেড় কোটি টাকার ডাকাতি জীবিকা অতিবাহিত করার জন্য নয়। আমরা আদর্শের জন্য, নিপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে ও সংগঠন গঠন করার উদ্দেশ্যে এই ডাকাতি করছি। আপনাদের কাছে মিলিত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা একবার লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনগণের কষ্ট ভেবে দেখুন। এই নিপীড়িত জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতেই হবে, অবশ্য সেই স্বাধীনতা আমরা ফিরিয়ে দিই বা না দিই তারা তা অর্জন করবেই। সর্বহারার দল যখন নিজ ক্ষমতাগুণে তা অধিকার করবেই তখন তো আমাদের আর কোন কাজ থাকতে পারে না। এইরূপ মনোভাব কোন লেনিনবাদী বিপ্লবী ভাবতে পারে না। আমরা সেই জনগণের সর্বাত্মক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য ও সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিযে যাবই, সেইহেতু সেই ব্যাপক কাজে দুর্গাপুর ব্যাঙ্কের এক কোটি টাকা আমাদের নিতেই হবে। যদি চাইলে কেউ আমাদের এই টাকা দিযে দিতেন তবে এত হাঙ্গামার ভিতর যেতাম না। চেষ্টার ব্যতিরেকে এই টাকা যে আমরা পাব না তা আমরা জানতাম। তবে চেষ্টা করতে গিয়ে স্টেনগান দিয়ে ব্যাঙ্ক আক্রমণ করলাম, গুলি চালালাম, সবাইকে অতর্কিতে গুলি করে টাকা নিয়ে এলাম সেরূপ পথ আমরা নিতে চাচ্ছি না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখব আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল

লোকদের পুরো সমর্থন পাওয়ার জন্য। সেইজন্য আপনাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভদ্রতা করেও এখানে বন্দী করে এনেছি আমাদের বক্তব্যগুলো আপনাদের বুঝিয়ে বলার জন্য।'

'আপনারা এতদিন সরকারি ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজার ছিলেন, আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের বিপ্লবী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার হয়ে থাকুন, এই সংবাদ কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না, এটা কেবল জানবেন আপনারা ও জানবো আমরা। আপনারা যেভাবে সরকারি ব্যাঙ্কের চাকরি করতেন, সেইভাবে চাকরি করবেন এবং সেই সরকারী চাকরিতে কোনরূপ ফাঁকি দেবেন না, কিন্তু জনান্তিকে আমাদের ব্যাঙ্কের ভল্টের চাবি আপনাদের কাছেই থাকবে। আপনারা আমাদের বিপ্লবী কাজে আমাদের রিকুইজিসন অনুযায়ী টাকা দেবেন। কোনখানে কোন হিসাব রাখার প্রয়োজন নেই। এই কাজে দক্ষতা নির্ভর করে নিরীহ ভাবে থাকা ও এই গোপন অংশের কথা কাউকে না জানানো। আমরা বিশ্বাস করি যদি আপনারা সুনিশ্চিত ভাবে বোঝেন যে এইরূপ কাজের কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ পাবে না তবে আপনাদের আপত্তি না করার কথা ও ভয় না পাবার কথা। আপনাদের বিপদ মাথায় নিয়ে এইরূপ সাংঘাতিক কাজ করার জন্য আপনাদেরও আমরা আমাদের বিপ্লবী দল থেকে প্রতি মাসে সরকার যা বেতন দেয় তার দ্বিগুণ বেতন দেব। এখন কথা হল এই কাজ কী করে গোপনে সম্পূর্ণ হবে এবং কী করেই বা গোপনে থাকবে, সেটি সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চিত হতে হবে। প্রমাণ হিসাবে আপনারা যা পাবেন সেটি হচ্ছে এই ব্যাপক পরিকল্পনা নিখুঁত ভাবে শেষ করার মধ্যে, আর পাবেন আপনাদের সঙ্গে এই দুইজনের (যাদের দেখতে পাচ্ছেন) তাদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখবেন, টাকা নেওয়ার জন্য ও কোন সময় আরো টাকা জমা দেওয়ার জন্য। এইভাবে আমরা আমাদের গোপন ব্যাঙ্কের কাজ সম্পন্ন করব মনস্থ করেছি। এখন নির্ভর করে আপনাদের উত্তরের উপর আমরা কী পথ অনুসরণ করব……।'

যেভাবে তাঁদের আমাদের এই কাজে এইভাবে মত করাবার জন্য ঠিক করেছিলাম তা সম্পূর্ণভাবে ভাল করে লেখা হয়। তারপর কে বলবে সেরূপ একজন কমরেডকে দিয়ে বলবার কথা ভেবেছিলাম, সেই কমরেডটি আগে থেকে কয়েকবার পড়ে নিয়ে ঠিক হয়ে থাকবে, বলার সময় কাগজ দেখে দেখে বলবে

তা নয়। সুন্দর ও বাস্তবানুগত ভাবে বলার জন্য রিহার্শাল্ দিয়ে প্রস্তুত হওয়া।

চাবি নিয়ে ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ারবাবুকে বন্দী করে কনভার্ট করা পর্যন্ত যে কাজ তা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এভাবে করেছিলাম কিন্তু আমাদের মধ্যে গোপন আলোচনা হয়েছিল দু'জনের সঙ্গে একই সময়ে এই নিয়ে কথা বলব কী না। একেবারে একাধারে যদি একজনের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা যায় এবং সে যদি বোঝে এই কথাটি তার অন্য কোন সাথী কর্মচারী ঘুণাক্ষরে জানছে না, তবে, তার কাছ থেকে একটি পজিটিভ উত্তর পেলেও পেতে পারি। দু'জন এক সঙ্গে থাকলে কে আগে মত দেবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা যেত এবং ইচ্ছা থাকলেও দু'জনেই এইরূপ প্রস্তাবে না করবে। কাজেই আমরা শেষ পর্যন্ত আলাদা ঘরে আলাদা ভাবে এইরূপ ভাবে ব্যক্তিগত একজনের সঙ্গে কথা বলব ঠিক করেছিলাম।

যদি এটুকু কাজ সমাধান কবতে পারতাম তবে দ্বিতীয় বাধার সম্মুখীন হতাম, সেটি হচ্ছে বন্দুকধারী দারোয়ান ব্যাঙ্কের অফিসে পাহারা দিত—ভিতরে ও বাহিরে যতদূর মনে পড়ে—ভিতরে দুজন ও বাইরে দুজন বন্দুক নিয়ে থাকত। দিনের বেলা আক্রমণ করলে সবাইকে নিরস্ত্র করতে পারা যায়, যদি রাত্রিবেলা নিস্তব্ধতা না ভেঙ্গে ব্যাঙ্ক লুঠ করতে হয় তবে তার জন্য প্রিপারেশন করতে হয় অনেকখানি। আমরা যখন ঠিকই করেছিলাম ব্যাঙ্কের অফিস আওয়ারে ব্যাঙ্ক দখল করব না, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে বিনা রক্তপাতে গণ্ডগোল এড়িয়ে ডাকাতিটি সমাধান করব তখনই আমরা আমাদের মাথায় হিমালয় পর্বত তুল্য সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমাদের টাকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল এবং সাহসিকতারও প্রয়োজন ছিল, তাই বলে যে সাহসিকতায় বুদ্ধি কম ও হত্যা অনেক বেশী তা যতদূর সম্ভব পরিহার করা আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য মনে করেছিলাম। সেইহেতু রাত্রিবেলা ব্যাঙ্কের দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কে কী করে ঢোকা যায় সেই পরিকল্পনা আমরা এইভাবে করেছিলাম—

দারোয়ানদের সঙ্গে ভাব করা এবং সেই ভাব জমিয়ে সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিবেলা তাদের কাছে যাওয়া এই কাজটি খুবই সহজ যদি না কী সেখানকার লোক এই কাজের ভার নিত, কিন্তু আমাদের কমরেড সবাই নতুন অজানা জায়গা দুর্গাপুরে বাসা ভাড়া করেছিল বিভিন্ন কাজের অজুহাতে—বিশেষ করে

তাদের পক্ষে দারোয়ানের সঙ্গে ভাব জমান খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। কিন্তু প্ল্যান করে কাজ শুরু করলে তাও সম্ভব হয়। তাই বাস্তবিক পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দু'জন কমরেড দারোয়ানদের বিশিষ্ট বন্ধু হয় এবং রাত্রিবেলাও তাদের সঙ্গে একসাথে খাওয়া-দাওযা করে। ব্যাঙ্কের ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান আছে বলে রাত্রে শোবার জন্য তাদের আলাউ করে।

যখন এটুকু পর্যন্ত প্ল্যান এগিয়ে গেল, তখন আমাদের বাকি কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলাম। বাকি কাজগুলো কি তা একটু ধারণা থাকা উচিত। ব্যাঙ্কের পিছনে একটি উঠানের মত ছিল, এই উঠানের পশ্চিম দিকে কোর্ট বিল্ডিংস, সেখানে ইট দিয়ে বাঁধান উঁচু রাস্তা ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে। আক্রমণ শুরু করার পর এই রাস্তাটিকে ট্রেঞ্চের সামনে আড়াল হিসাবে ব্যবহাব করে গুলি চালাবার ব্যবস্থা রাখি। ব্যাঙ্কের পিছন দিকের বারান্দাব উপর দিয়ে লোক চলাচল করত। পশ্চিম থেকে পূব দিকে আসতে হলে এই বারান্দাটি ব্যবহার করত। দিনের বেলায় একদিন আমি স্বযং সেখানে উপস্থিত হয়ে এই স্থানটির টপোগ্রাফীটি দেখে আসি। আমি সেই দিন ব্যাঙ্কের পিছনে একটি লম্বা বেঞ্চির উপরে একজন লোকের সামনে গিয়ে বসি। সেই লোকের সঙ্গে সেদিন ব্যাগ ভর্তি টাকা ছিল—জমা দিতে এসেছিলেন, আমার সেখানে বসাতে সে কোন অমতই করে নি, তার কারণ ছিল আমার বার্ধক্য। আমি ব্যাংকের কাউন্টার ও ভল্টটি নিরীক্ষণ করার জন্য একশ টাকার নোট কাউন্টারে দিয়ে এক্সচেঞ্জ চাই। আমাকে আমার নোটের চেঞ্জ দিতে যতক্ষণ তাদের সময় লাগল, তার মধ্যে আমি টাকার ভল্টের পজিশন যেটুকু সম্ভব সেটুকু দেখলাম। ব্যাঙ্ক অফিস খুব বড় নয় এবং এমপ্লয়িজও খুব বেশী নয়। ম্যানেজার কোথায় বসেন, ক্যাশিয়ারের সীটটি কোথায় তাও আমি নিজ চোখে দেখে নিলাম। তারপর আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বুঝে নিলাম, রাত্রিবেলায় ব্যাঙ্কের কোন দরজাটি খোলা থাকে এবং দারোয়ানরা ব্যাঙ্কের ভিতরে ও বাহিরে কোথায় বসে বা ঘুমোয়। ব্যাঙ্কে রাত্রিবেলা নির্ধারিত সময়ে কোন ফাঁকে বিশেষ করে আমাদের প্রথম যে আক্রমণ করবে, আক্রমণকারী পার্টি প্রথম চারজন কীভাবে ঢুকবে এবং আগে থেকে বন্ধু সেজে দু'জন দু'জন কমরেড দারোয়ানদের মধ্যে মিশে থাকবে তা ঠিক হল। এরই মধ্যে কোন মুহূর্তে রিভলবার দেখিয়ে বা দারোয়ানের বন্ধু বিপ্লবী কমরেড তাকে চুপ করে থাকতে বলবে এবং তাদের

বন্দুকগুলো সংগ্রহ করবে তা বলা হয়েছিল এবং রিহার্শাল দেওয়া হয়েছিল। এই প্ল্যান যখন সম্পূর্ণ ঠিক হল তখনই কিন্তু আমরা প্ল্যানটিকে কার্যে পরিণত করতে পারলাম না, তার কারণ ডাকাতির টাকা নিয়ে কোন পথে আমাদের গাড়ি আসবে এবং সেই গাড়ি কোথায় যাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করতে সময় গেল অনেকখানি। যে ফিল্ডে কম্যাণ্ড করছিল তার বিশেষ অভিমত টাকা নিয়ে যেন কলকাতার দিকে আসা না হয়। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য তারা যেন আসানসোলের দিকে বা সেইদিকের অন্য কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার যুক্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত ভুল বলে মনে হচ্ছিল। কারণ,—আসানসোল প্রভৃতি ছোট স্থানে এক কোটি টাকা অনেকগুলো বাক্স নিয়ে যাওয়া বা রাখা প্রভৃতি সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে করা প্রয়োজন। ছোট লোকালিটিতে রাত্রিবেলা এইরূপ হাঙ্গামা হঠাৎ কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু কলকাতা শহরে ও আমাদের নিজেদের খুব পরিচিত লোকালিটিতে রাত্রিবেলা টাকার বাক্স নামান ও সরান অনেক সহজে করতে পারা যেত বলে আমার ধারণা ছিল। সর্বোপরি সাধারণ নিয়ম অনুসারে এতবড় ডাকাতির পরে এক কোটি টাকার বাক্সগুলি যত সত্বর সম্ভব নিরাপদ স্থানে ডিসফোল্ড আপ করা খুব আবশ্যক, তারপর ফিল্ড কমাণ্ডার বলতে চাইল সোজা রাস্তায় এলে ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের গার্ডদের সামনে পড়তে হবে, তাই তাদের অ্যাভয়েড্ করে ঘুরে আসতে হবে তবে আসানসোলের দিকে কিছুদূর যাওয়ার পরে ডানদিকে ঘুরে দুর্গাপুরের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা কলকাতার দিকে গেছে তা দিয়ে এসে তারপর ট্রাংক রোড ধরা। এই পথে এলে ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের ট্রাংক রোডে যারা মোতায়েন ছিল তারা টের পেত না। তা অবশ্য ঠিক তবে ডাকাতি হয়ে যাওয়ার সমাচারটি হয়তো ইতিমধ্যে তারা পেয়ে যেত, কেবল তারা নয় সি আর পি এবং বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স জানতই যে ওরা আসানসোলের দিকে গেছে, কাজেই তারা আসানসোলের দিকে খবর পাঠাত এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কিছুটা তাদের মুভমেণ্ট বিলম্বিত হলে ও তারা তাদের মিলিটারী নিয়ে পিছনে ছুটত তাই এইরূপ বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম যত সত্বর শত্রুপক্ষের সামনে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই আমাদের সশস্ত্র গাড়ি ও টাকার গাড়ি সোজা ট্রাংক রোড দিয়ে কলকাতার দিকে চলে আসার চেষ্টা করা উচিত। পথে যে সব মিলিটারী গার্ড আছে তারা পুরো খবর পাওয়ার আগেই আমাদের এইরূপ একটি প্রস্তাবের জন্য ব্যবস্থা রাখা উচিত। স্পীডকারই

এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাছাড়া যদি অন্য কোনরূপ বিশেষ ক্যামোফ্লাজও করা সম্ভব হয়, তা করলে চলবে না।

এক কোটি টাকার ডাকাতি করাটা বড় নয়, সেই টাকা সুনিশ্চিত ভাবে পুলিশ ও মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে নিরাপদে আমাদের গুপ্ত ডন্টে এনে ফেলা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই কেবল আক্রমণ করাটাই প্ল্যান নয়, আক্রমণ করে সফল হতে হলে এক কোটি টাকা অন্তত দশ বারটি দশবার লক্ষ করে টাকার বাক্সে নিয়ে আসা এই প্ল্যানের অঙ্গ হিসাবে ধরতে হবে। কাজেই এই ব্যবস্থাটির জন্য আমাদের বিশেষ করে চিন্তা হয়েছিল।

[এক] কোন্ কোন্ বাড়িতে কিভাবে টাকার বাক্স রাখব।

[দুই] সেই সেই নির্দিষ্ট বাড়িতে কে কোন্ গাড়িতে বা কিভাবে নিয়ে গিয়ে টাকা তুলবে তার জন্য স্বচ্ছ পরিকল্পনা করতে হয়েছিল।

[তিন] তারপর ট্রাংক রোড দিয়ে কিভাবে কোন্ গাড়ি করে টাকার বাক্স নিয়ে আসা হবে।

[চার] অধিকাংশ টাকার বাক্স, (দশ লক্ষ টাকা) অন্য রাস্তায় ইমারজেন্সীর জন্য অন্যভাবে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠান যায় কিনা তারও ব্যবস্থা রেখেছিলাম।

ট্রাংক রোডে টহলদারী পুলিশ সাধারণত ট্রাক, লরী, ট্যাক্সি প্রাইভেট কার চ্যালেঞ্জ করে সার্চ করে থাকে। এইরূপ একটি পরিস্থিতি কী করে এড়ান যায় তার জন্য ভাবা হয়েছিল। ভেবে ঠিক করা হয়েছিল যদি কোনরূপে বড় গাড়ি আমরা ব্যবহার করতে পারি যে রূপ গাড়িকে কোনরূপ সন্দেহ করতে পারবে না তবেই পুলিশের সঙ্গে একটি মেজর ম্যানুভার করা যাবে। সেই জন্য আমরা একটি আলকাতরার ট্রাক কিনি যেমন পেট্রোল ভ্যান হয়, সে রূপ আলকাতরার ভ্যান ও একটি ভ্যান, সেটি আমরা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মূল্যে ক্রয় করেছিলাম। ক্রয় করাতে সব হল না, কারণওতে তো আর আলকাতরা যাবে না, দেখতে সেটাকে আলকাতরা গাড়ি বলে মনে হবে, যদি ঢাকনি খুলে দেখে তবুও আলকাতরা দেখতে পাবে, যদি নীচের ট্যাপ খুলে পরীক্ষা করে তবু আলকাতরাই বেরুচ্ছে দেখতে পাবে। এইরূপভাবে আমরা আলকাতরায় ভ্যানটিকে বিভিন্ন চেম্বারে ওয়েল্ডিং করে তৈরী করে নিই। এই ব্যাপারটি কতখানি শক্ত এইরূপভাবে গাড়িটি তৈরী করতে কতদিন লেগেছিল ভেবে দেখুন। শেষ পর্যন্ত আমাদের মনোমত এই গাড়িটি প্রস্তুত হয়েছিল। নিরাপদে কলকাতায় টাকা নিয়ে আসা

এটাই ছিল আমাদের প্রধান শক্তি। কেবল প্রয়োজন ছিল এইটির আইডেনটিটি সর্বপ্রকারে সকলের কাছে গোপন রাখা। আমাদের রিপ্লয়মেন্টের চার্টে এটার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল পি. সি. সরকার, তারপর আরো ছোট করে উল্লেখ ছিল পি সি. আমরাই কেবল ক'জনে এটার অর্থ বুঝতাম অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কের দরজার যে ট্রাকে নোটের বাক্স তোলা হবে সেই ট্রাকটি প্রায় দেড় মাইল-দু' মাইল এসে পথে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঐ পি. সি'তে অর্থাৎ আলকাতরার ট্রাকে ঐ বাক্সগুলি তুলে দেবে। ট্রাকটি যেটি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে এল সেটিকে এমন স্থানে রাখা হবে যেটাকে দেখে পুলিশ মনে করবে যে সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে টাকা সরানো হয়েছে। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমরা আলকাতরার গাড়িতে টাকার বাক্স নিয়ে কলকাতার দিকে পাচার করব। যেস্থানে এটি করার কথা ছিল, সেটি ট্রাংক রোড থেকে কিছুটা ভিতরে, একটু ঘুরেই সেই রাস্তাটি আবার ট্রাংক রোডে পড়েছে। পি. সি এই রাস্তা দিয়ে কলকাতার দিকে চলে যাবে। পি. সি টি. চালাবে একজন ড্রাইভার। তার সঙ্গে থাকবে একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট। একেই তো আলকাতরার ভ্যান তারপর মাত্র একজন ড্রাইভার ও একজন তার সহকারী কাজেই কেউ দেখে সন্দেহ করতে পারবে না যে এতে ডাকাতির এক কোটি টাকা বোঝাই আছে। যখন টাকা আলকাতরার গাড়িতে ভর্তি করা হবে সেখান থেকে দশ লক্ষ টাকার বাক্স অন্য একটি প্রাইভেট গাড়িতে তুলে নিয়ে সেটি অনেক আগে বেরিয়ে যাবে, সেটি আর কলকাতার দিকে আসবে না, না এসে বাঁকুড়ার পথে যাবে ও সেই পথে যেভাবে সম্ভব সেটাকে নিরপেক্ষ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা ছিল। দু' লক্ষ টাকার নোট এর থেকে বার করে নিয়ে ট্রেনে কলকাতা অনুগামী কোন যাত্রীকে দিয়ে দেওয়া হবে যেন কলকাতায় নিয়ে আসে। ইন কামিং 'যাত্রী' কোথা থেকে আসছে তাও ঠিক থাকবে এবং সেই 'নিরীহ যাত্রী' বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ওয়েটিং রুমে থাকবে সেখানে তাকে 'দু লক্ষ টাকার একশ' টাকার নোটের প্যাকেট দেওয়া হবে, নিয়ে আসার জন্যে। টাকা পাচার করার এই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা খুব কম লোকই জানতো। পুলিশ প্ল্যানের এই দিকটির সংবাদ শেষ পর্যন্ত পায় নি, বিশেষ করে কলকাতার কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কিভাবে টাকা নিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হবে তার খোঁজ পায় নি। সেই জন্য বিভিন্ন সূত্রে দেখতে পাই পুলিশ প্রচেষ্টা চলেছে আর্মস আর টাকা এই দস্যুরা নিরাপদে কোথায় রেখেছিল। যেমন নাকি

বন্দীমুক্তির উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে কেউ কথা তুলেছিল, কই এখনো তো জানি না টাকা নিয়ে কি কি করেছে বা টাকা কোথায় আছে। এইরূপ বিশেষ ধরনের প্রশ্ন কার মনে এসেছিল এবং কেনই বা তার বা তাদের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আগে বিশেষত অনন্ত সিংকে মুক্তি দেওয়ার আগে জানা প্রয়োজন ছিল যে কোথায় তারা টাকা রেখেছিল, বা টাকা কোথায় আছে, সেই সংবাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। এই থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম কেন এই প্রশ্ন? বিশেষ করে, কেনই বা সেই নেতাকে উপদেষ্টা কমিটিতে বিশেষ এই একটি প্রশ্ন বিচলিত করছিল। তার ঐরূপ অনুসন্ধানের পিছনে বন্দীমুক্তির ব্যাপারটাই কী বিশেষ করে জড়িত ছিল, না লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট যে খোঁজটি পায় নি, সেটি সমাধান করার উদ্দেশ্যে এইরূপ আমার কাছে আরো তথ্য আছে, যা দিয়ে বুঝতে পারি লালবাজার ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্ট এখনো খুব বিচলিত, কোথায় গেল অত লক্ষ টাকা, আর কোথায় আছে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র লুকান এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি, সি. পি. আই. এম এর বিশেষ একজন নেতা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আমাদের সঙ্গে বন্দী ছিলেন। আর অন্যান্য বন্দী যারা তাদের সঙ্গে তিনি খুব সম্ভাব রেখে মিশেছিলেন, সেই মেশায় আন্তরিকতা ছিল, তিনি তাঁদের সবাইকে ভালবাসতেন, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। আলোচনা করতে গিয়ে একজন কমরেডকে তিনি বললেন, 'দেখুন আপনাদের দলের রাজসাক্ষীই বা কেন, আর চারজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিই বা দিল কেন, এটি কখনো ভেবে দেখেছেন কী? তারপর তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় আপনাদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ ছিল না। কৃষক ও শ্রমিকের সংগঠন আপনারা করেন নি, সেই-জন্যই ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং রাজসাক্ষীও হয়েছে। দেখুন আমাদের কাছে পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র সব পার্টি থেকে বেশীই আছে, তবু একটি অস্ত্রও পুলিশ অনুসন্ধান করে আজো পায় নি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টি জনগণের পার্টি······আমাদের কমরেড যখন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই কম্যুনিস্ট নেতার এইসব কথাগুলো আমাকে বলছিল, তখন আমি তার মনোভাব বুঝে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই তাঁর কথায় কনভিন্সড হয়েছ যে সত্যিই তো আমাদের পার্টি জনগণের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং সেই জন্য আমাদের মধ্যে রাজসাক্ষী হওয়া, স্বীকারোক্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তারপরে তাকে বললাম 'সত্যি' কী নয়,

তুমি তাঁর কথায় কনভিন্সড হয়েছে, সে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, তাঁর যুক্তিতে আমি তাই বুঝেছিলাম এবং তার প্রতিবাদ করে আমার বলার কিছু ছিল না সত্যিই তো আমরা 'মাস পার্টি' করে তুলি নি।'

কমরেডটির সততা সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না, তবে এখন খুব ভালই করেই বুঝলাম, তারা আর সি. সি. আই. এর তত্ত্বকথার গভীরতা একটু হৃদয়ঙ্গম করে নি – মাত্র সুপারফিসিয়ালি বুঝেছিল, এবং তাই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতার ব্যাখ্যায় বুঝল আমাদেরটা গণপার্টি নয়, সেইজন্য আমাদের মধ্যে কন্‌ফেশন করেছে ও রাজসাক্ষী হয়েছে। এর জবাব আমাদের কমরেড খুঁজে পেল না, মাত্র চারজন স্বীকারোক্তি দিয়েছে ও দু'জন রাজসাক্ষী হয়েছে, বাকী সব তাহলে হল না কেন? আবার তিনি বলেছিলেন, পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী কম্যুনিস্ট পার্টিতে অস্ত্রশস্ত্র লুকান আছে তার একটিও ধরা পড়ে নি, তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন, যে তাঁদের পার্টি গণপার্টি সেইজন্য। আমার একটি বক্তব্য আছে যদি পুলিশের রিপোর্ট ঠিক হয়ে থাকে যে কম্যুনিস্ট পার্টিতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং তার একটিও ধরা পড়ে নি, তবে কী তা কম্যুনিস্ট পার্টি গণপার্টি বলেই ধরা পড়ে নি? আমার প্রশ্ন হল সেই অস্ত্রশস্ত্র যদি কেউ মাটি খুঁড়ে রেখে দিয়ে থাকে তবে তা ধরা পড়বে কেন? সেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ওাদের ক্যাডারকে গোপনে অস্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা করেছেন কী? তা যদি না করে থাকেন,—কেবল 'কম্যুনিস্টরা বিপ্লবী' শুধুমাত্র জাহির করার জন্য অস্ত্র রেখে থাকেন, তবে সেরূপ অস্ত্র যদি ধরা না পড়ে থাকে তাতে কোন বিশেষ গৌরবের কথা নয়। যদি কম্যুনিস্ট পার্টির এরূপ নজির থাকত যে তাদের অস্ত্র ছিল, অস্ত্র আছে এবং তা নিয়ে তারা রীতিমত গোপনে পার্টির বিশেষ একশ্রেণীর কমরেডদের আমাকে শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন, এবং তখন ধরা পড়ে নি—তবে তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারতাম বা বাহবা দিতাম যে কম্যুনিস্ট পার্টি অন্যান্য পার্টির চাইতে এই বিষয়ে আমাদের অনেক পারদর্শী অনেক অস্ত্র আছে, মাটির নীচে পোতা আছে, কেউ জানে না, কোন কাজেও আসবে না।' আর সেইরূপ অস্ত্র পুলিশ আজো ধরতে পারেনি, তাতে প্রশংসা বা গৌরবের কিছুই থাকে না। আমাদের কমরেডটি এইভাবে সেই কম্যুনিস্ট নেতাকে বলতে পারে নি বা চোখে আঙুল দিয়ে তাঁর ভুলটি বোঝাতে পারে নি।

আমাদের এক কোটি টাকা ডাকাতি করা হবে এটা কেবল ভাবা হয়েছিল তা নয়, এটার সক্রিয় রূপ দেওয়ার জন্য এই যা বললাম, সমস্ত প্ল্যানটি করা হয়।

ডাকাতির স্থান থেকে এক কোটি টাকা এনে আমাদের নিরাপদ ডপেট রাখার পুরো প্ল্যানটি করিয়ে হয়। যেটুকু বললাম, তাতেই কিন্তু সব বলা হল না। কলকাতার উপর দশটি বিভিন্ন বাড়ি ছিল যে প্রত্যেকটি বাড়িতে আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা রাখা হবে তা হলে এক কোটি টাকা রাখার ব্যবস্থা হতে পারে। এই দশটি বাড়ির ব্যবস্থা আলাদা আলাদা ছিল এবং প্রত্যেকটি একধরনের নয়। যেমন নাকি কারুর বাড়িতে লোহার আলমারী আছে তেমন বাড়িতে সুরক্ষিত করে রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আর কারুর বাড়িতে ধরুন তুলসীতলার নীচে টাকা রেখে সেই তুলসী গাছ বাঁধান বেদীর উপরে থাকবে—তার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ ধরনের দশটি বিভিন্ন বাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। তাও সংগঠনের ছেলেরা তা করতে নিযুক্ত হয়নি। যাদের বাড়িতে থাকবে তাদের সাহায্যে তারাই নিজেরা মিস্ত্রি প্রভৃতি দিয়ে ঠিকঠাক করে নেয়। সেইসব বাড়ির সবাই মিলে এই বিশেষ ব্যবস্থাটি করবে না। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি মিস্ত্রি দিয়ে একজন করবে যার হেপাজতে টাকা থাকবে কাজেই প্রত্যেকটি কাজে বিশদরূপে ব্যবস্থা করার মধ্যে অনেক স্তর ছিল স্তর ভেদ করে লোকদের নিযুক্ত করতে হয়েছিল। ট্রেনে করে যে পরিবার বাণ্ডিল করা দু'লক্ষ টাকার নোট নিয়ে আসবে সেই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সবাই বিশেষ কাজের অংশীদার ছিল, দুধের শিশুটিও মায়ের কোলে থেকে পুলিশের চোখে বিভ্রান্তি ঘটাতে পারবে। গেরিলা পদ্ধতিকে রাজনৈতিক ডাকাতি বা কোন বৈপ্লবিক অ্যাকশন করার সময় একটি শিশুরও বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। যেমন নাকি সাধারণ গোরুর বিষ্ঠা ঐ অলংকারের দোকানের সামনে থেকে মানুষদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। আবার যেমন একটি ছড়ি সময়মত পুলিশ ভ্যানের দরজার ফাঁকে দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তেমনি সব ছোট খাট খুঁটিনাটি জিনিস গেরিলা পদ্ধতিতে অ্যাকশনেরও অবহেলা করা যায় না। বুদ্ধিমত সবদিক লক্ষ্য রেখে ডাকাতি করা। তারপর সেই বেষ্টনীর ভিতর থেকে এক কোটি টাকা তুলে নিয়ে আসার মধ্যে যত সব ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব তার সমাধান করে তবেই প্ল্যান করতে হয়েছিল। এত পরিশ্রমের পরে যখন প্ল্যান সমাপ্ত হল, তখন কিন্তু, কমাণ্ডার বললেন যে, তার মনে হচ্ছে সোজাসুজি ডাকাতির পরে কলকাতায় চলে আসার চেষ্টা করতে হবে। কাজেই নিকটতম রাস্তা ধরে আসা উচিত এবং যদি সেই পথে ঐ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের কাছ থেকে বাধা আসে তবে তাকে আমাদের পরাস্ত

করেই আসতে হবে। এই মতটি ফিল্ড কমাণ্ডার দু'মাস আগে দিত তবে তা অনেক সহজে হয়ে যেত। তাহলে আমাদের অরগানাইজেশনের বৃথা সময় ও শক্তিক্ষয় হোত না। আসানসোলের পথে গিয়ে তারপর টাকা নিয়ে আসার জন্য যেরূপ পরিকল্পনা করতে হয় তার জন্যে অনেক সময় লেগেছিল। ব্যাঙ্ক ডাকাতিটি হয়ে যাবার পর যদি লুঠের টাকা নিয়ে আমাদের আসানসোলে যেতে হত, আধ মাইল গিয়ে টামলার ব্রীজটি'র উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না এই ব্রীজটির রাস্তা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে। আমাদের এই পুলটি পার হওয়ার আগে সামনে থেকে কলকাতামুখি গাড়ি যেন সব বন্ধ করে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। এবং আমাদের পথ সুগম করার জন্য স্থানে স্থানে ল্যাণ্ডমাইন প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থাও ছিল। ইতিমধ্যে মানসিক ও শারীরিক দুইভাবে আমরা কমরেডরা টায়ার্ড। তবু প্রয়োজনের খাতিরে যখন করতেই হবে স্থির হল তখন আমরা তাও করেছিলাম। তারপরে সেই ফিল্ড কমাণ্ডার সবটা বিশ্লেষণ করে দেখে বুঝল আমি যে প্ল্যানটি করেছিলাম, অনুসরণ কারী শত্রুর গাড়িগুলোকে পিছনে ফেলে আসার সেই যুক্তিটি মেনে নেয়। আমি যদি আমার যুক্তির জোরে তার মতকে বানচাল করে দিয়ে আমার মতটি গ্রহণ করতে বাধ্য করতাম তবে ফল ভাল হত বলে আমার মনে হয় না। আমি বুঝেছিলাম যে ফিল্ডে কম্যাণ্ড করবে তার নিজের যুক্তিতে তাকে নির্ভুলভাবে বুঝতে হবে তার জন্য জোর করে কোন সিদ্ধান্তে তাকে পরিচালিত করা উচিত হবে বলে আমার তখন মনে হয় নি সেইজন্য তাকে আমি বলেছিলাম, তুমি যা ভাল বুঝছো এবং তুমি যাতে জোর পাচ্ছ সেইভাবেই করো।

আজকে যখন সে তার মত পাল্টাল এবং আমার মতে ব্যাংক থেকে লুঠের টাকা নিয়ে আসবার পথ ঠিক করল তখন আমার নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল। ডিবেটে জিতে গেলাম সেই ভেবে ভাল লাগে নি। এটি ডিবেটের কথা নয়, এটি গেরিলা স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিস-এর বিশেষ একটি মূল কথা—ঘুরে আসা উচিত হবে নাকি সোজা পথে শত্রুদের পেছনে ফেলে আগে বেরিয়ে যাওয়া ? শত্রু আগে গিয়ে পথ অবরোধ করবে সেটি রণকৌশলের ভুল নীতি। সেই জন্য আমি মানসিক উদ্বেগে ছিলাম। আসানসোল ঘুরে তারপর কলকাতা আসার যে নীতি নেওয়া হচ্ছিল তাতে আমার মন কোন মতেই সায় দেয় নি। আমাদের শত্রুর মুখে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল ঘুরে এলে। সেইজন্য আমি সেটি না হোক চেয়েছিলাম।

যদিও এই প্রশ্নের সমাধান শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছিল, তবু তার জন্য দু' মাস আমাদের দেরী হয়ে যায়। সেই দেরী হওয়ার ফলে ছোট ছোট অনেক-গুলো বিভ্রাটের সামনে আমাদের পড়তে হয়, যেমন নাকি কালভার্টের নীচে ডিনামাইট ধরা পড়ে গেল, মাঠের উপরে জঙ্গলের মধ্যে গাদা কামানও আবিষ্কার হল। এইসব বড়বড় আঘাত আকস্মিক ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ঘটে গেল, কিন্তু যা আমাদের চিন্তার কারণ হয়েছিল এইসব ঘটনা সত্যিই আকস্মিক না কি তার পেছনে আমাদের মধ্যে কোনরূপ গুপ্তচর আছে? এইসব প্রশ্নে বিলম্বের কারণ ঘটেছিল বটে, তাছাড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ মিলিটারী ম্যানুয়ালের কথা যে প্ল্যানের পর প্ল্যান যদি বদলান হয় তাতে ক্যাডারদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে এবং তাদের মন ভেঙ্গে যায়। আমাদের বিলম্বের জন্য এই ক্ষতিটি সবচেয়ে বেশী হয়েছিল বলে আমার ধারণা। দুর্গাপুরে এক কোটি টাকা লুট করার অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করছিল, তারা ইতিমধ্যেই প্ল্যানের বার বার পরিবর্তন শুনে ও বার বার নতুন করে নতুন প্ল্যানের রূপ দেওয়ার জন্য নিজেদের নিযুক্ত করার জন্য দলের নেতাদের উপর আস্থা হারিয়েছিল। তারপর যখন পুলিশ ও মিলিটারী গাদা কামান ও ডিনামাইট আবিষ্কার করে খুব সজাগ হয়ে প্রহরীর ব্যবস্থা করছিল, তখন অল্প শক্তি নিয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গাপুর ব্যাঙ্কের এক কোটি টাকা লুটের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল, কার্যে পরিণত করার মতন তখন আমাদের শক্তি ছিল বলে আমার মনে হয় না। অগত্যা ষড়যন্ত্রমূলক পার্টি টেকনিক্যাল অরগানাইজেশনের যে প্রচুর মাসিক খরচ তা মেটাবার জন্য আর একটি ডাকাতির জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হচ্ছিল।

এই কারণে যদি কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা কেউ আমাদের ডাকাতের দল বলে থাকে তবে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কী। ডাকাতির পরে ডাকাতি আমরা করেছি ;তার সত্যি কারণ দেখাতে গেলে দেখাতে কী পারব যে, সেগুলো আমাদের মারাত্মক গাফিলতির জন্য ছাড়া আর কোন বিপ্লবী প্রোগ্রামের জন্য ঘটেছিল?

কেন আমরা এক লক্ষ টাকার একটা বড় থলি পোস্টাল ভ্যানে ডাকাতি করার সময় ফেলে এলাম? কেন আমরা ডাকাতি করার ইমিডিয়েট পরেই আগে থেকে যা স্থির করা প্রোগ্রাম ছিল তা নিয়ে কাজ শুরু করলাম না? ডাকাতির পরে কেন আমাদের নতুন করে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হয়েছিল? যদি আমরা সত্যিই—'কেন ডাকাতি করতে যাচ্ছি

যা করছি' সেটি না বুঝেছিলাম তবে ডাকাতির পূর্বে কেন সেই কথা তুলে আগে সমাধান চাই নি। না বুঝে ডাকাতি করার কোন নৈতিক অধিকার কি আমাদের ছিল? তবে কিন্তু কমাণ্ডার যখন কিসের জন্য ডাকাতি এবং ডাকাতির পরে যে টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম আগে বার বার দেখেছেন ও শুনেছেন সেলে বার বার ঐ সব কমরেডকে জানান হয়েছে, তখন কেন তিনি তা ভুল বলে বাধা দেন নি। আমি যখন ঐ সব কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করেই টেকনিক্যাল প্রোগ্রামের রূপ দিতে পরিকল্পনা লিখিতভাবে উপস্থাপিত করলাম তখন সেই প্রোগ্রাম বানচাল করে গিয়ে—আমি আগে ভাল করে দেখি নি। এবং ঐ সব শুনি নি তাই আমাদের এখন নতুন করে সমীক্ষা করে দেখতে হবে কী ভাবে আমরা কী নতুন সময়োপযোগী কর্মসূচী নেব'। এই ভাবে কিন্তু কম্যাণ্ডার নতুন করে ডাকাতির পরে পর্যালোচনা করে কর্মসূচী স্থির করতে চাইছিলেন। আমার এটি খুবই খারাপ লেগেছে, আমার মনে সব সময়ই একটি কথা বার বার আঘাত করছিল না বুঝে এবং অতিনিশ্চয় রাজনীতির প্রয়োজন ছাড়া ডাকাতি করার আমাদের অধিকার নেই, তবে কেন তা না বুঝে কমরেডরা সমর্থন করল?

এই সভা আমাকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করেছিল যখন দেখি একজন ছাড়া সবাই কিন্তু কম্যাণ্ডারের বক্তব্য সমর্থন করল। আমি একমাস কলকাতার বাইরে ছিলাম চোখ অপারেশনের জন্য। ভাবতে লাগলাম এই একমাসেই কী অঘটন ঘটল যার জন্য সবাই আজ ভাবছে টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম যেখানে আছে সেখানেই থাক, সেটিকে সেখানে রেখে আমাদের গণফ্রণ্টে গিয়ে কাজ করা উচিত। গণফ্রণ্টে গিয়ে কাজ অনেক আগে থেকেই শুরু করতে পারতাম এবং শুরু করতাম আমাদের টেকনিক্যাল অরগানাইজেশনের কাজ গুছিয়ে নিয়ে। আমাদের লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি সক্রিয় স্প্রীং বোর্ড প্রস্তুত করাটা প্রাথমিক কাজ হিসাবে নিয়েছিলাম। এই মূল কথাটি না বোঝার কোন কারণ ছিল না। বছরের পর বছর আমাদের অতিবাহিত হয়েছে, আমরা তেমন কোন কাজ করিনি। কাজ করতে হলে কোন একটি পার্টির সঙ্গে থেকে গণফ্রণ্টে কাজ করতে হত। সমীক্ষা করে আর. সি. সি. আই. বুঝেছিল পঞ্চাশ বছরের অধিক সি. পি. আই. এম. যে পদ্ধতিতে গণফ্রণ্টে কাজ করে এসেছে তার রেজাল্ট যা দেখছি তাই হবে। তার বেশী আর কিছু হবে না। হো চি মিন্-এর মত সংগঠন করতে সি. পি. আই. এম-এর নেতৃবৃন্দ কোন কালেই

প্রস্তুত ছিলেন না। যখন 'পিপিল্‌স ওয়ারের কর্মসূচী নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি চলছিল তখন তাদের কেবলমাত্র পিপিল্‌স থিয়েটারের কর্মসূচী নিয়ে থাকা কোন মতেই উচিত হয় নি। তাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল পিপিলস্‌ ভলেন্টিয়ার্স গঠন করা। এই কাজটি তারা করেন নি। এই মানসিকতা নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃবৃন্দ কাজ করে এসেছেন। আজ তবু সে পশ্চিম বাংলার সব চেয়ে বড় ও শক্তিশালী পার্টি তার একমাত্র কারণ জনগণ কম্যুনিজমকে ভালবাসে। অন্ধকারে জনগণ হাঁতড়ে বেড়াচ্ছ, ভরসা খুঁজে পাচ্ছে না বলে কম্যুনিস্ট নামটা শুনে তারা ভোট দিয়েছে, বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা করে দেখার মত শক্তি জনসাধারণের নেই। জনগণের নেতারা তাদের কাছে কম্যুনিস্ট নামটা খুবই একসপ্লয়েট করতে সমর্থ হয়েছে, এতে অন্যায় কিছুই নেই। তবে ওদের পক্ষে চিন্তা করতে হবে জনগণ ইমারজেন্সীর সময় তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল আর তারা ইমারজেন্সীর সময় নিজের দল বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব জায়গায় হাত বাড়িয়েছিল। এটাও কম্যুনিজমের ভুল নীতি নয়। তবে ভুল নীতি হচ্ছে এই জনগণকে যদি সত্যিকার মিলিটেণ্ট অরগানাইজিশনে সংঘবদ্ধ করতে হয় তবে পার্টির এক অংশকে সেই মত প্রস্তুত হতে হবে এবং সেইভাবে দূরদৃষ্টি রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের ভারতে কম্যুউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী সেই ভূমিকা কোনদিনই পালন করে নি।

২২
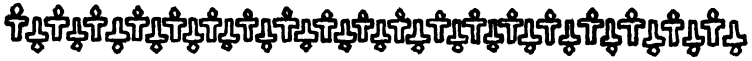
জনগণই আমাদের শক্তি। জনগণকে বাদ দিয়ে আমরা কোনমতেই কোন বিপ্লব ভাবতে পারি না। বুর্জোয়ারা তাদের নিজের স্বার্থে কৃষি বিপ্লব সমাধান করবেই, তাই বুর্জোয়াদের এই স্তরের একটি বিপ্লবী ভূমিকা থাকেই। কৃষি বিপ্লব হয়তো বুর্জোয়া নেতৃত্বে সমাধান হয় নতুবা তা সমাধান হয় শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব অনেক আগে ও ভালভাবে সমাধান হতে পারে। কৃষি প্রধান দেশে যেখানে কৃষি বিপ্লব হবে সেখানে কৃষকদের ভূমিকাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু কেবল কৃষকদের হাতে সেই নেতৃত্ব ছেড়ে রাখলে চলবে না। কৃষকরাই কেবল তার সমাধান করতে পারবে না, তবে সমাধান হবে বুর্জোযা নেতৃত্বে অথবা সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে। আর. সি. সি. আই যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অসাধ্য সাধন করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তার মধ্যে তাদের প্ল্যানে কেবল ডাকাতিই ছিল না, ডাকাতিটি তাদের আদর্শ প্রোগ্রামকে রূপ দেওয়ার জন্য একটি 'মিনস্' (উপায়) মাত্র ছিল।

প্রশ্ন হল আর. সি. সি. আই.-এর আদর্শ প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করার জন্য ডাকাতি ছাড়া কী চলত না? সময়, কাল, পাত্র বিবেচনা করে তবেই কী ডাকাতি করা স্থির হয়েছিল? সমাজ বিজ্ঞানে সংগঠনের জন্য টাকা প্রয়োজন এবং সেই টাকা কী ডাকাতি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার নজির আছে? এই সব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে আমরা সময়, কাল, পাত্র বিবেচনা করে সাময়িক ডাকাতির পথ গ্রহণ করা সঠিক মনে করেছিলাম।'

বৈপ্লবিক কাজে যে অর্থের প্রয়োজন তা কৃষক ও শ্রমিকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তক্ষুনি হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি কখনো বৈপ্লবিক কাজের প্রশস্ত প্রস্তুতির জন্য শ্রমিক ও কৃষকের কাছ থেকে

চাঁদা তুলতেন না। এতে কম্যুনিষ্ট নেতাদের মানসিক জড়তা ছিল। এই কারণে আমাদের পঞ্চাশ বছরের কম্যুনিষ্ট পার্টির যে ধরনের অবৈপ্লবিক গতি তাই অনুসরণ করে বসে থাকতে হয় নইলে সেইরূপ অবৈপ্লবিক নিক্রিয়তার বিরুদ্ধে আমাদের সক্রিয় বৈপ্লবিক পথ অনুসরণ করতে হয়। এই একটি মাত্র বিশেষ পয়েন্ট নিয়ে আমাদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করি ও সিদ্ধান্ত করি যে গণসংগঠন যেভাবে গড়ে তোলা কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে অপরিহার্য ঠিক সেইরূপ গণ-সংগঠনের ও গণ-অভ্যুত্থানের সফলতার জন্য প্রাথমিক প্রশস্ত বৈপ্লবিক সংগঠনও তাদের হাতে থাকা উচিত। এই কথা আমার নয়, ছত্রে ছত্রে বইয়ের পাতায় বিপ্লবী মহানায়ক লেনিন এই কথাটি বার বার জোর করে বলেছেন যে, রাতারাতি 'সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠন' তৈরী করা সম্ভব নয়। সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে রাখতেই হবে এবং তা ঠিক সময় মত যেন কাজে লাগে সেইজন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। জনগণ বিপ্লবে অংশগ্রহণ না করলে যেমন বিপ্লব সফল হয় না, ঠিক তেমনি জনগণের হাতে ঠিক সময় যদি প্রাথমিক অস্ত্র ও সামরিক সংগঠন না থাকে তবে তাতেও বিপ্লব সফল হওয়া সম্ভব নয়। এই থেকে বুঝতে হবে যে আমাদের দুটি কাজেরই অতি মাত্রায় প্রয়োজন ছিল। একদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির গণসংগঠন ও অপর দিকে তাদের সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী কোর প্রস্তুত থাকা সর্বতোভাবে উচিত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে নিয়ে চলা যায় না। গণফ্রন্টের উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাল রেখে সময়োপযোগী কম্যুনিষ্ট মিলিটেন্ট আর্মড কোর থাকতেই হবে—এই হচ্ছে লেনিনের দৃঢ় মত।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সশস্ত্র কোরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কখনো পার্টিতে আলোচনা করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেন নি। পার্টির নেতাদের গোপন সিদ্ধান্ত, ট্রেড ইউনিয়ন কর, কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন কর, কিন্তু তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম আনতে হবে সেই কথাটি কখনো জানিও না। কৃষক ও শ্রমিকরা যদি পরিষ্কারভাবে জানতো যে তাদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতেই হবে, তখন তাদের সংগঠনের বিশেষ রূপ কী নিতে হবে তা তারা ঠিক করার জন্য চেষ্টায় থাকত, অন্তত কনসাস ক্যাডাররা প্রয়োজন অনুপাতে সংগঠন করার জন্য চেষ্টা করত। পার্টির নেতারা তাদের সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন। কৃষক ও শ্রমিকদের যদি ভয়াবহ আধুনিক সমরবিজ্ঞান ও সরকারের সমরশক্তির কথা জানান হয় তবে তারা ভয় পেয়ে যাবে, এবং সেই

কারণে তাদের এ-বিষয়ে কিছু জানান না হোক, এইরূপ ধারণা নিয়ে কম্যুনিষ্ট নেতাদের কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন করা আত্মহত্যাতুল্য। আধুনিকতম সামরিক অস্ত্রের ধ্বংস-ক্ষমতা ও সরকারের সামরিক শক্তির প্রবলতা কত ব্যাপক তা গোপন রাখার কথা ওঠেই না। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা উচিত এবং তাদের জানা উচিত এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে আমাদের জয়ী হতে হবে। লেনিনের সমাজবিজ্ঞান সংগ্রাম বলতে কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেন নি, লেনিন স্বীকার করে নিয়েছেন, সবরকম সংগ্রাম, তাতে অসহযোগ আন্দোলনও বাদ পড়ে না। কোন সময় কী রকম সংগ্রামের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে, তা তাদের মার্কসবাদী লেনিনবাদীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হবে।

আমি যেমন বললাম, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে গ্রহণ করতে হবে, তেমনি বিভিন্ন নেতা ও বিভিন্ন পার্টি বলে থাকেন, এবং প্রত্যেকেই মনে করেন তিনি যে নীতি যে ষণা করলেন সেটিই সর্বাপেক্ষা সঠিক নীতি. তিনি যা বুঝেছেন ও যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন সেটিই ভূমণ্ডলের একমাত্র সঠিক নীতি। আমার বিশ্লেষণে এইটুকু দাঁড়ায় যে আমি আমার মানসিকতা দিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করি, তারই প্রভাবে আমি থাকি এবং থাকতে বাধ্য হই। সেই প্রভাব থেকে আমি অন্যের কথায় কোনদিনই মুক্তি পেতে পারি না, কারণ আমার ইগো আমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমাদের ম্যানুয়াল-এ লেখা ছিল—(১) ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে, (২) অহম্ ভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে, (৩) চরম স্বার্থ ত্যাগের জন্য চিরকাল প্রস্তুত থাকতে হবে।

অহম্ ভাব ছাড়তে হবে, এই অহম্ ভাবই আমাদের আত্মঘাতী শত্রু. মাও সে তুঙও লিখেছেন প্রত্যেক বিপ্লবী নেতা তাদের স্ব স্ব গণ্ডীতে ভাবেন তিনিই যা বুঝেছেন তাই বৈপ্লবিক তথ্যের ধ্রুব সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার থেকে আর কেউ বেশী বোঝে না। প্রতিদিন মাও সে তুঙের এই কথা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই—সবাই সবার মত বানান তবু কিন্তু রুশ দেশে সর্বহারা বিপ্লব সফল হয়েছিল। তবু কিন্তু চীনদেশে সর্বহারা ও তার পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হয়, এই সফলতার গভীরে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে রুশদেশে লেনিনের বৈশিষ্ট্য ও চীনদেশে মাও সে তুঙের কর্ম ধারার বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের মূল দিকটি হল তারা কেবল মুখে বলেন নি, সেইরূপ একটি সঠিক তথ্য প্রয়োগ

করে সফল বিপ্লব নিজের দেশে এনেছেন। রুশ দেশেও বহু পার্টি ছিল, রুশদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত ছিল কিন্তু সেইসব ছোট ছোট উপদল বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু সব বাধা চূর্ণবিচূর্ণ করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কম্যুনিষ্ট) পার্টি বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছে। চীনদেশের বহু ছোট ছোট দল-উপদল ছিল, তারা কখনো একমত হয়েছেন কখনো ভিন্ন ভিন্ন মতে ছড়িয়ে পড়েছেন তবু তাদের বাধা সত্বেও মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনদেশের বিপ্লব জয়যুক্ত হল। লেনিন ও মাও-এর নেতৃত্বে শক্তির বিশেষ উৎস কোথায় ছিল বা সেটি কী তাদের কথায় যা বুঝেছি সেটি হল মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় লোকও যদি দৃঢ় বৈপ্লবিক নীতিতে সুসংগঠিত নেতৃত্ব দেয় তবে সেই নেতৃত্বও সফল বিপ্লব ঘটাতে পাবে।

কোন তথ্যই নির্ভুলভাবে আমাদের দেশে প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে কোন দল তাদের থিসিস কার্যে প্রমাণ করবে না। আমি যে চেষ্টা 'আওয়ার স্ট্যাণ্ড'-এর সময় করেছিলাম বা যে চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম আর. সি. সি. আই. সংগঠনে তা প্রমাণ করতে পারিনি, কাজেই আমি আমার কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার নীতি ও কৌশল যে নির্ভুল তা বলতে পাবব না। তাই বলে এটাও নিশ্চয় বলব না যে পঞ্চদশ বছরের অধিক যে কম্যুনিষ্ট পার্টি একই স্থানে দাঁড়িয়ে মার্ক-টাইম করছে সেটাও ঠিক। ময়দানে দশ লক্ষ লোক মিটিং-এ জড় করতে পারে বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা বাংলাদেশে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হয়েছেন তাই বলে তাদের বৈপ্লবিক নীতি নির্ভুল তাও আমি স্বীকার করতে রাজী নই। এই থেকে বুঝবেন না যেন আমি বলছি তাদের এই জয়ের কোন মূল্য নেই, আমি এও বলছি না যে এই পথে তাদের কাজ করে যাওয়াটা ভুল হয়েছে। এই ধরনের কাজ আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করি কিন্তু এটাই যে সব নয়; তার পরেও লেনিনবাদ বলেছে আমাদের আখেরী সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবেপ্রস্তুত থাকতে, সেইটির প্রচেষ্টা না দেখলে কম্যুনিষ্ট লেবেল লাগিয়ে গণপার্টি হলে সেই পার্টি বিপ্লব সফল করবে, সেইরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি থাকতে চাই না। বৃটিশ লেবার পার্টি যে পদ্ধতিতে কাজ করে যান, সেই পদ্ধতি লেবার মুভমেণ্ট পরিচালনা করাব পথ হলেও সর্বহারার বিপ্লব-এর পথ নিশ্চয় নয়। সফল লেবার মুভমেণ্ট-এর জন্য যেভাবে শক্তি ও সংগঠন করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, সেরকম সংগঠনের গোড়াপত্তন হওয়া উচিত।

কেবলমাত্র শক্তিশালী লেবার ইউনিয়নই ক্ষমতা দখলের জন্য যথেষ্ট নয়, অনেক শক্তিশালী লেবার ইউনিয়নকেও সরকার তার আধুনিক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিনষ্ট করতে পারে। কাজেই লেবার ইউনিয়নই আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের শেষ লক্ষ্য হল সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মুক্তি। ডাইরেকটিভ বডির পরিষ্কার ধারণা চাই, সর্বশেষ বিপ্লবী রিকোয়ারমেণ্টস কী এবং সেই লক্ষ্য রেখে লেনিনের কথা অনুযায়ী তাদের সমস্ত পার্টিকে প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে। তাই লেনিনের কথামত বর্তমানের কাজগুলোকেও এমনভাবে সাজাতে হবে যা ক্রমে ক্রমে অবস্থানুযায়ী কার্যকরী হতে পারে। অর্থাৎ লেনিন বলতে চাইছেন মুখে কেবল বিপ্লব বিপ্লব বলে চেঁচালে হবে না, তার জন্য তোমার বর্তমান পদক্ষেপের সঙ্গে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা চাই। আমি সেই দেখে যাচাই করি যে সি. পি. আই. এম. সত্যি কী লেনিনের স্টেট এণ্ড রেভলিউশন গ্রন্থের শিক্ষাটি গ্রহণ করেছেন? সি. পি. আই. এমের নেতারা কী ভবিষ্যতে অট্টালিকা তৈরী করবেন? আর তাই যদি করেন তবে আজ তাদের কর্মসূচীতে কাঠ খড় কুটো দেখতে পাই কেন, কেন দেখি না লোহার বিম্ বর্গা, ইট, সিমেণ্ট প্রভৃতি? মনে দারুণ প্রশ্ন জাগে।

গণ-সংগঠনের প্রোগ্রাম সংগঠনেই নিবদ্ধ থাকবে আর তার বিশেষ কোন প্রসপেকটিভ থাকবে না তা কোন মতেই হতে পারে না। এই গণ-সংগঠন ভবিষ্যতে কী করবে, কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে সে আমরা এইরূপ ভাবে চিন্তা করেছিলাম এবং বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম বর্তমানের পদক্ষেপ কী রকম হবে। ভাল কথা, তাই বলে কী পদক্ষেপ কেবল ডাকাতি হবে, তা হবে কেন, নিশ্চয়ই তা হবে না। তবে আমরা ডাকাতি ছাড়া বিশেষ কোন পজিটিভ অ্যাচিভমেণ্ট দেখাতে পাচ্ছি না কেন, এই জন্য আমাদের তথ্যকে ভুল বললে চলবে না। নির্ভুল তথ্যের নির্ভুল অ্যাপ্লিকেশন হয়নি, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সেইজন্য আমরা কাকে দায়ী করব? সেইজন্য নিজেদেরই দায়ী করতে হয়। কেন নির্ভুল পদক্ষেপ দিতে সক্ষম হলাম না, কেন ক্যাডাররা নির্ভুল নীতি গ্রহণ করার পরে নিজেদেরকে প্রস্তুত করল না। সেইজন্য আমি কী ক্যাডারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেব? স্বীকার করছি সব দোষটাই আমার। আমি কেন সে-সব ক্যাডারসকে আমার কাছে সিলেক্ট করে নিয়ে এলাম, তাদের কেন বাদ

দিলাম না, আর যদি বাদই দিলাম না তবে তাদের পুরোপুরি তৈরী করা হল না কেন? কেন এই প্রচণ্ড দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কাজেই সব দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি, আমাদের থিসিস্ ভুল প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ যেরূপ উপযুক্ততাসম্পন্ন ক্যাডারদের নিযে এই সংগঠন ভাষা হয়েছিল সেইরূপ ক্যাডারস না পাওয়ার আগেই সংগঠন শুরু করা। স্পষ্ট বোঝা উচিত ছিল, অনুপযুক্ততা নিয়ে এই সংগঠনের গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সেই মারাত্মক ভুলের মাশুল আমাদের দিতে হযেছিল, আমাকে দিতে হয়েছিল।

অনুশোচনা করে এখন কোন লাভ হবে না। যা দেখেছি ও যা ঘটেছে তা বলেই এখানকার বক্তব্য শেষ করতে হবে।

দুর্গাপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ থেকে এক কোটি টাকার ডাকাতির বিরাট ব্যাপক পরিকল্পনা আমাদের পরিহার করতে হল কেবল নিজেদের দোষে। গাফিলতির পর গাফিলতি; দ্বিধাগ্রস্ত মনে ইতস্ততা আর বৈপ্লবিক দায়িত্ব ও জ্ঞানের উপলব্ধির অভাবই শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাটি পরিহার করার মূলে ছিল। পুলের নীচে ডিনামাইট, মাঠের জঙ্গলের মধ্যে গাদাকামান আবিষ্কার হওয়ার পর পুলিশ ও মিলিটারী সচকিত হয়ে উঠল এবং তাদের তৎপরতা যেভাবে বেড়ে গেল তাতে বাধ্য হয়ে আমাদের বিপ্লবী ক্যাম্প সেখান থেকে গোটাতে হয়। কতদিন কত মাস এই ব্যাপারে অতিবাহিত হয়েছে, কত অর্থ এতে খরচ হযেছে, কত শক্তি এর পেছনে দিতে হয়েছে, তারপর যখন এই প্ল্যানটি পরিহার করা হল তার কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ক্যাডারদের মনে দেখা দিল, সেই অবস্থায় ডিসিপ্লিন রাখা শক্ত হয়ে পড়েছিল। দলের মধ্যে অরাজকতার মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল, কোন কোন ছোট গ্রুপে অতি তীব্র আকার ধারণ করে। এই দেখেও এর প্রতিকার করার কিছুই ছিল না। তবে উপরে সামগ্রিক সংগঠনের মধ্যে চাপ উপলব্ধি করি যে প্রতি মাসে অনেক খরচ মেটাতে হবে অগত্যা আবার ডাকাতি। এইভাবে আমরা ডাকাতির পর ডাকাতি করে ভীসাস সারকেলে পড়ে গেলাম। যেন এই থেকে আমাদের মুক্তি নেই। কার্যত দাঁড়াল যেন ডাকাতির জন্য ডাকাতি করে যেতে হবে। সবই বুঝতে পারছিলাম শেষসীমায় এসে মোড় ফেরান সম্ভব ছিল না। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গাপুরের আস্তানা থেকে কলকাতায় ফিলে এল। এখন তারা ইচ্ছে করলে যে কোন একটি ডাকাতি কলকাতা শহরে সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে

করতে পারে। প্রস্তুতির আগে টার্গেট ঠিক থাকা উচিত। টার্গেট ঠিক হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রাসেল স্ট্রীট ব্রাঞ্চ। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এই ব্যাঙ্কটি দিনদুপুরে ডাকাতি করা খুবই দুষ্কর। তবু সেটিকে লুঠ করার জন্য বিপ্লবীরা প্ল্যান ঠিক করতে লাগল।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এই ব্রাঞ্চ অফিসে এক কোটি টাকা কোনদিনই থাকত না, মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা থাকত, খুব বেশী হলেও পনের-বিশ লক্ষ টাকার বেশী থাকত না। তা-ও পাওয়া যাবে তেমন কোন ভরসা ছিল না, হয়তো দেখা যাবে পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা মাত্র পেয়েছি. কিন্তু 'ত্রিদিং স্পেসে'র জন্য ছয় লক্ষ টাকা হলেও আমাদের সেই ডাকাতিটি সম্পন্ন করতে হবে, নইলে পার্টির ভাণ্ডার শূন্য হতে চলেছে। আমাদের যে প্রত্যেক মাসের খরচ তা বজায় রাখতে হলে এবং সেই সঙ্গে যদি কলকাতা আপ সার্চের জন্য প্রাথমিক ভাবেও আমাদের গেরিলা প্ল্যান করতে হয় তবে এক কোটি টাকা অপরিহার্য। তাই দেরী না করে রাসেল স্ট্রীটের ব্যাঙ্কটির উপর আমাদের আক্রমণ চালিয়ে যে কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়া যায় তা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

অফিস টাইমে যখন সশস্ত্র পুলিশ ভ্যান ক্রমাগত টহল দেয়, তখন নিরাপদে এই ডাকাতিটি করতে হলে প্ল্যানের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল যেন ডাকাতির সময় এই চত্বরে কোন পুলিশ ভ্যান ঢুকতে না পারে। সেই জন্য চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের মুখে ও সদর স্ট্রীটের মুখে আমরা বিভিন্ন ধরণের ডিলে অ্যাকশনের টাইম বোম ও সঙ্গে ল্যাণ্ডমাইন ও ইনসিনদিয়ারী বোম দিযে বিস্ফোরণ করে সব গাড়ি আটক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আবার পূর্ব দিক দিয়ে যেন কোন গাড়ি ঢুকতে না পারে সেইজন্য একটি ট্রাকটিক্যাল রাস্তার মুখে বোম বিস্ফোরণে গাড়ি আটক করার জন্য ব্যবস্থা রেখেছিলাম। সদর স্ট্রীটের দক্ষিণ দিক দিয়ে যেন কোন মিলিটারী গাড়ি বা কোন পুলিশের ভ্যান ঢুকতে না পরে তার ব্যবস্থাও করেছিলাম। সেইজন্য চৌরঙ্গী থেকে যে গাড়ি মিডল্টন রোডে এসে ঢুকবে তাকে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণের সম্মুখীন হতে হবে। আবার মিডল্টন রোডে ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে কোন পুলিশ বা মিলিটারী গাড়ি এসে বিভ্রাট ঘটাতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণ ব্যবস্থা আমরা রাখি। এই চারপাশে বিস্ফোরক দ্রব্য ও ল্যাণ্ডমাইন, ল্যাণ্ড টর্পেডো প্রভৃতি দূর থেকে ইলেকট্রিকের সাহায্যে ফাটাবার ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে এই পার্ক স্ট্রীটের স্থানে যেসব কম্যাণ্ড নিযুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন

ও ব্যাঙ্কেব সঙ্গে সেই কমিউনিকেশনের যোগাযোগ রাখার ভাল ব্যবস্থা ছিল। ডাকাতির সময আমাদের একটি লরী যেটা লোহার বর্ম দিয়ে ঘেরা থাকবে, সেইটি সদব স্ট্রীটেব ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে থাকার কথা ছিল। যে কমরেডটি সেই 'আর্মড ট্রাকটি' সেখানে নিয়ে যাবে ও চালাবে সে বেশ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় কমরেড। ওবই গাড়ি ব্যবহাব করা হত বিপদ সন্ধিক্ষণে, অর্থাৎ যদি পার্ক স্ট্রীট মোড়ে বিস্ফোবণ হওযা সত্ত্বেও পুলিশ বা মিলিটাবী ভ্যান এদিকে ছুটে আসত তবে এই গাড়িব লোহাব প্লেটেব পেছনে থেকে আমাদেব কমবেড রাস্তা থেকে লাফিযে উঠে পুলিশ ভ্যান ও মিলিটাবী গাড়ীকে লক্ষ কবে ফাযাব কবত এবং এই ভ্যান থেকে ল্যাণ্ড টর্পেডো ছোঁড়ার ব্যবস্থাও বেখেছিলাম। সদব স্ট্রীটেব মুখে যেখানে গাড়ি পার্ক কবে সেদিকে লরীটিও ঠিক সময় গিয়ে পার্ক কবাব কথা। তাই সে সেভাবে পার্ক কবে। কিন্তু তবু পুলিশ সেটাকে সেখানে কোনমতেই পার্ক করতে দেবে না কেননা লরী পার্ক কবার জায়গা সেটি নয়। প্রাইভেট গাড়ি সেখানে থাকে এবং সেখানে প্রাইভেট গাড়িতে ভর্তি ছিল। যে গাড়িতে ডাকাতি হবে সেই গাড়িটি একটি পিকআপ ভ্যান জাতীয গাড়ি ব্যবহাব কবাব জন্য বন্দোবস্ত করে নিই আব দুটি প্রাইভেট গাড়ি সেখানে নিযে গিযে বাখা হবে তাও ঠিক করে নিই। সময় ঠিক কবা ছিল কোন গাড়িটি কোন সময় কোথায যাবে। সেই অনুপাতে গাড়িগুলি ডাকাতিব একটু আগে সেইসব জাযগায গিযে উপস্থিত হল। ঠিক জিরো আওযারে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গিয়ে ব্যাঙ্কেব দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল। ডিসেম্বব মাসেব দশ তারিখে দশটার সময উপস্থিত হয, কারণ সেইদিন একটি বিরাট ফুটবল ম্যাচ ছিল। আমবা ধরে নিয়েছিলাম পুলিশ ও পাবলিক সেই ম্যাচে নিবিষ্ট থাকবে এবং সেইটিই হবে আমাদেব বেশ সুবিধাব সময়। আক্রমণের দিনক্ষণ আমরা এই ভিত্তিতে ঠিক করি।

দুর্গাপুরে ডাকাতির সময় আমবা আমাদের ঘোষণাপত্র বিলি করতাম এবং ঘোষণাটি রেডিও ট্রানজিস্টারের লাউড স্পীকাবের মারফত বলতাম। কিন্তু দুর্গাপুব ডাকাতিটি যখন হল না তখন আজো আমরা ঘোষণাপত্র দেব না এবং আজো আমাদের মত, পথ ও আদর্শ পাবলিককে জানাব না, তা হতে পারে না। সেইজন্য সেই ঘোষণাপত্র আমরা এই ডাকাতিটিতে সম্পাদনা করব বলে ঠিক করেছিলাম। প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে ঘোষণাপত্রে আবার ছাপান হয় এবং সেই ঘোষণাপত্রটি দ্বৈতকণ্ঠে রেকর্ড করান হয়—একটি ছেলের কণ্ঠ ও

অপরটি মেয়ের কণ্ঠ। এই ডাকাতি চলার সময় এই ঘোষণাপত্র বাজিয়ে শোনাবার জন্য টেপরেকর্ডার মেশিনটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লাউড স্পীকারের ম'রফত টেপরেকর্ডারটি বাজাবার জন্য টেপরেকর্ডটি ব্যাঙ্কের দরজায় রেখে সুইচ টিপে দেওয়া হয়। এই টেপরেকর্ডারটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের উর্ধ্বে বাজে এবং ঘোষণাপত্রটি এই টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে পুরো শোনা যায়। ছাপান ঘোষণাপত্রও তারা সঙ্গে করে নিয়েছিল, যখন ডাকাতি চলবে তখন টেপরেকডারটি বাজাবে এবং ঘোষণাপত্র ব্যাঙ্কের বাইরে ভিতরে এবং রাস্তায় ছড়ান হবে—এই রকম ঠিক ছিল। সেইমত তারা প্রস্তুত হয়ে সেখানে যায়। টেপরেকর্ডারের স্যুইচটি অন করে দিয়ে তারা ভেতরে ঢুকল। রাস্তার উপরে ব্যাঙ্কের সামনের গেটে যে দারোয়ান ছিল সে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়, তার বন্দুকটি তারা তুলে নেয়। ভিতরে গিয়ে তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছিল এবং ব্যাঙ্কের সবাইকে চুপ করে বসে থাকার নির্দেশ দিচ্ছিল গোলমালের মধ্যে নির্দেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। ভল্টের সামনে ভিতরের দারোয়ান তার বন্দুক হাত থেকে ফেলে নি, অগত্যা সেও গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল, তার বন্দুকটিও তুলে নেওয়া হয়। যাদের ওপর নির্দেশ ছিল তারা কাউন্টারের ভিতরে ঢুকল এবং টাকার বাক্স টেনে বার করে নিয়ে এল। কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এল না। সব কাজটি সমাপ্ত করতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগেনি, তারা টাকার বাক্স নিয়ে সামনের ভ্যানে উঠল। কিন্তু বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় কমরেড যে আমাদের আর্মাড কার চালাচ্ছিল তাকে ট্রাফিক পুলিশ প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় তার গাড়ি পার্ক করতে নিষেধ করায় সেই নিয়ে তার সঙ্গে বচসা হয়। পুলিশ তার লাইসেন্স দেখতে চায়, সে তার লাইসেন্স পুলিশকে দেখাচ্ছিল এমন সময় পুলিশ তার হাত থেকে লাইসেন্সটি ছিনিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে ডাকাতি শুরু হয়ে যায় রিভলবার পিস্তলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ব্যাঙ্কের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় তাও শোনা যাচ্ছিল। কাজেই পুলিশ সরে পড়লে আর আমাদের কমরেডও ভয়ে শংকিতচিত্তে লরী পরিত্যাগ করে চলে গেল। তারপরে তার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয়নি। অনেক পরে জানা গিয়েছিল সে পাকিস্তানে চলে গেছে।

২৩

আমাদের কমরেডরা ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে লুটের টাকা নিয়ে এসে ভ্যানে উঠল। ব্যাঙ্কেব ভিতর তারা ঘোষণাপত্র বিলি করেছে, লাউড স্পীকারে তখনো ট্রানজিস্টারে ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল। ব্যাঙ্কের গেটের দারোযান আত্মরক্ষার জন্য আহত অবস্থায় কোথাও চলে যায়, ভেতরের দারো-যানের সেখানেই মৃত্যু হযেছিল। সবাই এসে ভ্যানে ওঠার পরে ভ্যানটি ছুটি প্রাইভেট গাড়ির নির্দেশ অনুসারে সদর স্ট্রীটের দক্ষিণ দিকে গিয়ে মিডলটনে পড়ে। তারপর বামদিক ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে সেটি উধাও হল। পুলিশ বা মিলিটারী কোন গাড়ির সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি।

পথে এক স্থানে কেবল টাকা নিয়ে ছু'জন উডবাইণ্ড রোডে আমাদের একটি প্রাইভেট গাড়িতে গিয়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়ার সময় নার্ভাসনেসের জন্য দশ হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল পথে ফেলে দিয়ে গেল, তুলে নেওয়ার ভরসা হয়নি যদি দেরী হয় এবং তাড়া করে পুলিশ বা মিলিটারী বাহিনী এসে ধরে ফেলে, সেই ভয়ে পড়ে যাওয়া টাকার বাণ্ডিলটি তুলে নেয়নি। না নিয়ে চম্পট দেওয়া সাব্যস্ত করেছিল। টাকা সরানোটোই কেবল কথা ছিল তা নয়, যেসব অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয় তাও তিনভাগে ভাগ করে তিন জন কমরেডের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, প্রাইভেট গাড়ি, রিক্সা ও হেঁটে যাওয়া পথ নির্দেশ দেওয়া ছিল। মোট হিসাব নিলে দেখা যায় আশাহত হয়ে দুর্গাপুরের শিবির গুটিয়ে এসে যে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটি করা হল তাতে একজন দারোয়ান গুরুতর আহত হল এবং আরেক জন ব্যাঙ্কের সশস্ত্র দারোয়ান নিহত হয়। আমরা নিয়ে আসি মাত্র সাড়ে চার লাখের মত টাকা। ছুটি দোনলা অরডিনারী কার্তুজ ব্যবহার করার মত বন্দুক, এই হল আমাদের মোট লাভ।

বিখ্যাত ক্রিকেট ম্যাচ কলকাতা পুলিশকে সেখানে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। লালবাজারের স্পেশাল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পুলিশ স্পটে

ছুটে এল। তবে অবশ্য সেখানে ডাকাতি অনেক আগে হয়ে গেছে। পুলিশ কমিশনার, আই-বি ও এস-ডি পুলিশের কর্তারা ও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত হয় ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান শুরু করে। বিভিন্ন ফটোগ্রাফ নেয়, বিভিন্ন ছাপ নেয়, আর পুলিশ বিভিন্ন জনের স্টেটমেণ্ট নিতে থাকে। তাদের স্টেটমেণ্ট থেকে তারা জানল স্টেনগান, রিভলবার ও পিস্তল নিয়ে ডাকাতেরা ঢোকে। উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিযে বলেছিল—কাজ করে যাও, ভয় পেও না। আমরা কম্যুনিস্ট, ডাকাতি করছি সর্বহারাদের অর্থনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য। আমরা আমাদের ঘোষণাপত্র দিয়ে যাচ্ছি, টেপ-রেকর্ডে লাউড স্পীকার মারফত সেই ঘোষণাপত্র ব্যাঙ্কের সামনে বাজিযে শোনাচ্ছি।

ঘোষণাপত্রে আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী বিশদভাবে লেখা ছিল। সেই ঘোষণাপত্র ডাকাতির দিনই দিল্লিতে পার্লামেণ্টে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঝড় উঠেছিল জানবার জন্য কারা এই ডাকাতদল। কী তাদের উদ্দেশ্য! ঘোষণাপত্রে কী আছে! অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয় ঘোষণাপত্র ব্যাঙ্কের ভিতরে না বাইরে ছড়ান হয়েছিল। সংবাদ পড়ে মনে হয়েছিল সরকার পক্ষ যথেষ্টভাবে চেষ্টা করছিল ঘোষণাপত্রের অস্তিত্ব না রাখার জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মোটামুটি জানা গেল যে বাংলায ঘোষণাপত্র ছড়ান হয়েছিল। টেপরেকর্ডারে এই ঘোষণাপত্রটি বাজান হযেছিল তা কিন্তু খুব কম উল্লেখ ছিল। কলকাতার বিশিষ্ট কাগজগুলো এই ঘোষণাপত্রের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করেছিল, কিন্তু টেপরেকর্ডার সম্বন্ধে তারা একেবারে চুপ হয়ে গেল। যা সূচনাতে টের পেলাম, তা শেষ পর্যন্ত দেখেছি। সরকার পক্ষ এই টেপ-রেকর্ডারকে সযত্নে মামলার প্রোসেডিংস থেকে বাদ দিতে পারলে খুশী হত। সেইভাবে তারা একনাগাড়ে চেষ্টা করছিল। এর অস্তিত্ব যেন ডিফেন্স ল ইযার না জানে, এবং শেষ পর্যন্ত জানলেও যেন তাদের নিউট্রালাইজ করে রাখা হয। তারজন্য প্রসিকিউশন নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। মোদ্দা কথা ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ এসে অনুসন্ধান করার সময যেসব জিনিস সীজ করেছে তার মধ্যে এতবড় একটি জিনিস টেপরেকর্ডারটি ছিল না। তবে কী করে শেষ পর্যন্ত একজিবিট হিসাবে স্থান পেল। মজার কথা কোন প্রেস রিপোর্টারের রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর খবরটি যে ডাকাতির সময় ব্যাঙ্কের সামনের ডাকাতরা একটি টেপরেকর্ডারের মারফত তাদের ঘোষণাপত্র

লাউড স্পীকারে বলেছে, এই অভিনব চাঞ্চল্যকর খবরটি প্রেস জানাল না। জানতে পারলেও প্রেস সেই খবরটি সংবাদ হিসাবেও খবরের কাগজে সরবরাহ করতে পারল না। সেইটি আজ কোর্টের ডকুমেণ্ট। এই ডকুমেণ্ট সবাই পেতে পারে। আমার ইচ্ছে সেই ডকুমেণ্টের কিছু কিছু অংশ এখানে লিখে জানাব। যে পোর্শান বাদ দেব সেটি ইংরাজী পোর্শান।

এই ঘোষণাটি টেপরেকর্ডে কোর্টে জজের সামনে ও সমস্ত ল-ইয়ারদের উপস্থিতিতে বাজান হয়। তারপর জজসাহেব এই টেপরেকর্ডারের অংশগুলি টুকরো টুকরো করে নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করেন। টেপরেকর্ডারটি ডবল স্বরে বাজান হয়। একটি মেয়েকণ্ঠে আরেকটি ছেলের কণ্ঠে। নথিতে ছেলের কণ্ঠ ও মেয়ের কণ্ঠ নম্বর দিয়ে লিখে যান।

ভারতের বিপ্লবের পথে আমি মনে করি এই টেপরেকর্ডারটি ও তাদের ঘোষণাপত্রটি এক মহামূল্য দলিল। এইটিকে সরকার পক্ষ সযত্নে চেপে রাখতে চেয়েছে, আর আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের এই চক্রান্ত বুঝেও বুঝতে চাইনি। কেন? তার একমাত্র কারণ এই দলিল ও অভিনব পন্থায় তাদের দলের আদর্শ, পথ ও কর্মসূচী বিশেষভাবে ও বিশেষ সময়ে প্রচার করাটার মধ্যে যে বৈপ্লবিক সংকেত নিহিত আছে, তার প্রচার সরকার কোন মতেই চাইছিল না। তাই সরকার নিউট্রালাইজ করল ও হাত করল সংবাদ-পত্রগুলিকে। তারা হাত করল বিভিন্ন পলিটিক্যাল্ পার্টির নেতাদের। হয়তো আমার লেখা পড়ে আমার উপরে রেগে যাবেন। পলিটিক্যাল পার্টির নেতাদের সরকার কীভাবে হাত করল? কোন পলিটিক্যাল নেতা ও ভারতের পার্টি কোন দল, উপদল কেউ আর. সি সি. আই. এর মত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাননি। এইরূপ পরিকল্পনা করা যে একটি সাংঘাতিক ব্যাপার এবং তা সহজে যে করা যায় না, তা সবাই অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছিল। কাজেই সরকারের পুলিশ যখন বলল এইসব অরাজনৈতিক কাজ অরাজনৈতিক দলের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তখন পলিটিক্যাল দল, উপদল সবাই মনে মনে খুশী হয়েছে, কারণ তাদের দল রাজনীতির দল আর., আর. সি. সি আই-এর দল অরাজনৈতিক দল। সরকার এইরূপ প্রচারের সুবিধা গ্রহণ করবেনই ও সাংবাদিকরা সরকারের প্রচারের ফাঁদে পড়বেন। তাঁরাও দুর্ধর্ষ ব্যাংক ডাকাতিগুলিকে অরাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে প্রচার করতে শুরু করলেন। আমার প্রশ্ন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয়। আমার প্রশ্ন রাজনৈতিক দলের মানসিকতার বিরুদ্ধে।

তাঁরা কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে এই ঘোষণাপত্র তাঁরা তাঁদের অফিসে, তাঁদের প্রেসে বা নেতারা আগেই ডাকে পাননি? আমি খুব ভাল করেই জানি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা ও তাঁদের সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার অফিসে পাঠান হয়েছিল। সেগুলি না পাওয়ার কোন কথাই নয়। যখন ব্যাঙ্কে ও ব্যাঙ্কের বাইরে এই ঘোষণাপত্র সকলে পড়েছিল, সেইরকম সময়ে এই ঘোষণাপত্র তাদের অফিসে ও নেতাদের কাছে পোস্ট করা হয়। তারপর কথা হচ্ছে কোর্টে কম্যুনিস্ট ধ্বজাধরা উকিল ছিল, তারা জানত ডাকাতির পরদিন স্টেটসম্যান প্রভৃতি কাগজে ঘোষণাপত্রের উল্লেখ ছিল এবং ঘোষণাপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতও ছিল। সেই দিনই দিল্লীতে পার্লামেণ্টে সংবাদ প্রচার করেছে। সেখানে উল্লেখ ছিল এই ঘোষণাপত্রের কথা। তবু কেন বিশেষ করে কম্যু-নিষ্ট পার্টি ঘোষণাপত্রের কথা জানতেন না এবং তাঁরা কোন দলের এইসব ডাকাতি এবং কী তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলেন না।

আমার ইলেক্‌শনের সময় লেফ্‌ট ফ্রণ্ট যখন আমাকে সমর্থন জানাতে আসে তখন আমার ইলেক্‌শন অফিসে সি. পি. আই-এর জনৈক্য নেতা বলেছিলেন, —'তিনি কোন পার্টির সঙ্গে কাজ করছেন কিনা বা তার কোন পার্টি আছে কিনা আমরা তা জানি না। এইসব কাহিনী জানাতে হবে…" সি. পি. আই. এম.-এরও সেইরূপ একই কথা। আর তার কোন পার্টির সঙ্গে এফিলিয়েশন আছে কী না। তিনি কোন পার্টিতে বিলং করেন না তাঁর নিজের কোন পার্টি নেই। সেইরূপ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে চলা খুবই মুশকিল।

পার্টি হতে হলে কী পঞ্চাশ বছর ধরে মার্কটাইম করে যেতে হবে? যদি পার্টি একদিন আগে গঠিত হয় তবে কী সেটি পার্টি হবে না? অতি অধুনা শ্রীজগজীবন রামজীর কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী পার্টি দিনে দিনে গঠিত হল আর সেটি রেকগ্‌নেশেন পেল। তবে অস্ত্রের সংঘাতের মধ্যে যদি, কোন দল তার ঘোষণা দেয় তবে কী সেটি দল বা পার্টি হতে পারে না—তার কী তবুও পঞ্চাশ বছর ধরে রাজনৈতিক নাম মার্কটাইম করতে হবে?……